BENGALI

شرح مبادئ التوحيد

তাওহীদের মূল নীতিমালা

(আল্লাহর একত্বের বিশুদ্ধ ধারণা)

ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স

আল্লাহ্'র নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

তাওহীদের মূল নীতিমালা

মূল : ড. আবূ আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স

ভাষান্তর : ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

সম্পাদনা : অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ব

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

তাওহীদের মূল নীতিমালা
(The Fundamentals of Tawheed)

মূল (ইংরেজি) : Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
International Islamic Publishing House (IIPH),
Riyadh, Saudi Arabia.
English Edition 2 (Special): 2006

ভাষান্তর (বাংলা) : ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

প্রকাশক : তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 7112762, 01190368272

প্রথম প্রকাশ : ২০০৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : International Islamic Publishing House (IIPH)

বিনিময় : ১৮০ (একশত আশি টাকা মাত্র)।

TAWHEEDER MOOL NEETIMALA
(The Fundamentals of Tawheed)
Written by (in English): Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Translated by (into Bengali): Engr. Muhammad Hassan
Published by: **Tawheed Publications,** 90, Hazi Abdullah Sharkar Lane,
Bangshal, Dhaka-1100. Phone : 7112762, 01711646396
E-mail: tawheedpublicationbd@gmail.com

এ বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন গুণীজনের মন্তব্য

এ বইটি সম্পর্কে অনেক গুণীজন সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল:

'*তাওহীদের মূল নীতিমালা*' গ্রন্থটিকে আমি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে পেয়েছি। আমার মনে হয়, ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি *তাওহীদ* সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম পাঠকদের নিকটে এ বইটি সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ধারণা প্রদান করবে। তথাপি, শির্কের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক প্রসঙ্গসমূহ পৃথিবীতে বর্তমান বেশিরভাগ ধর্মের পাশাপাশি মুসলিম জগতের নানা অংশে বিরাজমান বিভিন্ন গর্হিত পৌত্তলিক বিশ্বাস ও চর্চা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।' -***Ghalib Yonkers,*** *Religious Editor, Saudi Gazette.*

'আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে এ বইটি একটি বিশেষ গবেষণার উপস্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদানও বটে। ফলত, মানব জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে আমি প্রতিটি মুসলিমের জন্য এ বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। উপরন্তু, যে সব অমুসলিম পাঠক ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র একত্ব বিষয়ে জানতে আগ্রহী তাদেরও প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আশা রাখি।' –***Dr. Maneh Al-Johani,*** *Secretary General, World Assembly of Muslim Youth (WAMY).*

'ইসলামে আল্লাহ্‌র একত্ব বলতে যা বুঝায় তা জানার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপকে উপলব্ধি করতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই এ বইটি পড়তে হবে অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির এ বইটি পড়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং সে সব সংস্কৃতিতে বিদ্যমান বিশ্বাসে অন্তর্ভূক্ত স্রষ্টার একত্বের নানা প্রকার লঙ্ঘনকে উদাহরণস্বরূপ চিহ্নিত করে তা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে লেখক ইসলামকে একমাত্র বিশুদ্ধ একত্ববাদী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করেছেন।' -***Hediyah Al-Amin,*** *Columnist, The Peninsula, Doha, Qatar.*

'প্রকৃত ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের মূল বিষয় *তাওহীদ*-এর উপরে ইংরেজি ভাষায় এ বইটিই সর্বপ্রথম লেখা হয়েছে (ভাষান্তর নয়)। ইসলামের মূল ভিত্তিস্তম্ভ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও খাঁটি ধারণা অর্জন করতে প্রতিটি মুসলিমের জন্য এ বইটি অবশ্য পাঠ্য।' -***Amjad Khan,*** *Production Editor, The Weekly Gulf Times, Doha, Qatar.*

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নিবেদিত, যিনি সর্বোচ্চ ও পরম দয়ালু। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার, সাহাবী ও সে সব অনুসারীদের প্রতি যাঁরা তাঁর প্রদর্শিত সঠিক পথকে জীবনের শেষ সময় অবধি অনুসরণ করে।

'তাওহীদ' হচ্ছে স্রষ্টার একত্ব। ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে এ তাওহীদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতিকে যেহেতু সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তাই প্রথম মানুষ আদম ﷷ থেকেই এ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

শয়তান হচ্ছে মানুষের চিরন্তন ও প্রধান শত্রু। সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সরল পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করতে সে আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাই পৌত্তলিকতা বা নাস্তিক্যবাদ যদি কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে শয়তান কঠোর পরিশ্রম করে মানুষকে নতুন নতুন প্রথা (বিদ'আত) বা ধর্মদ্বেষিতায় জড়িয়ে ফেলতে। মূল ধর্মীয় বিশ্বাস তথা আক্বীদায় ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহের অনধিকার অনুপ্রবেশের দিকে ড. ফিলিপ্স অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তাঁর লিখিত এ বইটিতে তিনি তাওহীদের ধারণাকে স্বাভাবিক বা সচরাচরদৃষ্ট মান থেকে ভিন্নভাবে নির্মল করে তুলেছেন।

ড. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স হচ্ছেন মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক, *'King Saud University'* হতে স্নাতকোত্তর এবং *'University of Wales'* হতে *Ph.D.* ডিগ্রীধারী এক নিবেদিত প্রাণ দাঈ। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ইংরেজিতে অনেক বই লিখেছেন। তাঁর এ বইটিতে তিনি তাওহীদ বিষয়ে সহজে বোধগম্য পদ্ধতি ও ভাষায় আলোচনা তথা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যার ফলে সাধারণ পাঠকবর্গ এ বিষয়ে সহজেই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আশারাখি।

আলহামদুলিল্লাহ! এ বইটি বিশ্বের প্রতিটি স্থানের পাঠক কর্তৃক সফলতার সাথে গৃহীত হয়েছে। বইটির এ সংস্করণ লেখক কর্তৃক পূনঃনিরীক্ষিত, পরিমার্জিত ও সংশোধন করা হয়েছে। লেখক, অনুবাদক ও যাঁরা বইটির প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

পরিচালক,

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾ (سورة البقرة: ٣٢)

"হে আল্লাহ্, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদিগকে যা শিখিয়েছেন তা ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ ও প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন।" [সূরা আল-বাকারা (২) ঃ ৩২]

সমূদয় প্রশংসা ও গুণগান নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক সর্বশক্তিমান এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সুবহ্বানাহূ ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, যাঁর কোনই শরীক (অংশীদার) নেই, যিনি নিরাকারবাদী *(incorporealist)*, সাদৃশ্যবাদী বা রূপকারী *(analogist)*, অংশীবাদী *(associationist)*, সর্বব্যাপিতাবাদী *(ubiquitist)*, নাস্তিক্যবাদী *(atheist)*, দ্বৈতবাদী *(duellist)*, অদ্বৈতবাদী বা ওয়াহ্দাতুল ওজুদ *(non-duellist)*, ত্রিত্ববাদী *(Trinity)* ও নির্গুণবাদী কর্তৃক আরোপিত রূপক অর্থ বা কল্পিত ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও মহাপবিত্র; যিনিই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী ও ইবাদাতের যোগ্য। তিনি তাঁর সত্তায় যেমন এক ও অভিন্ন, তেমনি গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুলনীয়।

অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়িদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সহধর্মিণী ও সহচরবৃন্দের প্রতি। শির্ক-কুফর নামক বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত মানব সমাজ যখন ব্যাকুল হৃদয়ে মুক্তিপথের সঠিক দিকনির্দেশ লাভের আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত ছিল, ঠিক তেমনি এক মুহূর্তে শির্ক ও কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথভ্রষ্ট মানবকে আলোকোজ্জ্বল সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা রূপে প্রেরণ করলেন। কপোলকল্পিত সকল ভ্রান্ত মত ও পথের মোকাবিলায় বিশুদ্ধ তাওহীদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে মহান আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত এবং সুস্পষ্ট পথের সন্ধান মানব জাতির নিকট তিনি প্রদান করলেন। সকল প্রক্ষিপ্ত ও কৃত্রিম বিধানের উপর সত্য-সুন্দর-শাশ্বত বিধানকে জগৎ জয়ী করার পথ প্রদর্শন করলেন। মোহগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের নিমিত্তে সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথ তিনি দেখালেন। তাঁর অনুসৃত, প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত পূর্ণ ও পরিণত জীবন বিধানের নামই ***'ইসলাম'***।

বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে এর নির্ভেজাল ***'তাওহীদ'***। তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি। এ ভিত্তির মৌল বাণী হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله)। এ পবিত্র বাক্যের মাধ্যমেই আল্লাহর একত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। এ প্রধান স্তম্ভটির উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলামের অন্য সকল বিধান। এর তাৎপর্য হল, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, যাবতীয় মূর্তি, প্রতীক, সাধু, সন্ত, জ্যোতিষী, পাদ্রী, সন্ন্যাসী, পুরোহিত ইত্যাদি সকল তাগূতি পূজা ও আনুগত্যকে অস্বীকার করা এবং নিরাকারবাদ, সাদৃশ্যবাদ, অংশীবাদ, সর্বব্যাপিতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ, জড়বাদ, নির্গুণবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মতবাদকে পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ্রূপে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষানুসারে তাওহীদ সম্পর্কিত নিজের আক্বীদাকে নিষ্কলুষ রাখা।

তাওহীদের দাবী হল, আল্লাহকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে একক এবং একমাত্র ইলাহরূপে স্বীকার করার সাথে সাথে মুসলিমকে তার চিন্তায়, আচরণে ও কার্যকলাপে এর বাস্তব রূপায়ন ঘটানো।

তাওহীদের বিপরীত বস্তুটি হচ্ছে শির্ক অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সত্তা এবং গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন। শির্ক হল আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট তথা জঘন্যতম গুনাহ এবং বান্দার জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। কুরআন ও হাদীসে শির্কের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্ক বাণী। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় নিপতিত হয়ে শির্কের গভীর পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। শুধু সাধারণ মুসলিম জনগণই নয়, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বশে এবং এক অন্ধ মোহে ঐ পঙ্কে ধাবমান। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু বিশেষ ব্যক্তি ইসলামের নামে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকেই ধ্বংস করতে তৎপর হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে অসংখ্য অনুসারীও লাভ করছে, এভাবে তাগূতের সাহায্যকারী হিসেবে অনুসারীদেরকে নিয়ে বিপথে চালিত হতে সক্রিয় রয়েছে সর্বদা। তারা আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা সম্পর্কে এমন সব বিষয় প্রচার করছে যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আর এ সকল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্র 'ইবাদাত থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাওহীদে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ যদি ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়, তাহলে ইসলামের নামে কৃত তার 'আমলগুলো পৌত্তলিকতার চর্চায় পরিণত হয়ে ধ্বংস হতে বাধ্য। ফলে, তার জীবনের 'আমলসমূহ বরবাদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এ কারণে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য হল, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যেভাবে *তাওহীদ* শিক্ষা দিয়েছেন হুবহু সেরূপেই স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে *তাওহীদ*-কে উপলব্ধি করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা। ইসলামের সোনালী যুগ থেকে বহমান নির্ভেজাল স্রোতস্বিনী হতে উৎসারিত বিশুদ্ধ ইসলামী বিজ্ঞান এবং মূলধারার বিদ্বানগণ প্রদত্ত *তাওহীদ*-এর প্রধান ক্ষেত্রসমূহের মৌলিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার নিকটে উপস্থাপনে এ গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে *তাওহীদ* সম্বন্ধে আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, প্রচার-প্রচারণা এবং আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তথা মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা বা মতবিশ্বাস ও কুসংস্কারসহ চিন্তা ও বাস্তব জগতের সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাওহীদুল্লাহ্'র সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এক পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি ইসলামী তথা নিখাদ তাওহীদ ভিত্তিক ভাবধারা ও সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে প্রতিটি মুসলিমের প্রতি উদাত্ত আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে এ বইয়ের প্রতিটি পাতায়। কারণ, ইহ-পরকালীন মুক্তি তাওহীদুল্লাহ্'র বাস্তবায়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত ও বিশুদ্ধ তাওহীদের জ্ঞান না থাকলে কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ নয়। তাওহীদবিহীন কোন 'আমলও গ্রহণীয় নয়।

তাওহীদ-এর উপরে মূলধারা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রকৃত ইসলামী বিদ্বানগণ কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন মৌলিক আরবী গ্রন্থের আলোকে সংগৃহীত তথ্যাবলী যথাসম্ভব পরিমার্জিত করে এবং সেগুলোর স্বকীয়তা বজায় রেখে যথাযথ সন্নিবেশ সাধনের দ্বারা লেখক এ গ্রন্থটির উৎকর্ষতা বিধান করে আমাদের সম্মুখে তা উপস্থাপন করেছেন। জ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির আঙিনায় একজন নওমুসলিম ইসলামী বিদ্বানের প্রকাশভঙ্গি স্বভাবতই কিছুটা ভিন্নতার দাবী রাখে। ফলে বিষয়বস্তু এক হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার কারণে এ গ্রন্থটি ভিন্নতর হয়েছে বলেই প্রতীয়মান। প্রকৃত ইসলামী সাহিত্যের জগতে তাওহীদ ও শির্কের মতো

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক ড. বিলাল ফিলিপ্সের এ বইখানার প্রকাশ অন্যতম একটি বিশেষ সংযোজন। সমসাময়িক জীবনপ্রবাহ ও সমাজবাস্তবতা অবলম্বন করেই রচিত হয় সাহিত্যকর্ম, কিন্তু মহৎ ও সত্য সাহিত্যপ্রতিভার স্পর্শে এই সমকালীনতাই উত্তীর্ণ হয় চিরকালীনতায়। কারণ, যে কোন মহৎ শিল্পী প্রথাবদ্ধ জীবনভাবনা পরিত্যাগ করে যদি প্রকৃত সত্য-সুন্দর-কল্যাণের অনুগামী হয়ে ওঠেন, তবে এ পথেই তিনি পেতে পারেন চরম শাশ্বতের স্পর্শ। এই শাশ্বতের স্পর্শই হচ্ছে আন্তমানবিক সামঞ্জস্য স্থাপনের মৌল সত্য। বহুমাত্রিক জটিলতার কারণে আমাদের মুসলিম জাতির সীমানায় প্রচলিত তথাকথিত ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-সভ্যতা প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে সংগতি স্থাপনে যে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে, একমাত্র বিশুদ্ধ তাওহীদ ভিত্তিক সাহিত্য-শিল্পকলার মাধ্যমেই স্থাপিত হতে পারে প্রত্যাশিত সেই সামঞ্জস্য। পৌত্তলিকতার বন্ধন থেকে মানবাত্মার মুক্তি কামনা এবং আন্তমানবিক সমন্বয় সৃষ্টির আকাঙ্খাই হচ্ছে এ বইটির প্রধান লক্ষ্য। আর সংস্কৃতির কথা না বললেই নয়, সংস্কৃতি মানুষের অন্তর্গত একাকিত্বকে দূর করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধন ঘটায়, সংস্কৃতির স্পর্শে মানুষ পরিশীলিত হয়। মানবচিত্তে প্রকৃত ইসলামী তথা শির্কমুক্ত পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতিবোধের মূল অভিমুখে অগ্রসর হওয়ারও প্রত্যয় ব্যক্ত করে এ বইটি।

আল্লাহ্‌র একত্বের বিশুদ্ধ ধারণা তথা আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে এ বইটিতে। এ আক্বীদাটিই মূলত মানুষের ঈমান ও 'আমলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ব তথা তাওহীদকে অবনমিত ক'রে শির্ক নামক সর্ববৃহৎ ও জঘন্যতম গুনাহ্‌ পৌত্তলিকতার সঙ্গে আপোষ পোষণ করা হয়েছে, তা সম্পর্কেও এ বইটি সকল মুসলিমের বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে অসাধারণ এক বিশ্লেষণ উপহার দিয়েছে। এ বইটির অনন্যতা কেবল এতে ব্যবহৃত ভাষার প্রাঞ্জলতায় নিহিত নয়, বরং তাওহীদের মূলতত্ত্বকে আধুনিক উপস্থাপনা ভঙ্গিতে প্রকাশের বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার বটে।

বিশুদ্ধ প্রমাণাদি, মূল ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে ড. বিলাল ফিলিপ্স প্রকৃত ইসলামী তাওহীদের শাশ্বত সত্যকে উপস্থাপন করেছেন অতি দক্ষতার সাথে। সকল লেখনীতে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানদের বাস্তব ও চিন্তাজগতের স্থুলতা, জড়তা ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করার মাধ্যমে একটা চিরন্তন জ্ঞানের আলো মানবমনে জ্বেলে দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামের সহজ-সরল পথ অভিমুখে ধাবমান করে তুলতে তিনি সাহায্য করেছেন। তাঁর লেখা সাহিত্যের পেছনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে অনুসন্ধিৎসু ও বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর লেখনীতে সহজ-সরল-সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেলেও এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনা। বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জি তথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীছ হতে উৎসারিত স্বচ্ছ জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনই তাঁর সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যসহ জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন সমকালীন মানবজীবনের সম্ভাবনা ও অবক্ষয়, কিন্তু তা কোন উপরিকাঠামো-চিহ্নিত নয়, সন্ধান করেছেন জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার গভীর বৈচিত্রকে। একদিকে বর্ণবাদ, অন্যদিকে যদিও লেলিন-মার্ক্স-মাওবাদী জীবনদৃষ্টির ব্যাপক প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে, তবুও ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ের আবেগী প্রকৃতি ও চৈতন্য তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার অন্তর্ভুবন নির্মাণে আশ্চর্যই ক্রিয়াশীল। মূলত তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও ধীশক্তির মাধ্যমে, তাঁর প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য ও খাঁটি তাওহীদভিত্তিক মননের মাধ্যমে মুসলিমদের জাতীয় অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশের যে

দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন, মুসলমানদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যে ভাবনা তিনি ভেবেছেন, সে সবের প্রতিফলনই হল তাঁর গ্রন্থসমূহ। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিতে মূলত তিনি মুসলিম বিশ্বাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ, প্রকৃতি ও সাম্প্রতিক হালচাল নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গবেষণা, তথ্য ও তত্ত্বকথার পরিপ্রেক্ষিত খুবই বিস্তৃত এবং তাত্ত্বিক-ইতিহাসের আলোকে শিল্প-চৈতন্যের মতোই বিচিন্তিত। মুসলমানদের জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা ছিল তা যেন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে ধ্বংসাত্মক এক অপসংস্কৃতি মুসলমানদের ঈমান-'আক্বীদা, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা জীবনের সবকিছুকে গ্রাস করে নিচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থে। এ বইটিতেও অবশ্য তাঁর উক্ত নীতির ব্যত্যয় ঘটে নি। আল্লাহ্‌র একত্ব তথা তাওহীদুল্লাহ সম্বন্ধে এত তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ, সহজ ও স্বচ্ছ বিন্যাসে রচিত গ্রন্থ আর নেই বললেই চলে। এ বইটির বাস্তবতা পাঠক এবং গবেষকদের জন্য দুর্লভ ও প্রাপ্তির তৃপ্তিমাখা যেন এক অভিজ্ঞান।

ইংরেজিতে লেখা ড. বিলাল ফিলিপ্সের 'The Fundamentals of Tawheed' নামক বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। বইটির বাংলা এ সংস্করণ মূলত ইংরেজি ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন নন এমন অজস্র বাঙালি পাঠকের কথা ভেবে রচিত। ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তরের ধারাবাহিকতায় এটি আমার তৃতীয় ইসলামী গ্রন্থ। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। ডা. জাকির নায়িকের বই অনুবাদের কর্মে ক্ষণিকের জন্য বিরতি দিয়ে মনোনিবেশ করেছিলাম এ বইটি বাংলায় ভাষান্তরে। কেননা, ডা. জাকির নায়িকের বই ও বক্তৃতাসমূহের অনুবাদ করার পাশাপাশি ড. বিলাল ফিলিপ্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সকল বই বাংলায় অনুবাদ করার লিখিত অনুমতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ, তাঁর সকল বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। যা হোক, অবশেষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি তাঁর বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করার লিখিত অনুমতি পেয়ে যাই।[১] এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্র বিবেচনায় কতিপয় বইকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুবাদ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শকৃত সকল বই সমান গুরুত্বের দাবী রাখা সত্ত্বেও কয়েকজন দ্বীনী ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে এ বইটিকে আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়াতে প্রথমেই বাংলায় ভাষান্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করি। তবে ড. বিলাল ফিলিপ্সের অন্যান্য গ্রন্থসমূহকে গুরুত্বানুসারে পর্যায়ক্রমে বাংলায় ভাষান্তর করতে থাকব, ইন্‌শাআল্লাহ। অবশেষে মহাপবিত্র ও মহামহিম আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ সম্পন্ন হল। অনুবাদ শিল্প খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। উভয় ভাষায় পারদর্শী না হলে মূল ভাবধারা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বাংলা ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ও যোগ্যতা না থাকলে তাতে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা ও তার লালিত্য বজায় রাখা শুধু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্যও বটে। বিশেষ করে ইসলামী বইয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পরিভাষার সঠিক জ্ঞান না থাকলে বাক্যের অর্থ বিকৃতির সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাওয়ার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া এ বইটি খুব বেশি পরিমাণে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল হওয়ার জন্য এবং অনুবাদের জগতে আমি একেবারেই নবীন বিধায় বিস্তৃতভাবে সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা করা সম্ভব হয় নি।

---

[1] আল্লাহ্ তা'আলা ড. বিলাল ফিলিপ্স-কে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

সীমিত যোগ্যতা নিয়ে ভাষান্তর করা এ বইয়ের অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করার দায়িত্ব একটু কষ্ট হলেও কাঁধে তুলে নিতে হবে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদেরকেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায়স্বরূপ বলা যায়, সাধ্যমতো চেষ্টায় কোন ক্রুটি রাখি নি। কিন্তু মানবীয় প্রচেষ্টায় ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। বিশেষ করে অনুবাদ কর্মে কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়। সকল প্রকার ভুলভ্রান্তির জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রত্যাশী। এ বইয়ে কোন প্রকার ভাষাগত, মুদ্রণ প্রমাদ বা অন্য কোন ব্যাপারে ভুল দেখতে পেলে সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তা সম্পর্কে অভিমত বা পরামর্শ আমাদেরকে জানানোর সবিনয় অনুরোধ রইল। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল। যে কোন ভ্রমপ্রমাদের প্রতি সুধী পাঠক-পাঠিকার সৎ পরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে এবং বইটির পুনর্সংস্করণে বিবেচিত হবে।

যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে এ বইটির প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সকলের নিকটে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। এ পুস্তকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। বইটির সম্পাদনাকালে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের প্রেক্ষিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের নিমিত্তে বিশেষ ক্ষেত্রে পাদটীকা সংযোজন করেছি, এ ক্ষেত্রে অনেক গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছি এবং সেগুলো থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি। যে সব গ্রন্থ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি সে সব গ্রন্থের নাম বইয়ের শেষে মুল লেখকের প্রদানকৃত গ্রন্থপঞ্জির নীচে পৃথকভাবে উল্লেখ করলাম, যাতে গবেষক ও অনুসন্ধানী পাঠক প্রয়োজনে তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। যে সকল বিদ্বানের লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তাঁদের সকলকে অফুরন্ত রহমত দান করুন। মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ বইটি কবুল করুন, এটিকে লেখক এবং তাঁর পিতামাতা ও পরিবারের, অনুবাদক এবং তাঁর পিতামাতা ও পরিবারের, প্রকাশক, পাঠকদের এবং সকল শুভাকাঙ্খীর জন্য নাযাতের ওসীলা করুন। আমীন!

বিনীত,
ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

তারিখঃ
জানুয়ারী, ২০০৯ ঈসায়ী
মুহাররাম, ১৪৩০ হিজরী

স্থায়ী ঠিকানা-
প্রযত্নে : মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন
গ্রাম + পো.: কুড়ালিয়া
(পশ্চিম পাড়া),
থানা + জেলা : সিরাজগঞ্জ
পোস্ট কোড : ৬৭০০

বর্তমান ঠিকানা-
বাড়ি নং-২২, ব্লকঃ ডি,
মসজিদ রোড-৩
(পূর্ব নূরের চালা),
বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।
পোস্ট কোড : ১২১২

দূরালাপনী : 01912196789, 01717208080 ইমেইলঃ muhammad_hassan@live.com

বিঃ দ্রঃ এ বইয়ে ব্যবহৃত কুরআনের আয়াতের অর্থানুবাদগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত ও তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত *'তাফসীর তাইসীরুল কুরআন'* থেকে।

বিষয়সূচী

অবতরণিকা

তাওহীদই যে ইসলামের মূল বুনিয়াদ সে ব্যাপারে সবাই জ্ঞাত। আর এ তাওহীদকে যথাযথভাবে যে পবিত্র বাক্যের (কালিমা) মাধ্যমে কথায়, লেখায় ও আচরণে প্রকাশ করা হয় তা হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোনই ইলাহ নেই)। এ মূল বাক্যটি ঘোষণা করে যে, সত্যিকার ইলাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই শুধুমাত্র ইবাদাতের জন্য যথোপযুক্ত। ইসলামী বিধান অনুসারে এ বাক্যটি আপাতদৃষ্টিতে ঈমান (প্রকৃত স্রষ্টায় সত্যিকার বিশ্বাস) ও কুফর (অবিশ্বাস বা অস্বীকার)-এর মধ্যে পার্থক্যকারী রেখার সৃষ্টি করেছে। তাওহীদের এ মূলনীতির কারণে স্রষ্টার উপর বিশ্বাসের ইসলামী রূপকে একত্ববাদ বলে অভিহিত করা হয় এবং ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের মত বিশ্বের অন্যান্য একত্ববাদী ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামকে একটি একত্ববাদী ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। তৎসত্ত্বেও তাওহীদের ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী, খ্রিস্টান ধর্মকে বহু-ঈশ্বরবাদ এবং ইহুদী ধর্মকে অতি সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করা হয়।

অতএব তাওহীদের মূল নীতিমালা এমনই জ্ঞানগর্ভ বিষয় যে মুসলিমদের কাছেও এর বিস্তর ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন রয়েছে। তাওহীদকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হয় তখনই, যখন আমরা লক্ষ্য করি ইবনে 'আরাবীর[১] মত মুসলিমগণ তাওহীদ বলতে "আল্লাহ্ই সব এবং সবই আল্লাহ্, সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ্রই অস্তিত্ব বিদ্যমান" বলে বুঝেছে। কিন্তু ইসলামের মূলনীতি নির্ভেজাল তাওহীদ অনুসারে এ ধরণের বিশ্বাস তথা সর্বেশ্বরবাদকে কুফর হিসেবে গণ্য করা হয়। মু'তাযিলা[২] নামক মুসলমানদের মতে, তাওহীদ হচ্ছে

---

[1] মুহাম্মাদ ইবনে 'আরাবীর জন্ম স্পেনে ১১৬৫ ঈসায়ী এবং মৃত্যু দামেস্কে ১২৪০ ঈসায়ী সনে। সে নিজেকে আভ্যন্তরীণ জ্যোতি প্রাপ্ত ও আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারী হিসেবে দাবী করে। তাছাড়া সে নিজেকে মোহরাঙ্কিত অলৌকিক বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন বলে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিজেকে নবীর চাইতে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হিসেবে প্রচার করে। এ ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী শতাব্দিগুলোতে তাঁর অনুসারীগণ তাকে আল্লাহ্র ওলী মর্যাদায় উন্নীত করে এবং তাঁকে আশ-শাইখ আল-আকবার (সবচেয়ে বড় পণ্ডিত) উপাধি প্রদান করে। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম পণ্ডিতগণ তাকে খারেজি বলে গণ্য করতেন। (H.A.R. Gibb and J.H. Kramer, *Shorten Encyclopedia of Islam,* (NewYork Cornell University Press, 1953), pg 146-7)

[2] উমাইয়া বংশধরদের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাবস্থায় ওয়াছিল ইবনে আতা (৮০-১৩১ হি.) ও 'আমর ইবনে উবাইদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তিবাদী দর্শনভিত্তিক দল। প্রায় একশ বছর ধরে এ দল

আল্লাহ্কে গুণহীন নামীয় সত্তা হিসেবে সকল স্থানে ও সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস পোষণ করা। কিন্তু এ ধরণের ভ্রান্ত মতবাদ বা আক্বীদাও প্রকৃত তথা নির্ভেজাল ইসলাম কর্তৃক বাতিলকৃত ও খারিজ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মূলতঃ রাসূল ﷺ-এর পর হতে অদ্যাবধি এ ধরণের প্রায় সকল খারিজি মতবিশ্বাস (ফির্কা) ইসলামের প্রকৃত ও সত্য তথা মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কারণ, এ মতবিশ্বাসের অনুসারীরা ইসলামের মূলনীতি নির্ভেজাল তাওহীদকে নিজেদের মত করে অপব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে। যারা ইসলামকে ধ্বংস ও মুসলিমদের ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার ফন্দি এঁটেছিল তারা মূলতঃ নির্ভেজাল তাওহীদের উপর আক্রমণের মাধ্যমে এটিকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াসে রত ছিল। কারণ, একমাত্র নির্ভেজাল তাওহীদই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেরিত এবং সকল নাবী ও রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত ইসলামের বাণীর নির্যাস। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ চালু করেছে এবং এখনও তা বহাল তবিয়তে বর্তমান। আর এ সব ভ্রান্ত আক্বীদা মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদাত সম্পাদনে বাধা প্রদান করে। কারণ, মানুষ যদি শুধু একবারের মত এ সব পৌত্তলিক আক্বীদা গ্রহণ করে, তাহলে সে অতি সহজেই অন্যান্য অসংখ্য ভ্রান্ত, শির্কী ও কুফরী ধারণা ও মতবাদের প্রতি অতিসংবেদশীল হওয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে। ফলে অজ্ঞাতসারে তারা প্রকৃত স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির ইবাদাত বা উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ তারা এ কথা ভাবতেই থাকে যে, তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সত্য ইবাদাতে মশগুল।

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে এ ধরণের পথভ্রষ্টতা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। কারণ, এ সব পথভ্রষ্টতার কারণেই পূর্বের উম্মাতগুলো বিপথগামী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদর্শিত সরল পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য তাঁদেরকে জোর তাকিদ প্রদান করেছেন। যেমন- "একদিন রাসূল ﷺ সাহাবীদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি মাটির উপর একটি সরলরেখা টানলেন। তারপর সেই সরলরেখার দু'পাশ দিয়ে অনেকগুলো শাখা রেখা টানলেন। সাহাবীগণ এর তাৎপর্য জানতে চাইলে রাসূল ﷺ শাখা রেখাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এ পথগুলো ভ্রান্ত রাস্তার পরিচায়ক। তিনি আরও বললেন, প্রতিটি রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে লোকজনকে সে সব ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করছে একটি করে শয়তান। তারপর রাসূল ﷺ প্রধান সরলরেখার দিকে সাহাবীদের

আব্বাসীয় রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ১২ শতাব্দি পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। (*Shorter Encyclopedia of Islam,* pg. 421-426)

দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এটাই একমাত্র আল্লাহ্‌র পথের নির্দেশক। সাহাবীগণ যখন আরও ব্যাখ্যা জানতে চান তখন রাসূল ﷺ বললেন, এটা তাঁর পথ, এ কথা বলে তিনি নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন:[১]

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ (سورة الأنعام:١٥٣)

"আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে চলতে পার।"

[সূরা আন'আম (৬) : ১৫৩]

অতএব রাসূল ﷺ যেভাবে শিখিয়েছেন এবং সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যেভাবে অনুধাবন করেছেন ঠিক সেভাবেই পরিচ্ছন্ন তথা নির্ভেজাল তাওহীদকে বুঝতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাওহীদ দাবী করে সলাত ও যাকাত আদায়, সাওম পালন এবং হজ্ব সম্পন্ন করার পরেও ভ্রান্ত পথসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ এ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করে কুরআনে ঘোষণা করেন:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ (سورة يوسف:١٠٦)

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।"

[সূরা ইউসুফ (১২) : ১০৬]

মূলত কোন ইংরেজী ভাষার পাঠক যখন সলাত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব অথবা ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে লেখা বইয়ের সাথে **তাওহীদ** সম্পর্কিত লেখা বইয়ের তুলনা করে তখন তার নিকটে ইসলামে তাওহীদের গুরুত্বহীন হওয়ার বিষয়টি ভুলক্রমে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া, এ ভুল ধারণাটি তখনই দৃঢ়তর হয় যখন ইসলামী বই পড়ার সময় দেখা যায় যে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভ সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ থাকলেও তাওহীদ সম্পর্কে কেবল যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সকল স্তম্ভ ও তত্ত্ব শুধুমাত্র তাওহীদকে ভিত্তি করেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কারও

---

[১] ইবনে মাস'উদ কর্তৃক বর্ণিত। ***নাসাঈ, আহমাদ*** ও ***দারিমী*** কর্তৃক সংগৃহীত। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (***কিতাবুস সুন্নাহ,*** ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩, হাদীছ নং ১৭)।

তাওহীদের ভিত্তিমূল যদি সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তার সকল 'আমাল-আখলাক্ব পর্যায়ক্রমে পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের মধ্যে বিরাজমান ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাসগুলো দূর করার নিমিত্তে তাওহীদ সম্পর্কে আরও অনেক বেশি পরিমাণে অনুবাদকর্ম ও লেখালেখির ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ পুস্তকটিতে ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকদের জন্যে তাওহীদ নামক প্রকৃত ইসলামী তত্ত্বের প্রধান প্রধান বিষয়াবলীর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপনের ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যদিও তাওহীদ তত্ত্বের উপর আরবী ভাষায় লিখিত অন্যতম বই 'আল-আক্বীদা আত-তৃহাভীয়্যা'[১]-কে ভিত্তি করে এ বইটি লেখা হয়েছে, তবুও এ বইটিতে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ সে সব বিষয়ের সাথে আধুনিক ইংরেজি পাঠকের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাছাড়া ঐসব বিস্তারিত বিষয়সমূহ এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে আলোচনা সহজ করার বিষয়টিও বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।

এ বইটির অধিকাংশ বিষয়াবলী সেই তাওহীদের পাঠ্যক্রম থেকে গৃহীত যা আমি *'মানারাত আর-রিয়াদ'* ইংরেজি মাধ্যম ইসলামিক স্কুলে সপ্তম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করেছিলাম। ফলে এ আলোচনার ভাষা সক্রিয়ভাবেই সহজবোধ্য। এ সব পাঠ্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয় যেমন-ফিকাহ (ইসলামী আইন), হাদীছ (রাসূলের বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও নিষেধাজ্ঞা) ও তাফসীর (ব্যাখ্যা)-এর উপর প্রদানকৃত পাঠ্যক্রমসমূহের বেশিরভাগই আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুসলিমদের মাঝে প্রচারিত হয়েছে। পরবর্তীতে পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার কারণে ও এ-সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আরও চাহিদার প্রেক্ষিতে আমি তাওহীদ সংক্রান্ত পাঠ্যক্রমটিকে সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পুনর্বার পড়ে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে এ বইটিতে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ করি তিনি যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টাকে ক্ববুল করেন ও এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা যেন প্রকৃতভাবে উপকৃত হন। কারণ, চূড়ান্তভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুমোদনই বিবেচ্য এবং শুধু তাঁর ইচ্ছার উপরই সফলতা নির্ভরশীল।

আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স

---

[১] ইবনে আবিল-ঈয আল-হানাফী, ***শারহ্-আল-'আক্বীদাহ আত-তৃহাভীয়্যা,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদের শ্রেণীবিন্যাস

তাওহীদ (توحيد) অর্থ 'এক করা', 'এক বানানো', 'একত্রে যুক্ত করা', 'একত্রিত করা', 'একীকরণ' *(unification)* (কোন কিছুকে এক করা), 'একত্বের ঘোষণা দেওয়া' *(asserting oneness)*, বা 'একত্বে বিশ্বাস করা'। *তাওহীদ* (توحيد)শব্দটি আরবী *'ওয়াহ্হাদা'* (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'এক হওয়া', 'একক হওয়া' বা 'অতুলনীয় হওয়া' *(to be alone, unique, singular, unmatched, without equal, incomparable)*।[১] *তাওহীদ* নামক এ পরিভাষাটি আল্লাহ্‌র একত্বের (তাওহীদুল্লাহ[২]) ব্যাপারে ব্যবহৃত হলে তা দ্বারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপ তথা ইবাদাতে তাঁর একত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুণ্ন রাখা বুঝায়, অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ্‌র জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত সে সব ক্ষেত্রে আলাহর একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা। এই অর্থ তাওহীদুল্লাহ্‌র সবকটি শ্রেণীকেই অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। তাওহীদের এ বিশ্বাসটি মূলত এ রকম যে, আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা এক, তাঁর কর্তৃত্বে ও প্রভুত্বে (রবূবিয়্যাত) কোন শরীক বা অংশীদার নেই, তাঁর যাত, সত্তা ও গুণাবলীতে (আসমা ওয়াস-সিফাত) কোনই সদৃশ নেই তথা তিনি একক ও অতুলনীয় এবং ইলাহরূপে সকল প্রকার ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসেবে তথা ইলাহ হওয়ার

---

[১] J.M. Cowan, *The Hans Wher Dictionary of Modern Written Arabic,* (Spoken Language Services Inc., New York, 3rd. ed., 1976), p. 1055.

[২] **'তাওহীদ'** শব্দটি কুরআন ও রাসূলের ﷺ হাদীছের কোথাও উল্লেখিত হয় নি। যা হোক, রাসূল ﷺ যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রা:)-কে ৯ হিজরি সনে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে এ বাণী সহকারে প্রেরণ করেন যে,'আপনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নিকটে প্রেরিত হচ্ছেন, তাই প্রথমেই তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র একত্বের (ইউওয়াহহিদূল্লাহ) দিকে আহ্বান জানানো উচিত হবে।' [এ হাদীছটি ইবনে 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত; মুহাম্মাদ মুহসিন খান, ***ছহীহ আল-বুখারী,*** *(আরবী-ইংরেজি),(রিয়াদ: মাকতাবাহ আর-রিয়াদ আল-হাদীছা, ১৯৮১) খণ্ড ৯, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯, হাদীছ নং ৪৬৯;* ***মুসলিম,*** আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, ***ছহীহ মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), (লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭), খণ্ড ১, পৃ. ১৪-১৫, হাদীছ নং ২৭। এই হাদীছে ব্যবহৃত ক্রিয়াটির বর্তমান কাল থেকেই ক্রিয়া বিশেষ্য *তাওহীদ* শব্দটির উৎপত্তি, যা রাসূল ﷺ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্ষেত্রে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই (উলূহিয়্যাত)। এ তিনটি মূল বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তাওহীদ বিজ্ঞানকে ঐতিহ্যগতভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে তিনভাগে। এ তিনটি শ্রেণী একে অপরকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে রেখেছে যে এগুলো অবিচ্ছেদ্য একটি মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে, ফলে কেউ যদি এর একটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাহলে সে তাওহীদের শর্ত পূরণে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগবে। তাওহীদের তিনটি শ্রেণীর যে কোন একটিকে বর্জন করার অর্থই হচ্ছে শিরকে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সংগে অংশীদার স্থাপনের মাধ্যমে নিজেকে মুশরিকে পরিণত করা। মূলত ইসলামী দৃষ্টিতে তাওহীদের বিপরীত সবকিছুই পৌত্তলিকতা বলে গণ্য হয়।

তাওহীদের তিনটি শ্রেণীকে সাধারণত নিম্নোক্ত শিরোনামে বিভক্ত করা হয়:

১. التوحيد الربوبية ***তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহ*** (আক্ষরিক অর্থে-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় আল্লাহ্‌র একত্ব বজায় রাখা) অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে এ কথা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় কোন অংশীদার নেই।

২. التوحيد الأسماء والصفات ***তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত*** (আক্ষরিক অর্থে-আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব বজায় রাখা) অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে এ কথা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে, নাম, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যসহ যাবতীয় গুণাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলা এক, একক এবং নিরংকুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না।

৩. التوحيد العبادة ***তাওহীদ আল-'ইবাদাহ*** (আক্ষরিক অর্থে-'ইবাদাতে আল্লাহ্‌র একত্ব বজায় রাখা) অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে এ কথা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।[১]

রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ তাওহীদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নি, কারণ বিশ্বাস তথা ঈমানের এমন ধরণের একটি মূলনীতিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা তখন বিশেষভাবে অনুভূত হয় নি। তথাপি, কুরআন, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দ্বারা তাওহীদের শ্রেণীবিভাগগুলোর ভিত্তিমূল দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাওহীদের প্রত্যেকটি শ্রেণীকে বিস্ত

---

[১] ইবনে আবিল-'ইয্ আল-হানাফী, *শারহুল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যা,* পৃ. ১৬।

রিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলে, আশাকরি পাঠক-পাঠিকারা এ বিষয়সমূহ সহজেই স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন।

মিশর, বাইযান্টাইন, পারস্য এবং ভারতে[১] ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর এ সব এলাকার সংস্কৃতিকে আত্মীভূত করার ফলে তাওহীদের মৌলিক তত্ত্বসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সব এলাকার জনগণ যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া শুরু করে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের ধারণকৃত বিশ্বাসের কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে বহন করেছে। নতুন ধর্মান্তরিত তথা নও-মুসলিম এ সব ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের লেখায়, কথা-বার্তা এবং বক্তৃতায় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত বিভিন্ন প্রকারের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে প্রকাশ করা শুরু করলে বিভ্রান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পৃথিবীতে প্রচলিত বাতিল ধর্মমত এবং বিশেষ করে গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের কু প্রভাবে মুসলিমদের ঈমান ও 'আক্বীদায় বিভ্রান্তির মায়াজাল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, প্রকারান্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল একত্বের বিশ্বাস তাওহীদের উপর আক্রমণের সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে কতিপয় ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার প্রয়াস পায়, যেহেতু তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে বাধা দিতে অক্ষম ছিল। এ দলটি ঈমানের (বিশ্বাস) প্রথম ভিত্তি তাওহীদকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পুরো ইসলামকেই নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মুসলিম জনগণের মধ্যে গোপনে গোপনে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে, সাওসান নামে এক ইরাকী লোক যিনি খ্রিস্টান ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার পর সর্বপ্রথম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ভাগ্যের অনুপস্থিতি (ক্বদর) সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। সাওসান তার বসরাবাসী ছাত্র মা'বাদ ইবনে খালিদ আল-যুহানীকে প্রভাবান্বিত করে পরবর্তীতে আবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এদিকে মা'বাদ তার শিক্ষকের নিকটে দীক্ষা পাওয়া ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদ বাধাহীন চিত্তে প্রচারে রত হয়। পরবর্তীতে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা 'আব্দুল-মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৮৫-৭৫৫) মা'বাদকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত প্রচার করে।[২] 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (মৃত্যু ৬৯৪ ঈসায়ী) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে আবী

---

[১] দক্ষিণ এশিয়া, যেমন-বর্তমানের পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশসমূহ।

[২] ইবনে হাজর, *তাহযীব আত-তাহযীব,* (হায়দ্রাবাদ, ১৩২৫-৭), খণ্ড ১০, পৃ. ২২৫।

আওফা (মৃত্যু ৭০৫ ঈসায়ী) প্রমুখ সাহাবীর মত যে সব তরুণ সাহাবীগণ তখন জীবিত ছিলেন, তাঁরা মুসলিমদেরকে ঐসব ভাগ্য অস্বীকারকারীদের সালাম দিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন এবং তাদের মৃত্যু হলে জানাযার সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেন। অর্থাৎ তাঁরা ঐসব লোকদের কাফের হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১] তারপরেও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কীয় খ্রিস্টানী দার্শনিক যুক্তির নতুন নতুন সমর্থকের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তেই থাকে। মা'বাদের নিকটে দীক্ষা নেয়া দামেস্কবাসী ছাত্র ঘাইলান ইবনে মুসলিম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কিত বিষয়টি একাধারে সমর্থন করছিল। এজন্যে তাকে খলীফা 'উমর ইবনে 'আব্দুল-আযীযের (৭১৭-৭২০ খ্রি.) সম্মুখে হাজির করা হলে, সে তার মতামত ত্যাগ করেছে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা প্রদান করলেও খলিফার মৃত্যুর পর পুনরায় সে নিজেকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির শিক্ষকে পরিণত করে ও মানুষকে এ ব্যাপারে দীক্ষিত করতে থাকে। পরবর্তী খলিফা হিসাম ইবনে 'আব্দুল মালিক (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) তাকে বন্দী করে বিচারকার্য সম্পন্ন করার পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[২] দীর্ঘস্থায়ী এ বাদানুবাদে আরেক বিশেষ ব্যক্তিত্ব আল-যা'দ ইবনে দিরহাম, যে স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কিত দর্শন শুধু সমর্থনই করে নি, বরং নব্যসৃষ্ট নিষ্কাম প্রেমের দর্শনের আলোকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্বলিত কুরআনের আয়াতগুলির মনগড়া ভুলব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস চালায়। এ ব্যক্তিটি উমাইয়া যুবরাজ মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের গৃহশিক্ষক ছিল। পরবর্তীতে মারওয়ান চতুর্দশ খলিফা হয়েছিলেন (৭৪৪-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে)। উমাইয়া গভর্ণর কর্তৃক বহিস্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল-যাদ দামেস্কে বক্তৃতা করার সময় আল্লাহ্‌র কতিপয় গুণাবলীকে যেমন- শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছিল।[৩] তারপর আল-যা'দ কুফা নগরীতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে তার ভ্রান্ত খারেজী আক্বীদা তথা মতবাদ সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে তার মতবাদ উপস্থাপনার কাজ ও এর পক্ষে সমর্থক সংগ্রহ করার ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে জনসমক্ষে আল-যা'দের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেন। তথাপি

---

[১] 'আব্দুল-ক্বাহির ইবনে তাহির আল-বাগদাদী, *আল-ফারাক্ব বাইন আল-ফিরাক্ব,* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ), পৃ. ১৯-২০।

[২] মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দুল-কারিম আশ-শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল,* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

[৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আর-রাদ 'আলা আল-যাহিমিয়্যা,* (রিয়াদ: দার আল-লিওয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭), পৃ. ৪১-৩।

তিরমিজ ও বলখের দার্শনিক মহলে আল-যা'দের প্রধান শিষ্য যাহ্‌ম ইবনে ছাফফা'ন তার গুরুর মতবাদ সমর্থন করতে থাকে। তার এ নব্যতন্ত্রের প্রচার যখন বহু বিস্তৃতি লাভ করে তখন উমাইয়া গভর্নর নাছের ইবনে ছাইয়ার কর্তৃক ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[১]

প্রথম দিকের খলিফাগণ ও তাঁদের গভর্নরগণ ইসলামী নীতিমালার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন এবং রাসূলের সাহাবীগণ ও তাঁদের ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য জনগণের মধ্যেও সচেতনতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বিরাজ করত। তাই, প্রকাশ্য ভ্রান্ত আক্বীদার ধ্বজাধারীদের নির্মূল করার দাবীর ব্যাপারে শাসকদের নিকট হতে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যেত। অপরদিকে, এ ধরণের ধর্মীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে পরবর্তীকালের উমাইয়া খলিফাগণ খুব কমই মাথা ঘামাতেন যেহেতু তারা তুলনামূলকভাবে বেশী পরিমাণে দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তাছাড়া জনগণও ইসলামী ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম সচেতন হওয়ার কারণে ভ্রান্ত মতবাদসমূহ সম্পর্কে অধিকতর সংবেদনশীল ছিল। লোকজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংখ্যানুপাতে অধিক সংখ্যক পরাজিত জাতিসমূহের শিক্ষা-দীক্ষা আত্মীভূত হওয়ার কারণে মুসলিমদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব ঘটে এবং অখণ্ড মুসলিম সমাজে পরস্পর বিরোধী মতবাদের টানাপোড়নে সংশয় ও সংঘাত দেখা দেয়। ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা ধারণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জোয়ার প্রতিহত করতে ঐসব নব্যতান্ত্রিকদের আর প্রাণদণ্ড দেয়া হতো না। ফলে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সকল প্রকার সংশয় ও সংঘাত নিরসন এবং সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির প্রতিরোধে অর্থাৎ ভিন্ন ও বিকৃত আক্বীদার মানুষের বৃদ্ধির জোয়ার প্রতিহত করার দায়িত্ব সময়ের প্রয়োজনে ইসলামের অবিমিশ্র মত ও সঠিক পথের অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের হক্কানী উলামায়ে কিরাম তথা প্রকৃত আলেমদের উপর পড়ে, যাঁরা নিজেদের ধীশক্তি এবং জ্ঞান দিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সুপরিকল্পিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় দর্শন ও আক্বীদার বিরোধিতা করে কুরআন ও সুন্নাহ প্রসূত মূলনীতির মাধ্যমে পাল্টা জবাব প্রদান করেন। মূলত এ সব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে যথাযথভাবে নিরূপিত তাওহীদ বিজ্ঞানে বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস ও পরিভাষার অভ্যুদয় ঘটে। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার এ প্রক্রিয়াটি একই সময়ে ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে; আর একই ধরণের এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধুনা ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও

---

[১] মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দুল-কারিম আশ-শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

বিশেষজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। অতএব, তাওহীদের শ্রেণীবিভাগসমূহ পৃথকভাবে এবং অধিকতর গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সময়ে এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, এগুলো সবই একটি পরিপূর্ণ সত্তার অংশ যা একাকী একটি বৃহত্তর অবিভক্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ ইসলামের মূল ভিত্তি।

التــوحيد الــربوبـــــية

তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ (কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় একত্ব বজায় রাখা)

তাওহীদের এ বিভাগটি মূলত সেই মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে, 'কিছুই না' থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টি কর্মের দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন মেটানোর কারণ ব্যতিরেকেই সকল কিছুকে প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করেন; এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যতিরেকে তিনিই সমগ্র বিশ্বজগত ও এর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি জীবের একমাত্র রব। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার গুণ একইসাথে বর্ণনা করতে আরবী শব্দ *'রুবূবিয়্যাহ'* ব্যবহৃত হয়, যার উৎপত্তি হয়েছে মূল শব্দ *'রব'* (পালনকর্তা) থেকে। এ শ্রেণীবিভাগ অনুসারে, একমাত্র আল্লাহ্ই প্রকৃত ক্ষমতা বা শক্তি। আর তিনিই এককভাবে সকল কিছুকে গতিবিধি ও অবস্থান পরিবর্তনের শক্তি দান করেছেন। সমগ্র সৃষ্টজগতে একমাত্র তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছুই ঘটে না। এ বাস্তবতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর মুখ থেকে প্রায়ই এ ধরণের বিস্ময়সূচক বাক্য প্রকাশ পেত, *'লা হাওলা ওয়া লা কুও ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'* (আল্লাহ্ ব্যতীত বা ইচ্ছা এবং সাহায্য ব্যতীত কোন অবলম্বন নেই, কোন গতিবিধি বা শক্তি বা ক্ষমতা নেই।)[১]

কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে রুবূবিয়্যাহ সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾﴾ (سورة الزمر:٦٢)

"আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা আর তিনি সব কিছুর অভিভাবক এবং কর্ম সম্পাদনকারী।" [সূরা আয্-যুমার (৩৯): ৬২]

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (سورة الصافات: ٩٦)

---

[১] এ হাদীছটির সনদ হাসান। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদ আহমাদ, সহীহ ইবনু হিব্বান, মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুত তিরমিযী, আত-তারগীব, মাজমাউয যাওয়াইদ।

"আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আর তোমরা যা তৈরি কর সেগুলোকেও।" [সূরা আস্-স-ফফাত (৩৭): ৯৬]

﴿...وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ... ﴿١٧﴾﴾ (سورة الأنفال: ١٧)

"তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে তাতো তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন...।" [সূরা আল-আনফাল (৮): ১৭][১]

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١١﴾﴾ (سورة التغابن: ١١)

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ্ আসে না...।" [সূরা আত্তাগাবূন (৬৪): ১১]

রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন: 'তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যে, সকল মানুষ যদি তোমার জন্য ভাল কিছু করতে একত্রিত হয়, তাহলে তারা শুধুমাত্র ততটুকুই করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন। একইভাবে, সকল মানুষ যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্রিত হয়, তাহলে তারা শুধুমাত্র ততটুকুই করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য পূর্বেই লিখে রেখেছেন।'[২]

অতএব, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হিসেবে মানুষ যা কল্পনা করে তা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত এ জীবনে সংঘটিতব্য পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে সবকিছু নির্ধারিত করেছেন, ঠিক সে অনুসারেই ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴿١٤﴾﴾ (سورة التغابن: ١٤)

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা তাদের হতে সতর্ক হও।" [সূরা আত-তাগাবূন (৬৪): ১৪]

---

[১] এ ঘটনাটি একটি অলৌকিক ঘটনা। বদর যুদ্ধের শুরুতে রাসূল ﷺ তাঁর হাতে কিছু ধূলা নিয়ে শত্রু অভিমুখে নিক্ষেপ করেন। এ ক্ষেত্রে যদিও শত্রুদের অবস্থান অনেক দূরে ছিল, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা সেই ধূলি শত্রুদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেন নি। (*ইবনে হিশাম*, ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ এবং *যা'দুল মায়াদ*, ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ)

[২] এ হাদীছটি ইবনে 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং *তিরমিযি* কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন, 'ইযিদ্দিন ইবরাহীম ও ডেনিস জনসন-ডেভিস, ***আন-নববীর চল্লিশ হাদীছ,*** (ইংরেজি অনুবাদ, দামেস্ক, সিরিয়া: The Holy Quran Publishing House, 1976), পৃ. ৬৮, হাদীছ নং ১৯।

অর্থাৎ, এ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাল জিনিসের মধ্যেও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যেকের ঈমানের (বিশ্বাস) পরীক্ষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একইরূপে, এ জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন ভয়ংকর ঘটনায়ও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যেকের ঈমানের (বিশ্বাস) পরীক্ষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ (سورة البقرة:١٥٥)

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সামান্য কিছু ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের কিছুটা (সামান্য কিছু) ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব, আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।" [বাক্বারা (২): ১৫৫]

কার্যকারণ সম্বন্ধ[১] বজায় থাকলে মাঝেমাঝে সংঘটিত ঘটনাসমূহ সহজেই উপলব্ধিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আবার কখনও কখনও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দকর্মের পরিণাম সুফল হিসেবে এবং সৎকর্মের পরিণাম কুফল হিসেবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত ঘটনাসমূহ আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারটি আমাদেরকে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান এ সকল অসমতার পশ্চাতে কী গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান লুক্কায়িত রয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত জ্ঞানের অধিকারী এ নগণ্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়।

﴿... وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾﴾ (سورة البقرة: ٢١٦)

"...কিন্তু তোমরা কোন কিছু অপছন্দ কর সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবং সম্ভবতঃ কোন কিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।"
[কুরআন (২): ২১৬]

মানুষের জীবনে সংঘটিত কিছু কিছু ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হলেও অবশেষে কখনও কখনও তা সর্বোত্তম কল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হয়। আবার, কিছু কিছু ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হয়, ফলে মানুষ প্রচণ্ডভাবে পছন্দ করে; কিন্তু অবশেষে কখনও কখনও তা

---

[১] ঘটনার সঙ্গে কারণ ও কারণের সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্য ও কারণের পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধ।

সর্বোত্তম অকল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হয়। ধারাবাহিকভাবে মানুষের জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সে সব ঘটনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগের মধ্যে থেকে পছন্দ করে নিয়ে জীবন গঠন করা পর্যন্তই তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ তার জীবনে সংঘটিত এ সব ঘটনার প্রকৃত ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করতে পুরোপুরি অক্ষম। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষ চায় একটা, স্রষ্টা প্রদান করেন আরেকটা। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, 'সৌভাগ্য' ও 'দুর্ভাগ্য' সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। আর এই সৌভাগ্য কখনোই খরগোশের পা, এক বোঁটায় চার পাতা বিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ, আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী হাড়, ভাগ্যবান সংখ্যাসমূহ, রাশিচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না, অর্থাৎ এগুলো সৌভাগ্যের আলামত বা চিহ্ন নয়। অনুরূপভাবে, মাসের ১৩ তারিখের শুক্রবার, ভাঙ্গা আয়না, কালো বিড়াল ইত্যাদিও দুর্ভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু তথা উৎস নয়। মূলত যাদুমন্ত্র ও শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাতের সরাসরি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে শির্কের নামান্তর হওয়ার দরুন তা সবচেয়ে জঘন্যতম পাপে পরিণত হয়। রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর এক সাহাবী 'উক্ববাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের শপথ করার জন্য একদল মানুষ আগমন করেন। তাদের মধ্য থেকে নয়জনের শপথ রাসূল ﷺ গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ, আপনি নয়জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি ﷺ বলেন, এর দেহে একটি তা'বিজ আছে (যাদুমন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)'।[১] যে ব্যক্তিটি তা'বিজ পরেছিল সে তার জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তা'বিজটি ছিড়ে ভেঙ্গে ফেলল। অতঃপর রাসূল ﷺ তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন, যে কেউ তা'বিজ ব্যবহার করল, সে শির্ক করল।"[২]

কুচক্রী শয়তান, কুদৃষ্টি বা দুর্ভাগ্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সৌভাগ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে কুরআনকে যাদুমন্ত্রের ধারক হিসেবে তা'বিজরূপে ব্যবহার করা, মন্ত্রপূত কবচ হিসেবে কুরআনের আয়াতসমূহ গলার হারে বা কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝুলিয়ে বা হাতে বেঁধে রাখার রেওয়াজ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে তেমন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য আছে বলে দৃষ্টমান হয় না। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কেউই কুরআনকে এভাবে ব্যবহার করেন নি। রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] সাধারণত দুর্ভাগ্য এড়িয়ে সৌভাগ্য আনয়ন করতে তা'বিজ ব্যবহার করা হয়।

[২] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ৪/১৫৬; হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৫/১০৩। হাদীছটির সনদ ছহীহ্। আলবানী, *সিলসিলাতুস সাহীহাহ,* ১/৮০৯। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য হাদীছ রয়েছে।

'যে ব্যক্তি ইসলামে নতুন কিছুর প্রবর্তন ঘটায় যা এর অন্তর্ভূক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।'[১]

এ কথা সত্যি যে, সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস নামক কুরআনের এ সূরা দু'টি বিশেষভাবে যাদু (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা) দূরীভূত করার নিমিত্তে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এ সূরাগুলো ব্যবহারের সঠিক প্রণালী রাসূল ﷺ আমাদেরকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়েছেন: 'রাসূল ﷺ-এর উপর যাদু তথা কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করা হলে, তিনি 'আলী ইবনে আবী তালিবকে এ দু'টি সূরার প্রতিটি আয়াত পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতে বলেন এবং সুস্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই সূরা দু'টি পড়ে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন।[২]

রাসূল ﷺ এ সূরা দু'টি লিখে গলার মালা হিসেবে ঝুলাননি, হাতে বা কোমরবন্ধে বেঁধে রাখেন নি; তাছাড়া এ ধরণের কর্ম সম্পাদন করতে অন্যদেরকে বলেও যান নি।

التوحيد الأسماء والصفات

তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত (আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব বজায় রাখা)

এ শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি বিশেষ দিক রয়েছে:

১. প্রথমত, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা; এ সব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসী (কাফের) ও মুনাফিকদের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণনা করেন।

---

[১] 'আয়িশা কর্তৃক বর্ণিত ও ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৫, হাদীছ নং ৮৬১; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩১, হাদীছ নং ৪২৬৬ ও ৪২৬৭; ***আবূ দাউদ, আহমাদ।*** হাদীছটি হাছান, ***সুনান আবূ দাউদ*** (ইংরেজি অনুবাদ; লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯৪।

[২] 'আয়িশা কর্তৃক বর্ণিত এবং ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯৫, হাদীছ নং ৫৩৫; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯৫, হাদীছ নং ৫৪৩৯-৪০।

আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ۝٦﴾ (سورة الفتح: ٦)

"আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীকে শাস্তি দিবেন যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য আছে অশুভ চক্র। আল্লাহ্ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন আর তাদেরকে লা'নাত করেছেন। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!" [কুরআন (৪৮):৬]

অতএব, আল্লাহ্র গুণাবলীর একটি হচ্ছে ক্রোধ। এ কথা বলা অবশ্যই অসমীচীন যে, আল্লাহ্র ক্রোধের অর্থ তাঁর শাস্তি; কারণ মানুষের মধ্যে দুর্বলতার আলামতসমূহের একটি হচ্ছে ক্রোধ যা আল্লাহ্র জন্য শোভনীয় নয়। আল্লাহ্র ক্রোধ যে মানুষের ক্রোধের মত নয় তা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত ঘোষণাকে ভিত্তি করে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতে হবে:

﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝١١﴾ (سورة الشورى: ١١)

"... কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়"

[সূরা শু'আরা (৪২): ১১]

তথাকথিত মানবীয় 'যুক্তিসিদ্ধ' ভাষ্যের ধ্বজাধারীরা মুক্তচিন্তার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তা গ্রহণ করার প্রবণতাই নাস্তিকতার সূচনা করে। এ যুক্তিবাদীর ব্যাখ্যা অনুসারে, যেহেতু আল্লাহ্ নিজেকে জীবন্ত বলে ঘোষণা করে; আর মানুষও জীবন্ত কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের মত না; সুতরাং আল্লাহ্ জীবন্তও নয়, আবার অস্তিত্বশীলও নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ্র গুণাবলী ও মানুষের গুণাবলীর মধ্যে সাদৃশ্যতা শুধুমাত্র নামের ক্ষেত্রে, মর্যাদা বা তাৎপর্যের ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে গুণাবলী ব্যবহৃত হলে তা মানবীয় অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হিসেবে অসীম তাৎপর্য সহকারে গ্রহণ করতে হবে।

২. কোনপ্রকার নতুন নাম বা গুণাবলী আরোপ করা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলাকে সেভাবেই উল্লেখ করা যেভাবে তিনি নিজেকে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদিও আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি রাগান্বিত হন বা ক্রুদ্ধ

হন তবুও আল্লাহ্‌কে 'আল-গাদীব' (ক্রোধান্বিত) নামে অভিহিত করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ নামটি ব্যবহার করেন নি। এ বিষয়টি খুবই সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হলেও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভ্রান্তিকর বর্ণনা প্রতিরোধ করতে তাওহীদে আসমা ওয়াস-সিফাতকে অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মূলত এ কথাটি সবাইকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, সসীম মানুষের পক্ষে অসীম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ব্যাখ্যা বা সীমা নিরূপণ করা অসম্ভব।

৩. আল্লাহ্‌র প্রতি কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা যাবে না। তাছাড়া, আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণনা করার সময় আমাদেরকে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়। যেমন, বিকৃত বাইবেল ও তাওরাতে দাবী করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিতে ঘুমিয়েছিলেন।[১] এ কারণে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা শনিবার বা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে এবং এ দিনগুলোতে কোন কাজ করাকে পাপ মনে করে। আর এ ধরণের দাবীর মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপিত হয়। বড় ধরণের কোন কাজ সম্পন্ন করার পর মানুষ সাধারণত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই অবসাদ দূর করার নিমিত্তে সে নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[২] বিকৃত বাইবেল ও তাওরাতের অন্য জায়গায় দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তা নিজের কৃত ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন, যেমনটি সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।[৩] একইভাবে, স্রষ্টা নিজেই একটি আত্মা বা স্রষ্টার একটি আত্মা থাকার দাবী তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের কোথাও নিজেকে আত্মা বলে নির্দেশ করেন নি বা তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ এর কোন হাদীছেও এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা করেন নি। বস্তুত, আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ বলে নির্দিষ্ট করেছেন।[৪]

---

[১]জেনেসিস ২:২, "এবং প্রভু তাঁর সৃষ্টির সকল কাজ সপ্তম দিনে শেষ করার পর বিশ্রাম নিলেন। " (*Holy Bible*, Revised Standard Version, Nelson, 1951), পৃ. ২।

[২] এ বিষয়ের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেন, '*তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।*'
[সূরা আল-বাক্বারা (২):২৫৫]

[৩] এক্সোডাস ৩২:১৪, "এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন ধরণের কাজ করার চিন্তা করার কারণে প্রভু অনুতপ্ত হলেন " (Holy Bible, Revised Standard Version)

[৪] এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "*তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, 'রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)।*" [বানী ইসরাঈল (১৭) : ৮৫]

আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে কুরআনের মৌলিক নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ (سورة الشورى : ١١)

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।" [সূরা শু'আরা (৪২): ১১]

যদিও দর্শন ও শ্রবণের গুণাবলী মানবীয় গুণ, কিন্তু এ গুণাবলী আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপিত হলে তখন এগুলোর পরিপূর্ণতার ব্যাপারে কোনপ্রকার তুলনা গ্রহণযোগ্য নয়। যা হোক, দর্শন ও শ্রবণের এ গুণাবলী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করতে চক্ষু ও কর্ণ থাকা অপরিহার্য, কিন্তু স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার এমন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) মাধ্যমে যতটুকু নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন, মানুষ তার স্রষ্টা সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞানই নির্ভুলভাবে অর্জন করতে পারে। এ কারণে মানুষ তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য। স্রষ্টার গুণাবলী বর্ণনায় মানুষ তার ধীশক্তিকে অবাধে ব্যবহার করলে আল্লাহ্‌কে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে একাকার করে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থেকে যায়।

চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশের প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে অঙ্কন, খোদাই ও ঢালাই করে খ্রিস্টানরা অসংখ্য মানবীয় প্রতিকৃতি গড়ে তুলে সেগুলোকে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেছে। সাধারণ জনগণের নিকট থেকে যিশুখ্রীস্টের স্রষ্টা হওয়ার স্বীকৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সব প্রতিমূর্তি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। 'স্রষ্টা মানুষের প্রতিরূপ' এ ভ্রান্ত মতবাদটি শুধুমাত্র একবার গ্রহণ করলে যিশুখ্রীস্টকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিতে সত্যিকারভাবে আর কোনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

৪. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের তৃতীয় দিকটি হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র গুণাবলী আরোপ না করা। উদাহরণস্বরূপ, বিকৃত তাওরাতে (জেনেসিস (১৪): ১৮-২০) উল্লেখিত শালেমের বাদশাহ 'মাল্‌কীসিদ্দিক' রূপ পরিগ্রহ করেছে পলের, যা বিকৃত বাইবেলের *'New Testament'*-এ বর্ণিত হয়েছে। আদি ও অন্ত হীন হওয়ার মত স্রষ্টার গুণাবলী পল ও যিশুখ্রীস্ট উভয়ের উপরে আরোপিত হয়েছে: "অন্যান্য বাদশাহদের হারিয়ে দিয়ে যখন ইব্রাম ফিরে আসলেন তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পুরোহিত ও শালেমের অর্থাৎ জেরুজালেমের বাদশাহ 'মাল্‌কীসিদ্দিক' ইব্রামের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর ইব্রাম তাঁর উদ্ধার করা জিনিসের দশভাগের একভাগ মাল্‌কীসিদ্দিককে দিলেন।

তাঁর নামের অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় যে, ন্যায়নিষ্ঠার বাদশাহ হিসেবে তিনিই প্রথম এবং শালেমের বাদশাহ অর্থাৎ শান্তির বাদশাহ। **তার বাবা-মা অথবা বংশধারা নেই; এমনকি তাঁর কোন আদি বা অন্ত নেই, কিন্তু স্রষ্টার পুত্রের মতই তিনিও চিরদিন পুরোহিত হয়ে থাকবেন।**"[১]

"অতএব যিশুখ্রীস্টও নিজেকে প্রধান পুরোহিতের পদে পদোন্নতি দেন নি, বরং তাঁর দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল সেই ব্যক্তি যিনি তাঁকে বলেন, 'তুমিই আমার পুত্র, আর আজ আমি তোমাকে জন্মদান করলাম।' একইভাবে তিনি অন্যত্র বলেন, 'মাল্‌কীসিদ্দিকের পরবর্তী পুরোহিত তুমিই যার স্থায়িত্ব হবে চিরদিনের জন্য।'[২]

ইয়েমেনের যায়েদিরা ব্যতীত অধিকাংশ শি'য়ারা তাদের 'ইমাম'দের উপরে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,[৩] অতীত-ভবিষ্যত-অদৃষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখা,[৪] সৃষ্টির সকল অণু ও পরমাণুতে নিয়ন্ত্রণ থাকার[৫] মত স্রষ্টার গুণাবলী আরোপ করেছে। ইমামদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে তারা স্রষ্টার একক গুণাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ তৈরি করেছে।

৫. যদি আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে 'বান্দা' বা 'ভৃত্য' অর্থে ***'আবদ*** সংযোজন করা না হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সুন্দরতম ও একক নামসমূহ দ্বারা তাঁর কোন সৃষ্টির নামকরণ করা যাবেনা। স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অনেকগুলো গুণবাচক নামের মধ্যে 'রা'উফ' ও 'রহীম'-এর মত কিছু সংখ্যক নাম (আলিফ লাম ব্যতীত) মানুষের ক্ষেত্রে

---

[১] হিব্রু, ৭:১-৩, (Holy Bible, Revised Standard Version).

[২] হিব্রু, ৫:৫-৬ (Holy Bible, Revised Standard Version).

[৩] মুহাম্মাদ রিযা আল-মুযাফ্‌ফার তার লেখা বইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমরা বিশ্বাস করি, একজন ইমাম রাসূলের মতই ভুলভ্রান্তির উর্দ্ধে অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিভৃতে ও বাহ্যত, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বা অন্যায় কর্ম সম্পাদনে অক্ষম। কারণ ইমামগণ ইসলামের সংরক্ষক এবং ইসলাম একমাত্র তাঁদের তত্ত্বাবধানেই সুরক্ষিত থাকে। [***'শি'য়া ইসলামের আক্বীদা***, (আমেরিকা: *Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland*, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩). আরও দেখুন, সায়্যিদ সাঈদ আখতার রিযভী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ ***Islam,*** (তেহরান: *A Group of Muslim Brothers, 1973*), পৃ. ৩৫।

[৪] আল-মুযাফ্‌ফার আরও বলেন, 'আমরা এটাও বিশ্বাস করি, ইমামগণের অনুপ্রেরণা লাভের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতার স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করি, এ ক্ষমতাটি স্রষ্টাপ্রদত্ত। এ ক্ষমতা দ্বারা যে কোন জায়গায় অবস্থান করেও পদ্ধতিগত কারণ বা কোন পথ প্রদর্শকের পথনির্দেশ ব্যতীত ইমাম সর্বদা যে কোন কিছু সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ জানতে সক্ষম।

[৫] আল-খোমেনী বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই ইমামের মর্যাদাবান স্থান, সুউচ্চ পদমর্যাদা, সৃজনশীল খেলাফত, সৃষ্টির সকল পরমাণুর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ও একচ্ছত্র প্রাধান্য রয়েছে। [আয়াতুল্লাহ মুসাভী আল-খোমেনী, ***আল-হুকূমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ,*** (বৈরুত: আত-তালী'আ প্রেস, আরবী সংস্করণ, ১৯৭৯), পৃ. ৫২]

অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। কারণ, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের ﷺ ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ (سورة التوبة: ١٢٨)

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তাঁর নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।" [কুরআন (৯): ১২৮]

কিন্তু মানুষের নাম বুঝাতে *আর-র'উফ* (একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়) এবং *আর-রহীম* (একমাত্র সর্বোচ্চ দয়াশীল)-এর মত অন্যান্য নামসমূহ শুধুমাত্র তখনই ব্যবহৃত হতে পারে, যদি এগুলোর পূর্বে উপসর্গ হিসেবে *'আবদ* যোগ করা হয়, যেমন, *'আব্দুর র'উফ* বা *'আব্দুর রহীম*। কারণ, *আর-র'উফ* (একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়) এবং *আর-রহীম* (একমাত্র সর্বোচ্চ দয়াশীল) এর মত অন্যান্য নির্দিষ্ট নামগুলো দ্বারা শ্রেষ্ঠতার পরিপূর্ণতা প্রমাণিত হয়, যা শুধু একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র জন্যই প্রযোজ্য। একইভাবে, *'আব্দুর রাসূল* (রাসূলের বান্দা), *'আব্দুন নাবী* (নাবীর বান্দা), *'আব্দুল হুসাইন* (হুসাইনের বান্দা) ইত্যাদি নামেও কারো নামকরণ করা যাবে না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদের বান্দা হওয়ার অর্থ প্রকাশকারী নামে নিজেদেরকে নামকরণ করা প্রকৃত ইসলামে নিষিদ্ধ। এ মূলনীতির ভিত্তিতে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে ***'আবদি*** (আমার বান্দা) বা ***আমাতি*** (আমার বান্দী) বলে ডাকতে নিষেধ করেছেন।[1]

التوحيد العبادة

তাওহীদ আল-'ইবাদাহ ('ইবাদাতে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা)

তাওহীদের প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এগুলোর উপরে দৃঢ়বিশ্বাসই তাওহীদের প্রকৃত ইসলামী চাহিদার পরিপূর্ণতা দানের জন্য যথেষ্ট নয়। তাওহীদ আর-রবূবিয়্যাহ এবং তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস্

---

[1] ***সুনান আবী দাউদ,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮৫-৬, হাদীছ নং ৪৯৫৭।

সিফাত-কে তাওহীদ আল-'ইবাদাতের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত না করলে প্রকৃত ইসলাম অনুযায়ী তাওহীদের পরিপূর্ণতা বিধান কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, তাওহীদুল 'ইবাদাত হচ্ছে মূল এবং অপর দু'টি হচ্ছে তার সম্পূরক। যদিও এ তিনটি তাওহীদের যে কোন একটিকে অস্বীকারকারী মুশরিক বলে গণ্য হয়ে থাকে, তথাপি গুরুত্বের দিক বিবেচনায় তাওহীদুল 'ইবাদাত-এর গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা, তাওহীদুল 'ইবাদাত-এর মধ্যেই তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপর দু'টি কিংবা দু'টির কোন একটির মধ্যেও তাওহীদ আল-'ইবাদাত অন্তর্ভূক্ত নয়। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে সেই সত্য দ্বারা যা আল্লাহ্ তা'আলা খুবই স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন; তা হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর সমসাময়িক *'মুশরিক'*রা (মূর্তিপূজক) তাওহীদের প্রথম দু'শ্রেণীর অনেক বিষয়কে দৃঢ়ভাবে সত্য হিসেবে স্বীকার করেছিল। পৌত্তলিকদের বলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে রাসূল ﷺ-কে বলেন:

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ... ﴿٣١﴾﴾

(سورة يونس: ٣١)

"তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন, আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?' তারা বলে উঠবে, 'আল্লাহ'।..."

[সূরা ইউনুস্ (১০): ৩১]

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ... ﴿٨٧﴾﴾ (سورة الزخرف: ٨٧)

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।..." [সূরা আয্-যুখরুফ (৪৩): ৮৭]

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ... ﴿٦٣﴾﴾

(سورة العنكبوت: ٦٣)

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— আকাশ হতে কে পানি বর্ষণ ক'রে যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্।"

[সূরা আল-'আনকাবূত (২৯): ৬৩]

আল্লাহ্‌কে মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রব এবং মালিক হিসেবে জানা সত্ত্বেও মক্কার সকল মূর্তিপূজকগণ এ জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকটে মুসলিম হতে পারে নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ (سورة يوسف: ١٠٦)

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা (বিশ্বাস করা) সত্ত্বেও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা ইউসূফ (১২) : ১০৬]

এ আয়াতের উপরে মুজাহিদের[১] ভাষ্য হচ্ছে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে জীবন ও মৃত্যু দান করেন- এ ধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা প্রদানের পরেও আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য কিছুকে আহ্বান করা তথা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য কিছুর ইবাদাত করা হতে বিরত হয় নি।'[২] পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কাফেররা (অবিশ্বাসীগণ) আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানত। আদতে ভয়াবহ প্রয়োজন ও চরম দুর্দশার মুহূর্তে তারা অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে হজ্জ, দান-খয়রাত, পশু কুরবানী, মানত এবং এমনকি তাঁর নিকটে বিশেষ নিবেদনও করত। এছাড়াও, তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করত। ঐসব দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾﴾. (سورة آل عمران : ٦٧)

"ইব্রাহীম না ইয়াহুদী ছিল, না নাসারা, বরং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা আল-'ইমরান (৩): ৬৭]

মক্কার কিছু কিছু মুশরিক পুনরুত্থান, বিচার দিবস ও পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যে (ক্বদর) বিশ্বাস করত। প্রাক-ইসলামী কবিতাগুলোতে তাদের এ সব বিশ্বাসের অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, শাস্তি সম্বন্ধে কবি যুহাইর-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি বলেন, 'হয়তো এটি স্থগিত হয়েছে বা বিচার দিবসের উদ্দেশ্যে পুস্তকে লিখিত হয়েছে; নতুবা ত্বরান্বিত করা হয়েছে ও (অন্যায়ের) প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।'

---

[১] ইবনে 'আব্বাসের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন মুজাহিদ ইবনে যুবাইর আল-মাক্কী (৬৪২-৭২২)। কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত তাঁর বর্ণনাসমূহ 'আব্দুর রহমান আত-তাহির কর্তৃক সংকলিত হয়ে ***'তাফসীর মুজাহিদ'*** শিরোনামে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। *(ইসলামাবাদ: মাজমা' আল-বুহুত)*

[২] ইবনে যারীর আত্ব-ত্ববারী কর্তৃক সংগৃহীত।

এই বলে 'আন্তারা উদ্ধৃত হয়েছেঃ
'ওহে 'এবিল, আমার স্রষ্টা যদি ভাগ্যে লিখে থাকে তাহলে মৃত্যু থেকে তুমি কোথায় পালাবে?[১]

তাওহীদের স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে মক্কাবাসীদের জ্ঞান থাকার পরেও একমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদাতের সাথে তারা অন্যান্য ইলাহ্র (মূর্তি, সূর্য, গাছ ইত্যাদি) সংমিশ্রণ ঘটানোর কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ অবিশ্বাসী (কাফির) ও পৌত্তলিকগণের (মুশরিক) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুতরাং তাওহীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হচ্ছে *তাওহীদ আল-'ইবাদাহ* বা 'ইবাদাতে আল্লাহ্র একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা। সকল প্রকার 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে কারণ শুধুমাত্র তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য এবং মানুষের 'ইবাদাতের ফলাফলও একমাত্র তিনিই প্রদান করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা যোগাযোগের মাধ্যম নেই। সরাসরি একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে বারবার জোর তাকীদ প্রদান করেছেন। আর, মানুষ সৃষ্টির পিছনে এ মূল উদ্দেশ্যটিই মূলত সক্রিয় ছিল। নাবী ও রাসূলগণ কর্তৃক প্রচারিত বাণীর নির্যাসও ছিল এটিই। তাওহীদুল 'ইবাদাতকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

"আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।" [সূরা আয্-যারিয়াত (৫১): ৫৬]

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ... ﴿٣٦﴾﴾
(سورة النحل : ٣٦)

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্র 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।..." [সূরা আন্-নাহল (১৬):৩৬]

মানুষ তার সহজাত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার ক'রে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। মানুষ একটি সসীম সৃষ্টিজীব; তাই সে কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গতভাবে অসীম স্রষ্টার ক্রিয়াকলাপ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আশা

---

[১] সুলায়মান ইবনে 'আব্দুল ওয়াহহাব, ***তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,*** (বৈরুতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭০), পৃ. ৩৪।

[২] দেখুনঃ ***শারহ ছালাছাতিল উসূল লিশ শাইখ সালিহ আল 'উছাইমীন,*** পৃ. ৩৪-৩৫।

করতে পারে না। এ কারণে, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁর 'ইবাদাত করাকে মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে তৈরি করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধির নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'আলা নাবীগণকে প্রেরণ করার পাশাপাশি মানুষের মানবীয় সামর্থ্যের তুলনায় সহজে বোধগম্য করে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই আর তা হচ্ছে, একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করা এবং নাবীগণের প্রধান বাণীই ছিল, একমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদাত করা (*তাওহীদ আল-'ইবাদাত*)। এই হেতু, আল্লাহ্কে ব্যতীত বা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যের 'ইবাদাত করাই সর্ববৃহৎ পাপ, যা *'শির্ক'* বলে গণ্য।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে *সূরা আল-ফাতিহা* নামক এ সূরাটি প্রত্যেক মুসলিমের অন্ততপক্ষে সতের বার আবৃত্তি করতে হয়, এ সূরার চতুর্থ আয়াতে বলা হয়, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ *'আমরা কেবল তোমরাই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'* এ বর্ণনা দ্বারা এ কথাটি স্বচ্ছভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার 'ইবাদাত একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে যিনি প্রতিফল প্রদান করতে সক্ষম, আর তিনি হচ্ছেন একমাত্র সুমহান ও মহাপবিত্র 'আল্লাহ্'। 'ইবাদাতে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়টি রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন এ বলে যে,

'যখন তুমি কিছু প্রার্থনা কর, তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই কর; আর যখন তুমি কোন সাহায্য প্রার্থনা কর, তখন একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই কর।'[১]

কোনপ্রকার মধ্যস্থতা ছাড়াই মানুষের প্রতি আল্লাহ্র নৈকট্যের বিষয়টি অনেক আয়াত দ্বারা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝١٨٦﴾ (سورة البقرة : ١٨٦)

"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়।"

[সূরা আল-বাক্বারা (২): ১৮৬]

---

[১] ইবনে 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং *তিরমিযি* কর্তৃক সংগৃহীত, দেখুন, *আন-নববীর চল্লিশ হাদীছ,* (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ. ৬৮।

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾﴾ (سورة ق: ١٦)

"নিশ্চয়ই, আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার প্রবৃত্তি তাকে (নিত্য নতুন) যে সকল কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী।" [সূরা ক্বা-ফ (৫০): ১৬]

তাওহীদ আল 'ইবাদাত-এর দৃঢ় স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে বিপরীতক্রমে অন্যান্য সকল ধরণের মধ্যস্থতাকারী বা আল্লাহ্‌র সংগে অংশীদার স্থাপনের বিষয়ে জোরালো অস্বীকৃতি প্রদান অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। জীবিতদের বা যারা মারা গেছে তাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মৃতদের নিকটে প্রার্থনা করার দ্বারা অনেকেই আল্লাহ্‌র সংগে অংশীদার সাব্যস্ত করে। ফলে তারা ক্ষমার অযোগ্য সর্ববৃহৎ পাপ শির্‌কে লিপ্ত হয়। কারণ, এ ধরণের প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে 'ইবাদাত ভাগাভাগি করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশী স্থাপন করা হয়। নু'মান ইবনু বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাবেই বলেন, *'দু'আ বা প্রার্থনাই 'ইবাদাত*[1]

মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন:

﴿... أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾﴾

(سورة الأنبياء: ٦٦)

"... তাহলে তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত কর যা না পারে তোমাদের কোন উপকার করতে, আর না পারে তোমাদের ক্ষতি করতে?"

[সূরা আল-আম্বিয়া (২১): ৬৬]

---

[1] এ কথা বলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, 'তোমার প্রতিপালক বলেন— তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা অহংকারবশতঃ আমার 'ইবাদাত করে না, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' [সূরা গাফির (মু'মিন) (৪০): ৬০] (*সুনান আবী দাউদ*, হা/ ১৪৭৯; *সুনানুত তিরমিযী*, হা/২৯৬৯; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হা/৩৮২৮; *ছহীহ্ ইবনু হিব্বান*, ৩/১৭২; *মুসতাদরাক হাকিম*, ১/৬৬৭; হাদীছটি ছহীহ্) সুনানে তিরমিযীতে এ মর্মে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ***'দু'আ 'ইবাদতের মূল'*** তবে এ হাদীছটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীছটি বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন যে, তা যঈফ। এমনকি তারপরেই তিনি উপরের ***'দু'আ বা প্রার্থনাই 'ইবাদত'*** হাদীছটি বর্ণনা করে তা ছহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। *(দেখুন: সুনানুত তিরমিযী, ৫/৪৫৬, হা/৩৩৭১, ৩৩৭২)* আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, *'আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ বা প্রার্থনার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই।'* (হাদীছটি সহীহ। *সুনানুত তিরমিযী*, হা/৩৩৭০; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হা/৩৮২৯; *মুসতাদরাক হাকিম*, ১/৬৬৬; *সহীহ ইবনু হিব্বান*, ৩/২৫১; *মাযমাউয যাওয়াইদ*, ১/৮১)– *অনুবাদক*

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴿١٩٤﴾﴾ (سورة الأعراف: ١٩٤)

"আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তো তোমাদের মতই বান্দাহ।"

[সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৯৪]

রাসূল ﷺ বা জিন, ফিরিশতা[১] বা পীর-মাশাইখ, বুযুর্গ, দরবেশ, ওলী-আওলিয়ার নিকটে কেউ যদি সাহায্যের প্রার্থনা করে অথবা তার পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনার অনুরোধ জানায়, তবে এ ক্ষেত্রেও শির্ক সংঘটিত হয়। তাওহীদের এই শ্রেণী অনুযায়ী, নির্বোধ মানুষ কর্তৃক 'আব্দুল কাদীর আল-জীলানীকে[২] *'গাউস-ই-আযম' (আল-গাউছ আল-'আযম)* উপাধিতে ভূষিত করার

---

[১] আরবী ভাষার 'মালাক' (مَلَك) শব্দকে ফার্সী ভাষায় 'ফারিশতা' বা 'ফেরেশতা' বলা হয়। বাংলায় এ ফার্সী শব্দই প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন- খোদা, নামায, রোযা, দরুদ ইত্যাদি। এগুলি কোনটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর ইসলামীকরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষার প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায়ও এ সকল পরিভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফার্সী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার প্রচলনের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাযের পরিবর্তে সলাত, রোযার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু 'মালাক' শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে 'ফিরিশতা' বা 'ফেরেশতা' শব্দটিই সর্বত্র ব্যবহৃত। 'মালাক' শব্দটির প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা। আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আরবী 'মালাক' (مَلَك) শব্দটির অর্থ পত্র, চিঠি বা দূত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শব্দটি মূলত 'আলাক' (أَلَك) ধাতুমূল থেকে গৃহীত, মীম অক্ষরটি 'হারফ যাইদ' বা অতিরিক্ত অক্ষর। মূল শব্দটি ছিল 'মা'লাক' (مألك)। পরবর্তী কালে 'হামযা' অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পরে নিয়ে একে 'মাল্আক' (ملأك) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে 'হামযা' অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে 'মালাক' (مَلَك) বলা হয়। বহুবচনে 'হামযা' অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং বলা হয় 'মালাইকা' (ملائكة)। সর্ববস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয় নি। মালাক, মাল্আক, মা'লাক সবগুলোই শব্দেরই মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি; আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (Angel)। *(খালীল ইবনু আহমাদ, কিতাবুল আইন, ১/৪৪৫; আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, ২/১৮১; ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া, ৪/৭৮৯; যাবীদী, তাজুল আরূস, ১/৬৬৪১-৬৬৪২)* বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, পৃ. ২৪১-২৬১ -*অনুবাদক*

[2] 'আব্দুল কাদির জীলানী (রাহি.)-এর পূর্ণ নাম মুহিউদদীন আবূ মুহাম্মাদ ইবন আবী সালিহ। জন্ম ৪৭০ হি. (১০৭৭ খ্রি.) এবং মৃত্যু ৫৬১ হি. (১১৬৬ খ্রি.)। তিনি ছিলেন সূফী, ধর্ম প্রচারক ও হাম্বলী ফিক্বহের পণ্ডিত। তিনি বাগদাদের 'বাবুল আযাজ'-এর নিকট অবস্থিত হাম্বলী ফিক্বহের মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে তিনি সুযোগ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ, অকপট ও বাগ্মী প্রচারকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। *'ফাতহুর রব্বানী'* নামক পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে তাঁর বাণীসমূহ, যেখানে তিনি কুরআনের আয়াতের গূঢ়ার্থবোধক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন। *(আল-ফাতহুর রাব্বানী, কায়রো: ১৩০২ হি.)* ইবনু 'আরাবী (জন্ম ১১৬৫ খ্রি.) তাঁকে সে যামানার *'ন্যায়বান কুতুব'* বলে আখ্যায়িত করেন এবং ঘোষণা করেন

দ্বারাও শির্কের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ উপাধির পারিভাষিক[১] অর্থ হচ্ছে, 'মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস' বা 'যিনি বিপদ হতে রক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত' অর্থাৎ এমন

যে, 'আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানীর স্থান আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর উর্ধ্বে। (আল-ফুতুহাতুল মাক্কীয়, ১ম খণ্ড, ২৬২) 'আলী ইবনু ইউসূফ আশ-শাত্তানাওফী (মৃত্যু ১৩১৪ খ্রি.) *'বাহযাত আল-আসরার'* নামে এক বই রচনা করে 'আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানীর ওপর অনেক অলৌকিক ঘটনা আরোপ করেন। তাঁর নামানুসারে *ক্বাদেরীয়া* সূফী ত্বারীক্বার নামকরণ করা হয় এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আধ্যাত্মিক চর্চা ও নানা নিয়মকানুনকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। (*Shorter Encyclopedia of Islam,* পৃ. ৫-৭, ২০২-২০৫) ভক্তগণ তাঁকে *'দরবেশের সুলতান'* বলে 'মুশাহিদুল্লাহ', 'আমরুল্লাহ', 'আমানুল্লাহ', 'নূরুল্লাহ', 'কুতবুল্লাহ', 'সাইফুল্লাহ', 'ফরমানুল্লাহ', 'বুরহানুল্লাহ', 'আয়াতুল্লাহ', 'গাওছুল্লাহ', 'আল গাউছুল আযম' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকে। *(আল-ফুতুহাতুল মাক্কীয়, ১ম খণ্ড, ৪৯৩)* তবে অনেকেই শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহি.)-এর অনুসরণের দাবীতে অনেক বিদ'আত বা শির্কে লিপ্ত হন। কিন্তু ফিকহ বা আক্বীদার ক্ষেত্রে তাঁর কোন মতামতই মানেন না। তিনি শুধু মুখ ও দুই হাতের পিঠ মুছে তায়াম্মুম করতে বলেছেন, (ক্বাদ কা-মাতিস সলাহ দু'বার ব্যতীত) একবার করে ইক্বামত দিতে, যেহরী সলাতের মধ্যে জোরে আমীন বলতে, সলাতে রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার পূর্বে দু'হাত উঁচু (রাফ'উল ইয়াদাইন) করতে বলেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমানেরর হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ফিরকায়ে নাজিয়ার আলামত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি না মানাকে বাতিলদের আলামত বলে গণ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কোন মুসলিমের উচিত নয় যে সে বলবে, 'আমি নিশ্চয় মুমিন', বরং তাকে বলতে হবে যে, 'ইন্‌শা আল্লাহ্ আমি মুমিন'। ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) ও তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেন না ও 'আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না সে জন্য তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীগণকে বাতিল ফিরকা বলে গণ্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত তাকিদের সাথে লিখেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিষয়ক আয়াত প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করেন। তিনি আল্লাহ্‌কে প্রকৃত অর্থে আরশের উপরে অবস্থিত বলে বিশ্বাস করেন। তিনি লিখেছেন যে, সকল সাহাবী ও তাবিঈগণও বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত অর্থেই আরশের উপর অবস্থিত আছেন। যারা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করে তিনি তাদের নিন্দা করেছেন। *(দেখুন: আব্দুল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালিবীন, পৃ. ৬, ৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ২১১, ২২৭; আল-ফাতহুর রাব্বানী, পৃ. ১২৩)* অথচ আমরা তাঁর অতি ভক্ত হলেও তাঁর এ সকল মতামত কিছুই মানি না। উপরন্তু যাঁরা এ সকল মত মানেন তাঁদেরকে গোমরাহ, বাতিল ও জাহান্নামী বলে মনে করি, অথচ স্বয়ং 'আব্দুল কাদির জীলানীও (রাহি.) যে এদের দলের অন্তর্ভূক্ত তা অগোচরে রয়ে যায়। (দেখুন: *এহইয়াউস সুনান,* পৃ. ২২১-২২) *-অনুবাদক*

[১] ***'গাওছি 'আযম'*** -এর আক্ষরিক বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'প্রধান বা মহানের সাহায্য। আরবী 'গাউছ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সাহায্য', 'সহযোগিতা', 'সহায়তা', 'ত্রাণ', 'উদ্ধার', 'মুক্তি' ইত্যাদি। (দেখুন, *Hans Wher Dictionary of Modern Written Arabic:* By J M Cowan) এখানে আমাদেরকে এ কথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, *'আল-গাউছুল আযম'* এবং *'গাউছুল আযম'* বা *'গাউছে আযম'* -এ শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের দিকে দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যা হোক, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে কোন্ শব্দটি শির্কের অর্থ বহন করে এবং কোন্‌টি করে না, এ ধরণের ব্যাখ্যায় আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তবে আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যদি কেউ *'গাউছে আযম'* বা এ রকমের কোন শব্দ দ্বারা 'আব্দল ক্বাদির জিলানী বা অন্য কাউকে 'মুক্তি প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস' কিংবা 'বিপদ হতে রক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত' বলে উদ্দেশ্য করে তাহলে তা অবশ্যই শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। তবে, আমাদেরকে এ

একজন যিনি কাউকে বিপদমুক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু এ ধরণের উপাধি বা বর্ণনা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র জন্যই সুনির্দিষ্ট। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অনেকেই 'আব্দুল কাদিরকে এ উপাধিতে ডাকার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহায্য ও তত্ত্বাবধান আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। এমনকি যদিও আল্লাহ্ অনেক আগেই আমাদেরকে জানিয়েছেন:

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ... ﴿١٧﴾﴾ (سورة الأنعام: ١٧)

"আল্লাহ্ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না ...।" [সূরা আল-আন'আম (৬): ১৭]

কুরআনে উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে, মক্কাবাসীদেরকে তাদের মূর্তির নিকটে প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দেয়:

﴿...مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ... ﴿٣﴾﴾ (سورة الزمر: ٣)

"... আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে ...।" [সূরা আয্-যুমার (৩৯): ৩]

মূর্তিগুলোর প্রতি কৃত আচার-অনুষ্ঠানের কারণেই নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা অন্য কিছুকে শুধুমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নির্ধারণ করার জন্যও তাদেরকে পৌত্তলিক (মুশরিক) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের 'ইবাদাত করার প্রতি তাকীদ দেয়, তাদেরকে এ বিষয়টির উপর ভালভাবে দৃষ্টিপাত করে গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত।

তার্ষ নগরীর শৌলের (পরবর্তীতে পৌল নামকরণ করা হয়) শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্টানরা নাবী ঈসা ﷺ-এর উপরে প্রভুত্ব আরোপের মাধ্যমে তারা ঈসা ﷺ এবং তাঁর মাতার 'ইবাদাত করত। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বিদের মধ্যে ক্যাথলিকরা তাদের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসবের জন্য কিছু সংখ্যক সন্ত[১] রয়েছে যাদের নিকটে তারা প্রার্থনা করে এই ভেবে যে এ সব সন্তরা এ বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন জাগতিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্ এবং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও ক্যাথলিকরা তাদের

কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ শব্দসমষ্টি এবং অনুরূপ অন্যান্য শব্দসমষ্টি যা আক্ষরিকভাবে এমন অর্থ বহন করে যা বাহ্যিক অর্থের দিক থেকে সরাসরি শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। -*অনুবাদক*

[১] গির্জা কর্তৃক ঘোষিত পুণ্যবান ব্যক্তি যিনি মর্ত্যে পূত জীবন যাপনের ফলস্বরূপ স্বর্গে গিয়ে স্রষ্টার কৃপাধন্য হয়েছেন বলে খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করে।

পুরোহিতদেরকে[১] মূল্যায়ন করে থাকে। এটি এ কারণে যে, এ ক্যাথলিকরা সেই ভ্রান্তবিশ্বাস ধারণ করেছে যে এ সব পুরোহিতরা তাদের অনূঢ় অবস্থা ও ধার্মিকতার ফলে আল্লাহ্‌র খুবই নিকটে যেতে সক্ষম হওয়ার কারণে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁদের প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কে বিকৃত আক্বীদার ফলশ্রুতিতে 'আলী, ফাতিমা, হাছান ও হুছাইনের নিকটে প্রার্থনার জন্য শিয়াদের অধিকাংশই সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন ও দিনের কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘন্টার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে।[২]

ইসলামী দৃষ্টিতে 'ইবাদাতের মধ্যে শুধু সলাত আদায় করা, সাওম পালন করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জে গমন করা ও পশু কুরবানী করাই অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ভালবাসা, বিশ্বাস, ভয় ও ভীতির মতো আরো অনেক আবেগ এবং অনুভূতিমূলক বিষয়াদিও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান। আর এ সব আবেগের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। আল্লাহ্ এ সকল আবেগকে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোতে অতিরঞ্জন করার বিরুদ্ধে নিম্নোক্তভাবে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ... ﴿١٦٥﴾﴾

(سورة البقرة: ١٦٥)

"আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের ভালবাসা সবচেয়ে গভীর...।"

[সূরা বাক্বারা (২): ১৬৫]

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٥﴾﴾ (سورة البقرة: ١٣)

"তোমরা সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই কেন করবে না যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল? প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর?

---

[১] খ্রিস্টীয় গির্জার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতবিশেষ, বিশেষত অ্যাংলিকান, সনাতন (অর্থোডক্স) ও রোমান ক্যথলিক গির্জার ডিকন ও বিশপের মধ্যবর্তী পদমর্যাদাসম্পন্ন পুরোহিত।

[২] মুহাম্মাদ ﷺ এর কনিষ্ঠা কণ্যা ফাতিমার সঙ্গে রাসূলের চাচাত ভাই 'আলী ইবনে আবী তালিবের বিবাহ হয় এবং হাছান ও হুছাইন তাঁদের পুত্র।

তোমরা যাকে ভয় করবে তার সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন আল্লাহ্ যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।" [সূরা বাক্বারা (২): ১৩]

﴿...وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾﴾ (سورة المائدة: ٢٣)

"... তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।" [সূরা আল-মায়িদা (৫): ২৩]

পারিভাষিক অর্থে 'ইবাদাত হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র আজ্ঞানুবর্তী হওয়া এবং আল্লাহ্কে চূড়ান্ত বিধানদাতা বলে গণ্য করা।[১] অতএব, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে (শরী'আত) ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে ধর্মনিরপেক্ষ আইন-কানুন বাস্তবায়ন করাও স্রষ্টা প্রদত্ত বিধান ও পরিপূর্ণ ধর্মের সত্যতায় অবিশ্বাস করার নামান্তর। আর এ ধরণের বিশ্বাসও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের 'ইবাদাতের তথা শির্কের শামিল। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন:

﴿...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ (سورة المائدة: ٤٤)

"... আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" [সূরা আল-মায়িদা (৫): ৪৪]

খ্রিস্টান ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত রাসূলের ﷺ সাহাবী 'আদী ইবনে হাতিম একদা রাসূল ﷺ -কে নিচের এ আয়াত পড়তে শুনলেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ... ﴿٣١﴾﴾ (سورة التوبة: ٣١)

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে...।" [সূরা আত্-তাওবাহ (৯): ৩১]

তাই তিনি বললেন, 'আমরা নিশ্চয়ই তাদের 'ইবাদাত করি না।' রাসূল ﷺ তার দিকে ফিরে বলেন, 'আল্লাহ্ যাকে বৈধ (হালাল) করেছেন, তারা কি সেটা অবৈধ (হারাম)[২] করে নি এবং ফলে তোমরাও সেটাকে হারাম বলে গণ্য করেছ; আবার, আল্লাহ্ যাকে অবৈধ (হারাম) করেছেন, তারা কি সেটা বৈধ (হালাল)[৩]

---

[১] আল্লাহ্কে চূড়ান্ত বিধানদাতা বলে গণ্য করাই 'ইবাদাত নয়, বরং আল্লাহ্র আইনকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করাই হচ্ছে 'ইবাদত। তাছাড়া, 'ইবাদাতের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভালবাসা ও সম্মান সহকারে তার সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলা এবং বিশেষ অর্থে 'ইবাদাত হচ্ছে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যত কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন শারী'আত নির্দেশিত পন্থানুযায়ী তা করা। *(দেখুন: শারহু ছালাছাতিল উসূল লিশ্ শাইখ সালিহ আল উছাইমীন, ৩১ পৃ.) -অনুবাদক*

[২] খ্রিস্টান যাজকেরা একাধিক বিবাহ এবং আপন চাচাত ভাই বা বোনকে বিবাহ করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। রোমান ক্যাথলিকরা সর্বসম্মতভাবে পুরোহিতদের জন্য বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

[৩] শূকরমাংস, রক্ত ও মদ খাওয়া খ্রিস্টান গির্জা হালাল করেছে। কেউ কেউ আবার স্রষ্টাকে মানুষের অবয়বে অংকণ ও মূর্তি নির্মাণ করাকে হালাল করেছে।

করে নি এবং ফলে তোমরাও সেটাকে হালাল বলে গণ্য করেছ? সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই তা করেছিলাম।' তারপর রাসূল ﷺ বলেন, 'এভাবেই তোমরা তাদের 'ইবাদাত করতে।'[১]

এ কারণে, যে দেশের পুরো জনসংখ্যার বেশিরভাগই মুসলিম সেখানে শরী'আতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা তাওহীদ আল-'ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ দিক। তথাকথিত অনেক মুসলিম দেশে স্রষ্টার আইনকে পুনরায় চালু করতে হবে যেখানে ইসলামী আইন হয় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত নতুবা খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সরকার পরিচালিত হচ্ছে আমদানীকৃত পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অনুযায়ী। একইভাবে, শরী'আত যেহেতু মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের সাথেই সম্পর্কযুক্ত তাই সে সব মুসলিম দেশে ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে ইসলামী আইন শুধু গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইন সক্রিয়। মুসলিম দেশে শরী'আতের পরিবর্তে অনৈসলামি আইনের স্বীকৃতি প্রদান মূলত শির্ক হিসেবে গণ্য এবং কুফরী কর্ম।[২]

---

[১] *তিরমিযী* কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] তবে, কারও কৃত বড় ধরণের কোন গুনাহের কারণে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। কোন মুসলিম শাসক যদি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী শাসন না করেন, তাহলে উক্ত শাসকের আক্বীদা-বিশ্বাসের (যদিও এর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন) জন্য আমরা তাকে কাফির বলতে পারি না। কারণ, সে যদি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা শাসন করা অপরিহার্য কিন্তু অপারগতার কারণে এবং পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বা যে কোন চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়, তাহলে আমরা তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করব। এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এবং সেগুলোর বিশুদ্ধ তাফসীরের আলোকে হক্বপন্থী বিদ্বানগণ আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসনের চার-পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন: (১) যে ব্যক্তি মানবরচিত বিধানকে আল্লাহ্‌র বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির, (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির, (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির, (৪) যে ব্যক্তি মানবরচিত বিধানকেই আল্লাহ্‌র বিধান বলে দাবী করবে সেও কাফির, (৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা শাসন করা অপরিহার্য কিন্তু অপারগতার কারণে এবং পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বা যে কোন চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না। (দেখুন, আল-উরওয়াতুল উছক্বা, ১৬৭ পৃ. এবং আল-জিহাদ ওয়াল ক্বিতাল ফিসসিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ, ১/৩০৭ পৃ.।)

কাফির আখ্যাদানের ফিৎনা ও তার নিয়মাবলী

(ক) কাফির আখ্যাদানের বিধান:

প্রথমত কাফির আখ্যাদান বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সতর্ক বাণী ঃ

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নেবে, কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও', তোমরা ইহজগতের সম্পদের আকাঙ্ক্ষা কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের জন্য প্রচুর গনীমত আছে। তোমরাও এর পূর্বে এ রকমই ছিলে (অর্থাৎ তোমারাও তাদের মতই তোমাদের ঈমানকে তোমাদের কওম থেকে গোপন করতে), তৎপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কৃপা

করেছেন, কাজেই আগে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নিবে; তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আন্ নিসা: ৯৪)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীরে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি ছাগল পাল চরাতে চরাতে নাবী (ﷺ)-এর একটি সাহাবী দলের (যারা সম্ভবত যুদ্ধের সফরে ছিলেন) পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কালে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করল। তারা ধারণা করে বললেন, এ লোক কেবল আমাদের থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সালাম দিয়েছে। এ বলে তারা তাকে হত্যা করলেন। আর তার ছাগলগুলো গনীমতের মাল হিসেবে নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি নাযিল হয়।(হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাছান ছহীহ বলেছেন। তাফসীর ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৪) এ আয়াতে সালাম প্রদানকারীকে মু'মিন নয় বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে। ব্যাপক তদন্ত ও যাচাই বাছাই ছাড়া এ ধরণের ব্যক্তিকে কাফির বলা এবং তাকে হত্যা করা মহা অন্যায়।

কাফির আখ্যাদান বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সতর্ক বাণী ঃ

নাবী (ﷺ) হতে 'আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 'যে কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করলে, তার এ উক্তি তাকেসহ দু'জনের একজনের দিকে ফিরে আসবে।' *(বুখারী: ৬১০৩, ৬১০৪)*

তিনি আরও বলেন: 'যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিলে তাদের দু'জনের যে কোন একজন কাফির হিসেবে গণ্য হবে।' *(ইমাম আহমাদ ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ৪৪, ৪৭, ৬০, ১০৫)* তিনি আরও বলেছেন: 'যদি কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এ কাফির, তাহলে তার এ উক্তি তাদের দু'জনের একজনের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হচ্ছে সত্যিই যদি সে কাফির হয় তাহলে সে কাফির। নতুবা কাফির বলে সম্বোধনকারীই কাফির হয়ে যাবে।' *(আহমাদ, হাদীছ নং ৫৭৯০)* আরও বলা হয়েছে, আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে পাপাচারী ও কাফির বলে সম্বোধন করে আর যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তি সেরূপ না হয় তাহলে তার এ উক্তি তার (সম্বোধনকারীর) ক্ষেত্রেই প্রত্যাবর্তিত হবে। *(বুখারী, হাদীছ নং ৬০৪৫)* সাবিত ইবনু দাহহাক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যদি কেউ কোন মু'মিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে।' (*বুখারী,* আস-সহীহ, ৫/২২৪৭, ২২৬৮)

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। কারণ কাফির হয়ে যাবে এমন কোন কাজ না করলে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া না জায়েয। এই অর্থে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

(খ) কাফির আখ্যাদানের প্রবণতা ও কতিপয় কারণ :

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের অভিশাপ দেয়ার এবং কাফির ও ফাসিক্ব আখ্যাদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শারী'আতের নীতিমালা ও জ্ঞান চর্চার কোনই পরোওয়া করা হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হবার কারণে (হালালকে হারাম না জানলে) তাকে কাফির বলে সম্বোধন করা যায় না। যদিও তার অপরাধ বা গুনাহটি কবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শাইখ আলবানী বলেন, 'শুধুমাত্র সরকার প্রধানদেরকে নয় বরং সাধারণ মুসলিমদেরকেও কাফির আখ্যাদানের বিষয়টি একটি অতি পুরাতন ফিৎনা। ইসলামের মধ্যে খারেজী নামে একটি দল এরূপ ফিৎনার অবির্ভাব ঘটায়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন নামে তাদের অনুসারী রয়েছে। তাদের একটি দল হচ্ছে 'ইবাযিয়া'। এমনকি তারা মসজিদের ইমাম, খাতীব, মুয়াযযিন ও খাদিমদেরকে কাফির আখ্যা দিচ্ছে। তাদেরকে যদি বলা হয় এদেরকে সহ বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে কী অপরাধের

জন্য কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বলে: তাদেরকেও কাফির আখ্যা দেয়া হচ্ছে এ কারণে যে তারা সে সব সরকারের হুকুমে সন্তুষ্ট যারা আল্লাহ্‌র বিধান ছেড়ে অন্য কিছুর দ্বারা ফায়সালা করছে।' *(শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ 'ফিৎনাতুত তাকফীর' পৃ. ১২ ও ২২)* তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি জেনে শুনে গুনাহ্‌র কাজকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যিনা করে অথবা চুরি করে অথবা মদপান করে তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ সব হারাম কর্মকে হালাল মনে না করবে। তবে এ সব গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে তাকে ফাসিক্ব বলা যাবে। *(ফিৎনাতুত তাকফীর গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৬)*

কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি এমন দলীল প্রমাণ মিলে যায় যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সব বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন সে সবকে হারাম হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না, তখন তাদেরকে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে হুকুম লাগানো যাবে। আবার, কোন ব্যক্তি যদি মনে প্রাণে হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য করে অথচ আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কাফির হিসেবে হুকুম লাগানোর কোন উপায় নেই। কারণ এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর বাণীতে বর্ণিত শাস্তির আওতায় পড়ে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই সাহাবীর প্রসংগ উল্লেখ করতে পারি যিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। যখন এক মুশরিক দেখল যে, সে এ মুসলিম সাহাবীর তরবারীর আওতায় পড়ে গেছে তখন সে বলে ফেলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সাহাবী তার এ কথার প্রতি কর্ণপাত না করে বেপরোয়াভাবে তাকে হত্যা করে ফেলল। যখন এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করলেন। সেই সাহাবী যুক্তি পেশ করে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো হত্যার ভয়ে তা বলেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেখেছ?

অতএব, বুঝা গেল যে, বিশ্বাসগত কুফরের আমলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং তার সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। আমরা ফাসিক্ব, ফাজির, ব্যভিচারী, চোর ও সুদখোরের অন্তরে কি আছে তা জানতে সক্ষম নই। সুতরাং এ সব পাপের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিতে পারি না। (ফিৎতাতুত তাকফীর, পৃ. ২৬)

এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে একটি হাদীছ উল্লেখ করতে পারি। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে তোমরা তাকে হত্যা কর।' *(বুখারী, হাদীছ নং ৩০১৭)* ফলে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ না করবে তাকে হত্যা করা হারাম। তবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী হিসেবে তাকে গণ্য করা যাবে এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

শায়খ আলবানীর দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে কুফর আখ্যাদানের দু'টি কারণ:

(ক) ইলমী অজ্ঞতা এবং দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা।

(খ) সঠিক ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি ও শারঈ নীতিমালা যথার্থভাবে না বুঝা। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ১৩)*

তবে এ ক্ষেত্রে আল্লামা সালিহ্ আল উছায়মীন আরেকটি কারণ সংযোজন করেছেন সেটি হচ্ছে: অসৎ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে অসৎ বুঝের অধিকারী হওয়া। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ২০)*

(গ) কাফির আখ্যাদানের পক্ষের দলীল ও তার খণ্ডন :

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সরকার বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাফির আখ্যাদানের মূলে যে দলীলটি দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই বাণী: *'আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।'* (সূরা মায়িদাহ: ৪৪) অথচ আমরা সকলে জানি যে, এ আয়াতটির শেষ অংশের শাব্দিক ভিন্নতার সাথে আরো দু'টি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম' (সূরা মায়িদাহ: ৪৫) এবং *"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই ফাসিক্ব'* (সূরা মায়িদাহ: ৪৭)

সেই চরমপন্থী দলের অনুসারীরা জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে শুধুমাত্র ১ম আয়াতটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে এবং এ আয়াত দ্বারা সরকারের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যাবে- এ মতকে বৈধতা প্রদান করেছে। তাদের আক্বীদা এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা না করে সে কুফরী

করল। তার মাঝে ও ইসলাম বহির্ভূত ইহূদী, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য মুশরিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ১৭)

উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ ঃ

উক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে 'তারাই কাফির'- এ কুফর দ্বারা আসলে কী বুঝানো হয়েছে? এর দ্বারা কি সেই কুফরকে বুঝানো হয়েছে যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়? নাকি অন্য কিছু? কারণ কখনো কখনো কুফর দ্বারা 'আমলের ক্ষেত্রে কুফরকে (কুফরে 'আমালী) বুঝানো হয়ে থাকে, যা ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনু কাছীরে এসেছে:

আলী বিন ত্বালহা ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'আল্লাহ্র বাণী *'যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে তারা কাফির'* এর মর্ম হচ্ছে যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকারবশতঃ বর্জন করে তারা কাফির। কিন্তু আল্লাহ্র বিধানকে যথাযোগ্য স্বীকার করার পর যদি তা দ্বারা শাসন না করে তবে যালিম ও ফাসিক।' (ইবনু কাছীর, ২/৮৫-৮৬)

অপর বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: 'তোমরা এ কুফর দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চাচ্ছ তা নয়। এটি এমন কুফর নয় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বরং এ কুফর দ্বারা বড় কুফরের নিম্ন পর্যায়ের কুফরকে বুঝানো হয়েছে।' (ইমাম হাকিম, *'আল-মুসতাদরাক'*, ২/২১২; তিনি বলেন এ আছারটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী ছহীহ, ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু কাছীর তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনু আবী হাতিম সূত্রে আছারটির প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করে বলেন, এর সনদটি হাছান)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) যাদেরকে সম্বোধন করে উক্ত কথাটি বলেন সম্ভবত তারা সেই খারেজী সম্প্রদায় যারা 'আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্ব হতে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরিণতিতে তারা মু'মিনদের রক্ত প্রবাহিত করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু ঘটিয়েছিল যা তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে করে নি। অথচ বিষয়টি সেরূপ নয় যেরূপ তারা ধারণা করে। বরং এটি সেই কুফর যে কুফর দ্বারা কেউ ইসলাম থেকে বের হয় না। (ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ১৯)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মতের স্বপক্ষে কতিপয় হাদীছ ও আয়াত:

শাইখ উছায়মীন (রাহি.) বলেন, শাইখ আলবানী সহ আরো অনেক ইসলামী বিদ্বান উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত এ আছারটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ, কুরআনে বহু আয়াত ও হাদীছের মধ্যে এর সত্যতার প্রমাণ মিলে। নাবী (ﷺ) বলেছেন: 'কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা হল কুফরী।' (*বুখারী*, হা/৪৮; *মুসলিম*, হা/৬৪) সকল সালাফদের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত এই যে, কোন মুসলিমকে হত্যাকারীর কুফরী এমন কুফরী নয় যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। কেননা আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন: 'মু'মিনদের দু'টি দল যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে... (সূরা হুজরাত: ৯)

কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছারটিকে যারা পছন্দ করে না তারা বলে যে, 'এ আছারটি গ্রহণযোগ্য নয়, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে ছহীহভাবে বর্ণিত হয় নি।' তাদেরকে বলা হবে, কীভাবে ছহীহ নয়? এ আছারকে তারাই গ্রহণ করেছেন যারা আপনদের চেয়ে উত্তম ও হাদীছ সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ। অথচ আপনারা বলছেন, আমরা গ্রহণ করব না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেই যে, আপনাদের কথাই ঠিক অর্থাৎ ইবনু 'আব্বাসের আছারটি ছহীহ নয়। তবুও কিন্তু আমাদের নিকট অন্যান্য দলীল রয়েছে। 'কুফর' শব্দটি কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সব স্থানে এর দ্বারা সেই কুফরকে বুঝানো হয় নি যে কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এর জ্বলন্ত প্রমাণ একটু পূর্বে উল্লেখিত *বুখারী* ও মুসলিমের হাদীছ (... এবং হত্যা করা হল কুফরী)। এ হাদীছে কুফর অর্থ নাফরমানী বা আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া। নাবী (ﷺ)-এর বাণীতে এসেছে : 'মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দু'টি বিষয় কুফরী। বংশকে দোষারোপ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য জাহিলী যুগের রীতিতে ক্রন্দন করা।' (*মুসলিম*, হা/৬৭) সঠিক

আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলিম ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন যে, এ কুফরী ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এ হাদীছটি প্রমাণ করছে যে, সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস যা বলেছেন তাই সঠিক। অর্থাৎ কুফরী বলতে বুঝানো হয়েছে বড় কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের কুফরীকে। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সূরা হুজরাতের ৯ নং আয়াতের মধ্যে মু'মিনদের মধ্য হতে সীমালংঘনকারী দল সত্যপন্থী দলের বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত হলেও তাদেরকে কুফর আখ্যা দেন নি। অথচ হাদীছে বলা হয়েছে 'হত্যা করা কুফরী'।

অথএব সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস যা বলেছেন তাই সঠিক। এ কুফরী দ্বারা সেই কুফরীকে বুঝানো হয়েছে যা আসল কুফরীর নিম্ন পর্যায়ের। এটিই সঠিক। অর্থাৎ এ কুফরী বলতে কুফরী 'আমলী, কুফরী ই'তিক্বাদী নয়। (ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ১৯-২২)

(ঘ) তাকফীর বা কুফর প্রতিপন্ন করার নিয়মাবলী :

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন পাপকর্ম বা কবীরাহ গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে কাফির হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বিদিত স্পষ্ট কোন রুকন ও ফরয অস্বীকার না করে যেমন, সলাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। অথবা কোন স্পষ্ট বিদিত গুনাহের কাজকে হালাল মনে না করে, যেমন, আল্লাহকে গালি দেওয়া, রাসূলকে গালি দেওয়া, কুরআনকে পদদলিত করা ও অবমাননার জন্য পুড়িয়ে ফেলা, ব্যভিচারকে বৈধ জানা ইত্যাদি।

কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় ও ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী কিছু যুব সমাজ বিভিন্ন পাপ কর্মের কারণে অপর মুসলিম ও গোষ্ঠীকে কাফির বলে থাকে। বিশেষ করে, দেশের শাসকগোষ্ঠীকে কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে তাদেরকে কাফির মনে করে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের সূরা মায়িদার ৪৪-৫৫ আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ বলেছেন, *'আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির ...তারাই জালিম ...তারাই ফাসিক।'* উল্লেখ্য যে, কুরআনের বিধান দ্বারা শাসন না করার কারণে শাসকগোষ্ঠীকে কাফির মনে করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে অনিবার্য মনে করে এবং দেশে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াত কেন্দ্রিক তাদের বুঝ ব্যবস্থা ও সে বুঝ অনুযায়ী পরিচালিত জঙ্গী তৎপরতার মূলে রয়েছে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। তার কারণ কুফরী কাজ করার পরও কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফির প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী তার ভিতর না পাওয়া যাবে এবং অন্তরায় সমূহের বিলুপ্তি প্রমাণিত না হবে।

(ঙ) কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী :

১. **জ্ঞান থাকা:** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন ও হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান না দিয়ে কাফির বললে নিজেই কাফির হয়ে যাবে। কারণ, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু'জনের একজনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে ভাল, নইলে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে। (বুখারী, হা/৬১০৪ এবং *মুসলিম*, হা/৬০)

২. **ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা:** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন ও হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং তা বাস্ত

বায়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকার কারণে কুফরী কাজ করে তবে কাফির হবে না।

৩. **স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা:** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন ও হাদীছের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অপরাধে জাড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে জড়িতে হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও হাদীছের প্রমাণভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সরকার ও সরকারী দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ও পাপ থাকলেই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসন করতে না পারলে ঢালাওভাবে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আনুগত্য ত্যাগ করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না।

(চ) কুফর আখ্যাদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের উক্তি

ইমাম মালিক (রাহি.) বলেন: নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যাদানের সম্ভাবনা থাকে আর এক দিক থেকে তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুসলমানের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসেবেই আমি গণ্য করব। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২)*

ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) বলেন: ঈমানের দাবীদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মু'মিন বলে ধরে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোন কুফরী বা শির্কী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোন ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোন ওযরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে এ হল ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। (আল-ফিকহুল আকবার, পৃ, ১৭)

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলেমদের উদ্দেশ্যে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহি.) বলতেন: তোমরা যে সব কথা বল আমি যদি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬৩)*

ইমাম নাবাবী (রাহি.) ছহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন: জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে কিবলাপন্থী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে, সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নব মুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়মকানুন পৌঁছে নি, সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনরূপভাবে যদি যিনা অথবা মদ পান অথবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২)*

ইবনু তাইমিয়াহ (রাহি.) বলেন: কখনও কখনও মৌখিক কথা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয়। এর ফলে এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে যে, যে ব্যক্তি এরূপ বলবে সে কাফির। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে তাহলে নির্দিষ্ট করে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না- যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কাফির হিসেবে প্রমাণ করে। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৭৩)*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব (রাহি.) বলেন: কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আব্দুল কাদির জিলানী অথবা সাইয়্যিদ বাদাবীর ক্বরে সিজদাহ করে, তাহলে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদাহ করে তাহলে সে কাফির।

যাদের এ ব্যাপারে ক্ষমতা আছে তাদেরকে অবশ্যই এ সকল অনৈসলামি আইন পরিবর্তন করতে হবে, যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদেরকে অবশ্যই এ সকল কুফরী আইনের বিরুদ্ধে নিজের স্পষ্ট মতামত যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে হবে এবং শরী'আতের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানাতে হবে।[১] এমনকি এটা করাও

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহি) বলেনঃ সে সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না, কারণ তাদের নিকট আখ্যাদানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয় নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ নেই যারা জনগণের দারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৭৪)*

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায (রাহি.) বলেনঃ খারেজি সম্প্রদায় গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও শাস্তির দিক থেকে (অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারেজীদের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কুফর এবং ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানের পর্যায়ভুক্ত করেছে। নিঃসন্দেহে এ সবই ভ্রষ্টতা। আহ্‌লুস সুন্নাহগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই চির সত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল না জানবে। *(ফিৎনাতুত তাকফীর, পৃ. ৫৯)*

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত মূলনীতির প্রতি সাহাবীগণের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তাঁরা কখনো খারিজীদেরকে কাফির বলেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু কখনো 'আলী (রাঃ) বা অন্য কোন সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন, এমনকি এদের ইমামতিতে সলাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি। উপরন্তু ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক ও প্রশাসনের ক্ষেত্রেও একই মূলনীতি প্রযোজ্য। যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী বিধানানুসারে বিচার করা অপ্রয়োজনীয় অথবা ইসলামী আইনকে এ যুগে অচল বা বাতিল বলে মনে করেন তবের তিনি নিঃসন্দেহে কাফির বা অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ইসলামের নির্দেশকে সঠিক জেনেও জাগতেক লোভ, স্বার্থ, ভয় ইত্যাদি কারণে ইসলাম বিরোধী বিচার-ফায়সালা দেন তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না, বরং পাপ বলে গণ্য হবে। বিশেষত যে ব্যক্তি নিজেকে মু'মিন বলে দাবী করছেন, তিনি 'আল্লাহ্‌র আইন' অমান্য করলে বা 'আল্লাহ্‌র আইনের বাইরে বিচার-ফায়সালা দিলে' তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা তার কুফরী প্রমাণিত হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা ও হেফাযত করুন।

[১] **সরকারী লোকদের অন্যায়ের প্রতিবাদের পন্থা ঃ** আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি অন্যায় করতে দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ (ঘৃণা) করবে। এটিই হচ্ছে সব চাইতে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (সহীহ *মুসলিম,* হা/৪৯; *তিরমিযী,* হা/২১৭২; নাসাঈ, হা/৫০০৮) কোন কোন আলিম হাত দিয়ে প্রতিবাদ করাকে সরকার ও সরকারী পর্যায়ের লোকদের সাথে খাস করেছেন আর কথার দ্বারা প্রতিবাদকে আলিমদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু মতটি দুর্বল। সক্ষম প্রত্যেক মুসলমানই হাত দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে।

তবে হাত দিয়ে প্রতিবাদ করার অর্থ কি তা জানা অতি জরুরী ঃ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বানগণের মতামত উদ্ধৃত হল-

ইমাম আহমাদ (রাহি.) বলেনঃ হাত দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অর্থ তরবারী ও অস্ত্রের দ্বারা নয়।

ইবনু মুফলিহ (রাহি.) বলেন: সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে তাদের সামনে দুনিয়া ও আখিরাতের অমঙ্গলজনক পরিণতির কথা উল্লেখ করে, নাসীহাত, ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে। এ পরিমাণই হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। তাছাড়া অন্য কোন পন্থা ব্যবহার অবৈধ। কাযী ও অন্যান্য বিদ্বানগণও এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রাহি.) বলেন: 'সরকারকে সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজ হতে নিষেধের ব্যাপারে যতটুকু করা জায়েয তা হচ্ছে: তাকে অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করা এবং নাসীহাত বরা। পক্ষান্তরে যদি কর্কশ ভাষায় কথা বলা যেমন, 'এ সরকার যালিম!', 'এ সরকার আল্লাহ্‌কে ভয় করে না', এরূপ ভাষা যদি ফিৎনাতে উসকে দেয় ও তার অনিষ্টতা যদি অন্যকেও গ্রাস করে তাহলে তা না জায়িয। তবে যদি শুধুমাত্র দাঈ নিজে বিপদে পড়ার আশংকা করে তাহলে অধিকাংশ আলিমের নিকট জায়িয আছে। আমি মনে করি নিজের বিপদের আশংকা থাকে তবে সেটুকুও নিষেধ। (আল-আদাবুশ শারী'আহ, ১/১৯৫-৯৭ ও মু'আমালাতুল হুক্কাম, পৃ. ৪১)

এ কারণেই হাত দ্বারা (বা অস্ত্র ব্যবহার করে) রাসূল ﷺ শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অনুমতি দেন নি। এর ফলে আরো বৃহৎ ফিৎনা-ফাসাদ ও অন্যায় ঘটার আশংকা থাকে। বাস্তবেও এরূপ ঘটেছিল।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার স্তর চারটি ঃ

(১) অন্যায় অপসারিত হবে আর স্থলাভিষিক্ত হবে বিপরীতমুখী ভাল কিছু। (২) অন্যায় কমে যাবে যদিও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হয়। (৩) এক অন্যায় অপসারিত হলেও অনুরূপ আরেকটি অন্যায়ের আগমন ঘটবে। (৪) অপসারিত অন্যায়ের চেয়েও আরো অমঙ্গলজনক পরিণতি ডেকে আনবে।

প্রথম দু'টি স্তর শরী'আত সম্মত। তৃতীয় স্তর ইজতিহাদ ও গবেষণা করে দেখার বিষয়। চতুর্থ স্তরটি হারাম। (দেখুন ইবনু উছাইমীন (রাহি) প্রণীত শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিয়াহ, ২/৩৩০-৩৬)

সাধারণ মুসলিম ও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করার বিষয়ে ইমাম ও হক্বপন্থী 'আলিমগণের ফাতাওয়া:

ইমাম মালিক (রাহি.) বলেন: 'কতিপয় সম্প্রদায় জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে ইবাদতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। যার ফলে তারা তরবারী ধারন করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদি তারা জ্ঞানের অনুসরণ করত তাহলে তা তাদেরকে সেই অন্যায় পথ হতে বিরত রাখত। (মিফতাহ দারিস সা'আদাহ: ১/১১৯)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহি.) বলেন: সৎ বা অসৎ সকল রাষ্ট্র প্রধান ও নেতাদের বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য করতে হবে (আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজ ব্যতীত)। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তিরও যিনি কোন রাষ্ট্রিয় নেতার স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) হয়েছেন এবং লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাকে মেনে নিয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিরও যিনি জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণ তাকে খলীফা (রাষ্ট্রনায়ক) হিসেবে মেনে নিয়েছে। এঁদের সকলের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তার বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অবৈধ। যে ব্যক্তি এরূপ কর্মে জড়িত হবে সে বিদ'আতী। সুন্নাতী তরীক্বার বিরুদ্ধাচরণকারী। (লালকাঈ প্রণীত শারহু উছূলিল ই'তিকাদ, ১/১৬১; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ২৯, ৭৬)

বারবাহারী (রাহি.) বলেন: যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতার নেতৃত্বের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, সে ব্যক্তি খারেজি (বিদ্রোহী) এবং সে মুসলমানদের শক্তিকে বিনষ্টকারী এভং সুন্নাতের বিরোধতিাকারী হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তা হবে জাহিলী যুগীয় মৃত্যু। *(শারহু সুন্নাহ, ৭৬ পৃ., হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ২৯ পৃ.)*

ইমাম কুরতুবী (রাহি.) বলেন: অধিকাংশ ইসলামী বিদ্বানের সিদ্ধান্ত এই যে, ধৈর্য ধারণ করে অত্যাচারী শাসকের আনগত্যে অটল থাকা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার চাইতে উত্তম। কেননা, তার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, অস্ত্রধারণের দ্বারা ভয়ভীতি প্রদান করা, রক্ত

প্রবাহিত করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা শান্তি -শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করার শামিল। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের মাযহাবে বৈধতা প্রদান করেছে। খারেজী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তও তাই। *(তাফসীর কুরতুবী ২/১০৯, হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ৩০ পৃ.)*

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহি.) বলেনঃ ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ ত্বরীক্বা এই যে, তারা রাষ্ট্রের পরিচালকদের থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে এবং তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাকে না জায়িয মনে করেন, যদিও পরিচালকগণ মাঝে মাঝে অত্যাচারী স্বভাবের হয়। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ নয়, যদিও তাদের নিকট যুলুম-অত্যাচার পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ হতে বহু সহীহ প্রসিদ্ধ হাদীছ এরই প্রমাণ বহন করে। কারণ বিদ্রোহ দ্বারা যে ফিৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রীয় পরিচালকদের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের চেয়ে তার অনেক বেশী ভয়াবহ। ছোট ধরণের বিপর্যয় ঠেকাতে গিয়ে বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা যাবে না। হতে পারে রাষ্ট্রের পরিচালকদের আনুগত্য পরিত্যাগ করে তাদের থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বেশী বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যে দলই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বিদ্রোহ করেছে তারাই বর্তমানের চেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে। *(মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবীয়াহ, ৩/৩৯১)* তিনি আরো বলেন, 'নাবী ﷺ সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য উপস্থিত রাষ্ট্র প্রধানদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন- যাদের জনগণ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত অপ্রকাশ্য কোন নেতা এবং যাদের কোন ক্ষমতা ও আধিপত্য নেই তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন নি। *(মিনহাজুস সুন্নাহ ১/১১৫, ৩/৩৯১ পৃ.; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ৭৭, ৮১ পৃ.)*

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়া (রাহি.) বলেনঃ নাবী ﷺ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সলাত কায়েম করবে। যদিও তারা অত্যাচারী হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে যে বড় ধরণের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে সে পথ রুদ্ধ করার জন্যই এ নির্দেশ। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ যদি আরও বড় ধরণের অন্যায়ের আবির্ভাব ঘটায়, (যেমন সরকার ও রাষ্ট্রের পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মাধ্যমে ঘটে থাকে) তাহলে তা হবে সমস্ত অন্যায়, আনাচার ও ফিৎনার মূল। বাস্তবিকই পূর্ববর্তীকালে এমনটি ঘটেছিল তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করার কারণে। ফলে তারা যে পরিমাণ মন্দ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ছিল তার চেয়ে বহু বহু গুণে মন্দের মধ্যে পড়ে যায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রের আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে। সেই মঙ্গলজনক পথের উপর কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোক অদ্যাবধি অবশিষ্ট রয়েছে। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ৩/১৫, ১৭১; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ২৯ পৃ.)*

আব্দুল আযীয বিন বায (রাহি.) বলেনঃ যদি সরকারের নিকট আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক অপরাধ পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তার নির্দেশ মান্য না করা ও আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া হচ্ছে খারেজী ও মুতাযিলীদের নিকট দ্বীনি দায়িত্ব। *(আল-ফাতওয়া আশ-শারঈয়্যাহ, ১৪ পৃ.; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ৮১ পৃ.)*

সালিহ আল-উছাইমীন (রাহি.) বলেনঃ কোন কোন নির্বোধ জ্ঞানহীন লোকের বক্তব্য এই যে, সরকার যদি ইসলামকে পূর্ণরূপে মান্য না করে তাহলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। এ কথা ও মন্তব্য ভুল। এটি ইসলামী শারী'আতের কোন কিছুরই মধ্যে পড়ে না। বরং এটি খারেজীদের মাযহাব। *(হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ ৮১ পৃ.)*

মূলত খিলাফাতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্টেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশী লঙ্ঘিত হয়েছে এ সকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা তথা আইন প্রণয়নকারী বলে মনে করেছেন। মহান আল্লাহ্ প্রদানকৃত ইসলামী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। এমনকি সলাতের সময় ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে। উমাইয়ার শাসনামলে সাহাবীগণ এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন।

যদি অসম্ভব হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে আন্তরিকভাবে অনৈসলামি সরকারকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে।

কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে 'রাষ্ট্র' বা 'সরকার'-কে জাহিলী, কাফির বা অনৈসলামী বলে গণ্য করেন নি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের আপত্তি জ্ঞাপন সহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সলাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালেও কোন মুসলিম ইমাম, ফকীহ বা 'আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে 'দারুল হরব', 'অনৈসলামী রাষ্ট্র' বা 'জাহিলী রাষ্ট্র' বলে মনে করেন নি। তাঁরা তাদের সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন। পাশাপাশি তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন এবং জিহাদ বা আদেশ-নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, শক্তিপ্রয়োগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি ইত্যাদি নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা হাদীছগ্রন্থ সমূহে সংকলিত হয়েছে।

একইভাবে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী বিধানের পরিপন্থী কিছু আইন-কানুন বিদ্যমান, যেগুলোর অপসারণ ও সংশোধনের জন্য মু'মিন চেষ্টা ও দাওয়াত অব্যাহত রাখবেন। কিন্তু শাসকদের পাপ, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাপ বা কিছু ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনের জন্য কোন রাষ্ট্রকে অনৈসলামী মনে করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি। ইসলামী দা'ওয়াত বা ইসলামী মূল্যবোধ বা শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ, অত্যাচার বা সহিংস আচরণের সম্মুখীন হয়। এতে দা'ওয়াতে লিপ্ত মুসলিমের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক 'সহিংসতা'র আবেগ তৈরি হয়। এর সাথে 'দ্রুত ফললাভ'-এর চিন্তা 'দা'ওয়াত' ও 'দ্বীন প্রতিষ্ঠা'র কর্মে রত ব্যক্তিকে ইসলাম নির্দেশিত 'অহিংস' পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আবেগ নির্দেশিত 'সহিংস' পথে যাওয়ার প্ররোচনা দেয়। ফলে অনেকেই উত্তেজনাকর ও আবেগী কথা বলেন, সবকিছুর আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখান এবং ভাবতে থাকেন 'সহিংসতা' বা কল্পিত 'জিহাদ'ই দ্রুত ফললাভের বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ, যদিও প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সহিংসতা, তথাকথিত 'জিহাদ' ও 'শাহাদাত'-এর অনেক ঘটনা আছে। তারা সকলেই 'দ্রুত ফললাভ'-এর আবেগ নিয়ে বৈধ বা কল্পিত 'জিহাদে' ঝাপিয়ে পড়ে 'শহীদ' হয়েছেন, কিন্তু কেউই দ্রুত বিজয় তো দূরের কথা কোন বিজয়ই অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অর্থাৎ 'অহিংস' ও 'মন্দের মুকাবিলায় উৎকৃষ্টতর' আচরণই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ। এ পদ্ধতিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরবের কঠোর হৃদয় যাযাবরদের হৃদয় জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সকল যুগে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী 'আলিম' ও 'দাঈ'গণ বিদ্রোহ, উগ্রতা ও শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেম ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজের অবক্ষয় রোধে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শির্কের শ্রেণীবিন্যাস

শির্ককে বিশেষ মনোযোগের সাথে বিচার-বিশ্লেষণ না করলে তাওহীদের চর্চা অসম্পূর্ণ থাকা অবশ্যম্ভাবী। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে শির্ক প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি ও এর উপরে কয়েকটি উদাহরণ টেনে তাওহীদ কিভাবে মানুষের মধ্যে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তা দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কুরআনে শির্কের সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন।[১] তাই এ অধ্যায়ে শির্ককে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে নিয়ে আলোচনা করা হবে। শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ... ﴿٤٨﴾﴾

(سورة النساء: ٤٨)

---

[১] 'তারা যদি শিরক করে তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে।' [সূরা আন'আম (৬): ৮৮] 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' [সূরা মায়িদা (৫): ৭২] 'যে আল্লাহর সাথে শিরক করল সে জঘন্যতম পাপ করল।' [সূরা নিসা (৪): ৪৮] শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কিত আয়াতগুলো হচ্ছে-২/২১-২২, ২/৫১, ২/৫৪, ২/৫৭, ২/৫৯, ২/৯২, ২/১৬৫, ৪/৩৬, ১১৬, ৫/১৭, ৫/৭২, ৫/৭৩, ৬/১৯, ৬/৪৫, ৬/৮২, ৬/১৩৬, ৬/১৩৭, ৬/১৩৮, ৬/১৩৯, ৬/১৪০, ৬/১৫০, ৬/১৫১, ৭/৫, ৭/৩৩, ৭/৩৭, ৯/৩, ৯/২৮, ৯/১১৩, ১০/১০৬-৭, ১২/৩৮, ১২/৪০, ১৫/৯৬, ২২/৩১, ২৫/৬৮, ২৬/৭১, ২৬/৭৪, ৩১/১৩, ৪৭/১৯। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে। *(বুখারী, হা/১২৩৭)* অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম, হা/২৬৬৩)* ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট জঘন্যতম গুনাহ কোন্‌টি? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানানো (শরীক করা)। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। *(বুখারী, হা/৪২০৭)* এছাড়া এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে। *-অনুবাদক*

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব গুনাহ্ যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন... ।" [কুরআন (৪): ৪৮]

শির্কের দ্বারা যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই অস্বীকার করা হয়, তাই এটি আল্লাহ্র নিকটে সর্ববৃহৎ ও জঘন্যতম পাপ যা ক্ষমার অযোগ্য।

আভিধানিক অর্থে শির্ক হল 'অংশীদারীত্ব' (partnarship), 'বণ্টন' (sharing) বা 'সহযোগী বানানো' (associating)।[১] কিন্তু ইসলামী পরিভাষায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন প্রকারে আল্লাহ্র সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করাই শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র কোন বিষয়ে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহ্র প্রাপ্য কোন 'ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শির্ক বলা হয়। তিন প্রকার তাওহীদ অনুযায়ী নিম্নে শির্কের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হচ্ছে। তাই, রবূবিয়্যাহ (কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একত্ব)-এর ক্ষেত্রে প্রধানত কোন কোন উপায়ে শির্ক সংঘটিত হয়, সর্বপ্রথম সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে; তারপর আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ব) এবং অবশেষে 'ইবাদাহ ('ইবাদাতের একত্ব)।

রবূবিয়্যাহ্-এর ক্ষেত্রে শির্ক

এ ধরণের শির্ক বলতে এমন বিশ্বাসকে বুঝায় যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র সমকক্ষ বা সমকক্ষ হওয়ার কাছাকাছি হিসেবে অন্য কাউকে তাঁর সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্বের অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। প্রথমত, একমাত্র নির্ভেজাল ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মীয় মতবাদ রবূবিয়্যাহ-এর ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত দার্শনিকরা যে সব মানব-রচিত দর্শনসমূহ চর্চা করে, সেগুলোও এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১. অংশীদার বা শরীক স্থাপনের মাধ্যমে শির্ক

সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, এ বিশ্বাসটি স্বীকৃত। তথাপি অন্য সকল ক্ষুদ্রতর স্রষ্টা (দেব-দেবী), অদৃশ্য আত্মা, মরমানব, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বা জাগতিক বস্তু সামগ্রীকে তাঁর একচ্ছত্র কার্যক্রমের অংশীদার বলে যে সব বিশ্বাস করা হয় তা এ উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের সকল 'আক্বীদা-বিশ্বাসকে ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ সচরাচর স্রষ্টার একত্ব

[১] *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabi,* পৃ. ৪৬৮।

(এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস) বা বহু-ঈশ্বরবাদ (একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নির্ভেজাল ইসলামী মত হল, এ ধরণের সকল বিশ্বাসই বহু-ঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতা। আর এ বিশ্বাসগুলোর অধিকাংশই স্রষ্টার প্রেরিত ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধঃপতনের সূচনা করে, যদিও এগুলো শুরুতে তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হিন্দু ধর্মে সর্বোচ্চ সত্তা ***ব্রহ্মাকে*** সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা, সকল প্রাণীর মধ্যে ব্যপ্ত, সর্ব-পরিব্যাপক, অপরিবর্তনীয়, চিরঞ্জীব, নির্যাস, নিরাকার হিসেবে সবকিছুর মূল উৎস ও সমাপ্তি বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ***ব্রহ্মা*** তাঁর সংরক্ষক দেবতা বিষ্ণু ও ধ্বংসের দেবতা শিবের সমন্বয়ে ত্রিত্ব গঠন করেছে।[১] এভাবে স্রষ্টার গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য স্রষ্টা নামক দেব-দেবীর উপর অর্পণ করার মাধ্যমে হিন্দুধর্মে রবূবিয়্যাহ-তে শিরকের প্রকাশ ঘটে।

পিতা, পুত্র (যিশুখ্রিস্ট) ও পুণ্যাত্মা[২] মিলে তিন জনের মাধ্যমে স্রষ্টা তাঁর সত্তাকে প্রকাশ করে বলে খ্রিস্টান ধর্মানুসারীদের বিশ্বাস। তবুও এ তিনজন ব্যক্তিকে তারা একটি মূল অংশের উপাদান হিসেবে এক ও অনন্য বলে বিশ্বাস করে।[৩] নাবী যিশুকে (ঈসা ﷺ) স্রষ্টার মর্যাদা দান করে বলা হয়েছে যে, তিনি স্রষ্টার ডান হাতে বসে পৃথিবীর বিচার কার্য পরিচালনা করেন। হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত, স্রষ্টা এক পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটান। আর খ্রিস্টান ধর্ম মতে পবিত্র আত্মা স্রষ্টার অংশবিশেষ। পৌল সেই পবিত্র আত্মাকে যিশু খ্রিস্টের এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু, পথপ্রদর্শক, খ্রিস্টানদের সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করে, যার আত্মপ্রকাশ ঘটে পেনিকস্ট এর দিনে।[৪] কাজেই, স্রষ্টার

---

[1] WL. Recse, *Dictionary of Philosophy and Religion,* (New Jersey Humanities Press) pg. 66-67 and 586-587. John Hinnells, *Dictionary of Religion,* (England: Penguin Books, 1984) pg. 67-68

[২] কুরআনের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে খৃষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে, *'আল্লাহ্, ঈছা এবং মারইয়াম* (তাদের পরিভাষা অনুযায়ী পিতা, পুত্র যিশু খৃষ্ট এবং মেরী) এই তিনজনকে নিয়ে *'Trinity'* গঠিত। অর্থাৎ **'পবিত্র আত্মার'** পরিবর্তে মারইয়ামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা -কে যে প্রশ্ন করবেন, সে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 'আপনি কি মানুষকে বলেছিলেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে (আল্লাহ ব্যতীত) আপনাকে ও আপনার মা কে ইলাহ (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করতে?' যা হোক, কোন কোন খৃষ্টিয় মতবাদে ঈসা ﷺ-কে অথবা মারইয়ামকেই পবিত্র আত্মা বলে উলেখ করা হয়ে থাকে এবং মারইয়ামের পরিবর্তে পবিত্র আত্মার কথা বলা হয়।

[3] *Dictionary of Religion, pg. 337*

[4] *Dictionary of Philosophy and Religion, pg. 231*

একক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় যিশু খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মাকে অংশীদার হিসেবে বিশ্বাস, এ বিশ্বের উপর প্রদত্ত সকল বিচারের ফলাফল একমাত্র তিনিই (যিশু) ঘোষণা করেন ও প্রত্যেক খ্রিস্টান সেই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত এবং পথপ্রদর্শিত হয় -এ ধরণের সকল প্রকার খ্রিস্টানী বিশ্বাসের মাধ্যমে তাওহীদ আর-রবূবিয়্যা-তে শির্ক সংঘটিত হয়।

জরাথুস্টের প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীরা (পারসি[১]) *(Zoroastrians)* তাদের স্রষ্টা ***'আহুরা মাজদা'***-কে শুধুমাত্র ভাল কিছুর স্রষ্টা এবং একমাত্র প্রকৃত উপাসনার যোগ্য বলে বিশ্বাস করে। ***আহুরা মাজদা***-র সাতটি সৃষ্টির মধ্যে অগ্নিকে তাঁর পুত্র অথবা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্ধকারের প্রতীকধারী 'আগ্রা মাইনু' নামে অপর এক দেবতা দ্বারা শয়তানী, হিংস্রতা ও মৃত্যু সৃষ্টি হয়েছে -এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে তারা তাওহীদ আর-রবূবিয়্যাহ-তে শিরকে লিপ্ত হয়।[২] সুতরাং অপেক্ষাকৃত মন্দ গুণাবলীসমূহ স্রষ্টার উপর আরোপ না করার মানবীয় আকাঙ্ক্ষার কারণে পাপিষ্ঠ আত্মাকে এক বিরোধী দেবতার পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করে সকল সৃষ্টির উপর সার্বভৌম ক্ষমতার (রবূবিয়্যাহ্) অধিকারী স্রষ্টার সাথে অংশীদার করার মাধ্যমে তাওহীদ আর-রবূবিয়্যাহ-তে শিরকের সূচনা করা হয়।

'Olorius' (ওলোরিয়াস -স্বর্গের অধিপতি) বা *'Olodumare'* নামে একজন সর্বোচ্চ স্রষ্টা রয়েছে বলে পশ্চিম আফ্রিকায় (প্রধানতঃ নাইজেরিয়া) 'ইয়োরুবা' *(Yoruba)* ধর্মের অনুসারী এক কোটিরও বেশী মানুষের বিশ্বাস করে। তবুও *'Orisha'* নামক এক দেবতার ব্যাপক উপাসনা দ্বারা ইয়োরুবা ধর্ম চিহ্নিত করার কারণে এ ধর্মকে বহু-ঈশ্বরবাদের ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ছোট আত্মাদের উপর দায়িত্ব ভাগাভাগি করার মাধ্যমে ইয়োরুবা ধর্মের অনুসারীরা তাওহীদ আর-রবূবিয়াহ-তে শির্ক করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায় এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এদের নাম 'আনকুলুনকুলু' *(Unkulunkulu)* যার অর্থ 'প্রাচীন', 'সর্বপ্রথম', সবচেয়ে সম্মানিত। স্রষ্টার জন্য সুনির্দিষ্ট মূখ্য উপাধিগুলি হচ্ছে *'Nkosi yaphezulu'* (কোসি ইয়াফেযুলু) আকাশের স্রষ্টা এবং *'uMvelingqanqui'* (আমভেলিংকাংকি) প্রথম আবির্ভূত। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা উপস্থাপিত হয় একজন পুরুষ হিসেবে এবং জাগতিক নারী দ্বারা তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেন। বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোর কাজ স্রষ্টা নিজেই করেন; আর *'Idlozi'* (ইডলোজী) বা *'Abaphansi'*

---

[১] প্রাচীনকালে পারস্য দেশ থেকে আগত জরথুস্টপন্থী জাতি।

[২] *Dictionary of Religions,* pg. 361-362

(আবাফান্সি -অর্থাৎ যারা মাটির নিচে বসবাস করে) নামীয় পূর্বপুরুষগণ অসুস্থতা এবং জীবনের সকল বিপদাপদ সংঘটিত করে। এছাড়াও এরা জীবিতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, খাদ্যের জন্য প্রার্থনা জানায়, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বলিদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়, পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করে ও জ্যোতিষীদের *(inyanga)* আয়ত্তে রাখে।[১] সুতরাং মানবজগৎ সৃষ্টি সংক্রান্ত ধারণাতেই শুধু নয়, বরং মানুষের জীবনে ভাল-মন্দ সংঘটিত করা তাদের পূর্বপুরুষদের কাজ বলে আখ্যায়িত করার মধ্যেমেও জুলু ধর্মে শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটে ।

ওলী, আওলিয়া, দরবেশ এবং অন্যান্য পীর-বুজুর্গ বা ধার্মিক ব্যক্তিগণের আত্মাসমূহ তাঁদের মৃত্যুর পরেও জাগতিক ঘটনাবলিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম -এ ধরণের বিশ্বাসের মাধ্যমে কিছু কিছু মুসলিম জনগণের বিশ্বাসে সুস্পষ্টভাবে রবুবিয়াহ-তে শিরকের প্রকাশ ঘটে। তারা বিশ্বাস করে যে, এ সব আত্মা মানুষের চাহিদা পূরণ করতে, দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে এবং তাঁদেরকে স্মরণ করলে যে কোন ব্যক্তির আহ্বানেই সাড়া দিতে সক্ষম। ফলশ্রুতিতে ক্ববর ও মাজার পূজারীগণ তাদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাসমূহে মানুষের আত্মাকে স্রষ্টার ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাসী, অথচ এ সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই।

মরমী[২] মুসলিম নামক বহু সূফী সাধকেরা সাধারণত বিশ্বাস করে যে, 'রিজাল আল-গাইব' (অদৃশ্য মানব)[৩]-দের প্রধান 'কুতুব' নামক স্থান দখল করে এ বিশ্ব পরিচালনা করছে।[৪]

২. *অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে শির্ক*

অস্বীকৃতির দ্বারা শির্ক বলতে বিভিন্ন দর্শন ও ভাবাদর্শকে বুঝায় যা সুস্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্রষ্টার অনস্তিত্বের (নাস্তিকতা) ঘোষণা প্রদান করা হয়; আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্বের দাবী করা হলেও তাঁকে কল্পনা ও বিশ্বাস করার পদ্ধতিগত কারণে মূলত স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। এ ধরণের আক্বীদা-বিশ্বাস হতাশাবাদ বলে গণ্য।

---

[১] *Ebid,* pg. 363

[২] স্রষ্টার সঙ্গে মিলনপ্রত্যাশী এবং এই মিলনের মাধ্যমে মানুষের বোধাতীত সত্যের সাক্ষাৎপ্রয়াসী ব্যক্তি।

[৩] আভিধানিক অর্থে, 'অদৃশ্য জগতের মানব'। ওলী বা আওলিয়াদের মধ্যবর্তিতার কারণে এ পৃথিবী টিকে থাকে। ফলে এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত এবং একজন মৃত্যুবরণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্যজনের মাধ্যমে তার স্থান পূরণীয়। (*Shorter Encyclopedia of Islam*, pg. 582)

[৪] *Shorter Encyclopedia of Islam, pg. 55*

কিছু প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। এগুলোর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মীয় ব্যবস্থা অন্যতম। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ধর্মের প্রচলন ঘটার সময়ে হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার বিরোধিতাকারী একটি সংস্কারক আন্দোলন হিসেবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এ ধর্মটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। অবশেষে এটিকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসেবে বুদ্ধকে ***অবতারদের*** (স্রষ্টার গুণাবলী সম্পন্ন) মধ্যে একজন গণ্য করা হয়। এ ধর্মটি ভারত থেকে অদৃশ্য হয়ে চীন এবং আন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহে প্রভাবশালী রূপ পরিগ্রহ করে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের যে দু'ধরণের ব্যাখ্যার উৎপত্তি ঘটে তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও গোঁড়া হিনেইয়ানা *(Hinayana)* বৌদ্ধ ধর্ম (৪০০-২৫০ খ্রি.পূ.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা প্রদান করে যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই; এ কারণে পাপ ও পাপের পরিণাম হতে কারও পরিত্রাণ লাভের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়।[১] তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করার কারণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধারাকে তাওহীদ আর-রবূবিয়াহ-তে শিরকের নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

একইভাবে জৈন ধর্মের শিক্ষাবস্তু বর্ধমানা *(Vardhamana)* অর্থই হচ্ছে যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অমরত্ব এবং অসীম জ্ঞানের শক্তি দ্বারা মুক্ত আত্মা স্রষ্টার পদমর্যাদার কিছু অংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে ধার্মিক লোকেরা তথাকথিত এ সব মুক্ত আত্মার প্রতি স্রষ্টা হিসেবে যেরূপ আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে ঠিক সেরূপ আচরণই করে। তাই মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে তাদের মূর্তিপূজা করে।[২]

নাবী মূসার সময়কালীন ফেরাউনকে এ বিষয়ে প্রাচীন উদাহরণ বলে গণ্য করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেন: ফেরাউন আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং মূসা ও মিশরের জনগণের কাছে দাবী করেছিল যে, সকল সৃষ্টির একমাত্র সত্যিকার প্রভু সে-ই। সে মূসা ﷺ-কে বলেছিল:

﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾﴾ (سورة الشعراء: ٢٩)

"তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।" [আশ-শু'আরা (২৬): ২৯]

এবং সে জনগণকে বলেছিল:

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾﴾ (سورة النازعات: ٢٤)

---

[1] *Dictionary of Philosophy and Religion,* pg. 72

[2] *Dictionary of Philosophy and Religion,* pg. 262-263

"সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব্ব'।" [আন-নাযি'আত (৭৯): ২৪]

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা এমন দৃঢ়ভাবে দাবী করে যা 'স্রষ্টার দর্শনের মৃত্যু' *(Death of God Pholosophy)* নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। জার্মান দার্শনিক ফিলিপ মেইন ল্যান্ডার (১৮৪১-১৮৭৬ খ্রি.) তার 'প্রায়শ্চিত্ব করার দর্শন' *(The Philosophy of Redemption, 1876)* নামক বইতে উল্লেখ করেন, বিশ্বের একাধিক তত্ত্বে স্রষ্টার একত্বের মূল উপাদান ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পরমানন্দের তত্ত্বকে শাস্তিভোগ তত্ত্ব (যা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান) দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে; ফলশ্রুতিতে স্রষ্টার মৃত্যুর মাধ্যমে এ বিশ্বের সূচনা হয়েছে।[1] প্রুশিয়ার ফ্রেড্রিক নিযশে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি.) 'স্রষ্টার মৃত্যু তত্ত্ব' মতবাদ সমর্থন করে প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন যে, মানুষের অস্বস্তিকর বিবেকের অভিক্ষেপ ছাড়া স্রষ্টা আর কিছুই নয় এবং এ মানুষ হল অতি মানবের সঙ্গে সেতুবন্ধন।[2] বিংশ শতাব্দির 'Jean Paul Sarte' নামে এক ফরাসী দার্শনিকও 'স্রষ্টার মৃত্যু তত্ত্ব'-এর ঘোষক রূপে আবির্ভূত হন। তার দাবী, স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই, কারণ তিনি যে কোন বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ একটি পরিভাষা বৈ কিছু নয়। তার মতে, স্রষ্টার ধারণা শুধু মানুষের কল্পনার নিজস্ব অভিক্ষেপ।[3]

'মানুষ বিবর্তিত বানর ছাড়া আর কিছুই নয়'-ডারউইনের (মৃত. ১৮৮২ খ্রি.) এ প্রস্তাব স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করার কারণে সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণের তত্ত্ব কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। তাদের মতে, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যক্তি হতে মানুষের কথিত সামাজিক বিবর্তন এবং বানর হতে দৈহিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি সাথে সাথে সর্বপ্রাণবাদ হতে একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সূচনা হয়।

কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; ফলে 'কিছুই না' থেকেই মানুষের সৃষ্টি -এ দাবীর ফলে আদি ও অন্তহীন নামক আল্লাহ্‌র গুণাবলী মানুষের উপর অর্পণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদীরা সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। আধুনিককালে কার্ল মার্ক্সের *(Karl Marx)* অনুসারী সাম্যবাদী *(Communists)* ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকগণ এ মতবাদে বিশ্বাসী, যারা দাবী করে গতিশীল পদার্থই বিদ্যমান সকল বস্তুর উৎস। তারা আরও দাবী করে যে, নির্যাতিত জনগোষ্ঠি যে

---

[1] *Dictionary of Philosophy and Religion,* p. 327

[2] *Dictionary of Philosophy and Religion,* p. 391

[3] *Dictionary of Philosophy and Religion,* p. 508-509

প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিতে এবং তাদের বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সত্যতা প্রতিপাদনে শাসকশ্রেণী কর্তৃক মানুষের কল্পনায় স্রষ্টার অস্তিত্বকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

মুসলিমদের মধ্যে এ ধরণের শিরকের নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যায়- ইবনে আরাবীর মতো বহু সূফী যারা দাবী করে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই অস্তিত্বমান (সবই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ই সব)। এরা আল্লাহ্র পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে মূলত তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক বারু স্পিনোজা নামক এক ব্যক্তি অনুরূপ ধারণা প্রকাশের দ্বারা দাবী করে, মানুষসহ বিশ্বের সকল অংশের সমষ্টিই স্রষ্টা।

আল-আসমা ওয়াস-সিফাতে শির্ক

সাধারণ পৌত্তলিক প্রথা যেখানে আল্লাহ্র উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা এবং সৃষ্টির উপর আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী আরোপ করা- উভয় প্রকার কর্মই এ শ্রেণীর শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

ক. মানবীয় গুণাবলী আরোপের মাধ্যমে শির্ক :

আল-আসমা ওয়াস-সিফাতে শির্কের এ পর্যায়ে আল্লাহ্কে মানুষ ও পশুপাখির আকার ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়। অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে স্রষ্টার অবয়ব প্রকাশে মূর্তিপূজারীরা সাধারণত মানুষের প্রতিকৃতি ব্যবহার করে। ফলে প্রায়ই ছাঁচে ঢালাই, অঙ্কণ বা খোদাই করে স্রষ্টার প্রতিকৃতি মানবীয় বৈশিষ্ট্যবলীসহ সেই সকল মানুষের আকৃতিতে গঠন করা হয়, খোদ যারা এ সব মূর্তির পূজারী। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধরা এশীয় মানুষ সদৃশ অসংখ্য মূর্তির পূজা-অর্চনা করে, যে সব মূর্তিকে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়। নাবী যিশু (ঈসা ﷺ) স্রষ্টার প্রতিমূর্তি ছিলেন; অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন- আধুনিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এ ধরণের সকল বিশ্বাস শির্ক সম্পর্কে আলোচ্যমান এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তথাকথিত অসংখ্য সুবিদিত খ্রিস্টান চিত্রকর রয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাইকেল অ্যানজেলো (মৃত ১৫৬৫)। তিনি ভ্যাটিক্যানের সিসটাইন গির্জার ছাদের নীচের পিঠে লম্বা চুল ও দাড়ি বিশিষ্ট একজন উলঙ্গ ইউরোপীয় বৃদ্ধ হিসেবে স্রষ্টার প্রতিকৃতি আঁকেন। দিনে দিনে এ প্রতিকৃতিসমূহ খ্রিস্টান জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে।

খ. স্রষ্টার গুণাবলী আরোপের মাধ্যমে শির্ক

সৃষ্ট প্রাণী অথবা বস্তুতে আল্লাহ্‌র নাম বা গুণাবলী অর্পণ করা বা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে দাবী করা -আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের এ প্রকারের শির্কের অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন আরবে তৎকালীন সময়ে যে সব মূর্তির পূজা করার প্রথা ছিল, তাদের অধিকাংশের নাম আল্লাহ্‌র নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের প্রধান তিন মূর্তি ছিল- আল-লাত, যা আল্লাহ্‌র নাম আল-ইলাহ হতে উদ্ভূত; আল-উয্যাহ, যা আল্লাহ্‌র নাম আল-আযীয হতে উদ্ভূত; এবং আল্লাহ্‌র নাম আল-মান্নান হতে উদ্ভূত করা হয়েছিল আল-মানাত। 'রহমান' নামটি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সময়ে ইয়ামামা এলাকায় 'রাহমান' নামে এক মিথ্যা নাবীর আবির্ভাব ঘটে।

শিয়াদের মধ্যে সিরিয়ার *নুসাইরিয়্যা* নামক দলের বিশ্বাস এ রকম যে, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর চাচাতো ভাই ও জামাতা 'আলী ইবনে আবি তালিব মূলত আল্লাহ্‌র জীবন্ত প্রতিকৃতি ছিল। তাই এ ভ্রান্ত দল 'আলীকে আল্লাহ্‌র অনেক গুণাবলী সম্পন্ন মনে করে। শিয়াদের মধ্যে ইসমাঈলীরাও (আগাখানি) তাদের নেতা আগাখানকে স্রষ্টার জীবন্ত প্রতিকৃতি হিসেবে বিশ্বাস করে। একইভাবে, লেবাননের দ্রুজদেরকেও এ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, কারণ এরা ফাতেমীয় খলীফা আল-হাকিম বিন আমরিল্লাহকে পুরো মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র শেষ প্রতিকৃতি বলে মনে করে।

মানসূর আল-হাল্লাজের মত সূফীদের (মরমী মুসলিম) সৃষ্টিতে স্রষ্টার প্রকাশ বিষয়ক দাবীও আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের এ শ্রেণীর শিরকের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, তাদের দাবীর সারমর্ম এ রকম যে, তারা স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে একীভূত হয়েছে। শার্লী ম্যাকলিন ও জে. জে. নাইট-এর মত আধুনিক সময়ের মধ্যস্থতাকারী ও আধ্যাত্মবাদীগণ সাধারণত নিজেদের পাশাপাশি মানুষের উপর প্রভুত্ব দাবী করে। আইনষ্টাইনের যে আপেক্ষিক তত্ত্ব ($E=mc^2$, শক্তি= ভর × আলোর গতির বর্গফল) সাধারণত সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, তা মূলত আল-আসমা ওয়াস-সিফাত অন্তর্ভূক্ত শির্ক এর প্রকাশ। কারণ, এ তত্ত্বমতে শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই করা যায়না, শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয় অথবা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যা হোক, পদার্থ ও শক্তি উভয়ই সৃষ্ট বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আল্লাহ্ স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে:

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (سورة الزمر: ٦٢)

"আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর বিধায়ক" [আয-যুমার (৩৯) : ৬২]

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾﴾ (سورة الرحمن: ٢٦)

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে..." [আর-রাহমান (৫৫) : ২৬]

এ তত্ত্ব অন্য অর্থও প্রকাশ করে যে, পদার্থ ও শক্তি যেহেতু একরূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়, তাই এগুলো আদি বা অন্তহীন ও চিরস্থায়ী। চিরন্তন বা চিরস্থায়ী হওয়ার গুণটি একমাত্র আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক গুণ। তিনিই একমাত্র যাঁর আদি বা অন্ত নেই।

ডারউইনের বিবর্তনবাদও স্রষ্টার মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রাণহীন পদার্থ হতে প্রাণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা। এ শতাব্দীর অন্যতম ডারউইনবিদ স্যার আলডাস হাক্সলি তাঁর সুস্পষ্ট মতামত নিম্নরূপে প্রকাশ করেছেন- "ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রাণী সত্তার স্রষ্টা হিসেবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে।[১]

'ইবাদাতে শির্‌ক

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি নিবেদিত 'ইবাদাতের কর্মসমূহ এবং 'ইবাদাতের বিপরীতে প্রাপ্ত পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকটে না আশা ক'রে তাঁর সৃষ্টির নিকটে আশা করা- এ শ্রেণীর শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত। পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলোর মতই 'ইবাদাতে শির্‌ক সম্পাদনে দু'টি পর্যায় রয়েছে।

১. আশ-শির্‌ক আল-আকবার (বড় শির্‌ক)

'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য এমন কর্মসমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি নিবেদিত করা হলেই বড় শির্‌ক সংঘটিত হয়। মূলত এ ধরণের কার্যাবলী মূর্তিপূজার সমতুল্য এবং এগুলো থেকে দূরে রাখার জন্যই আল্লাহ্ বিশেষভাবে নাবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ বিষয়ের সমর্থনে বর্ণনা করেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ... ﴿٣٦﴾﴾

(سورة النحل: ٣٦)

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগূতকে (মিথ্যা উপাস্য) বর্জন কর...।"

[আন্-নাহল (১৬): ৩৬]

---

[১] *Tax and Callender*, 1960, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৫ হতে উদ্ধৃত *The Neck of the Giraffe,* (New York: Ticknor and Fields, 1982), পৃ. ২৫৪-এ বর্ণিত।

তাগূত বলা হয় মিথ্যা বা পথভ্রষ্টকারী উপাস্যকে। [1]আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কোন কিছুর যেমন- মূর্তি বা পাথর বা ক্ববর বা গাছ ইত্যাদির 'ইবাদাত করাই *তাগূত*-এর কর্ম। উদাহরণস্বরূপ, ভালবাসা হচ্ছে এক প্রকার 'ইবাদাত যার চূড়ান্ত পর্যায় শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই ইসলামে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। আল্লাহ্‌র প্রতি এ ভালবাসার পর্যায় সে রকম ভালবাসা নয় যা মানুষ প্রাকৃতিকভাবে অন্যান্য সৃষ্টি জীব, বাবা-মা, সন্তানসন্ততি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির প্রতি অনুভব করে। আবার, স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেই একই রকম ভালবাসা যদি তাঁর সৃষ্টির প্রতিও অনুভব করা হয়, তবে স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির সমপর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, যা আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের শির্ক বলেই দৃষ্টমান হয়। আল্লাহ্‌র নিকটে কারও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ আত্মসমর্পণই হচ্ছে 'ইবাদাত যাকে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা বলে অভিহিত করা যায়। তাই, ঈমানদারগণকে জানাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে বলেন:

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾ (٣١) (سورة آل عمران: ٣١)

"বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন..." [আলি-'ইমরান (৩): ৩১]

সাহাবীদেরকেও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের সন্তানসন্ততি, পিতা ও পুরো মানবজাতি অপেক্ষা আমাকে বেশি ভালবাসবে।'[2]

রাসূল ﷺ-কে ভালবাসা তাঁর মনুষ্যত্বের উপর ভিত্তি করে নয়; বরং তাঁর নিকট প্রেরিত বাণীর আসমানী উৎসের উপরই ভিত্তি করে তাঁকে ভালবাসা হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র ভালবাসার মতই রাসূল ﷺ-কে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শেষ নাযিলকৃত কিতাবে বলেন:

﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾ (٨٠) (سورة النساء: ٨٠)

"যে রসূলের হুকুম মানল, সে তো আল্লাহ্‌রই হুকুম মানল...।" [আন্-নিসা (৪): ৮০]

---

[1] ***শারহ ছালাছাতিল উসূলিশ শাইখ সালিহ আল উছায়মীন***, পৃ. ১৫৩।

[2] আনাস কর্তৃক বর্ণিত এবং ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২০, হাদীছ নং ১৩ এবং ***মুসলিম*** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৩১, হাদীছ নং ৭১।

এবং অন্যত্র আরও বলেন:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ... ﴿٣٢﴾﴾ (سورة آل عمران: ٣٢)

"বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ও রসূলের আনুগত্য কর'...।"

[আল-'ইমরান (৩): ৩২]

কোন কিছু বা কারো প্রতি ভালবাসাকে কেউ যদি তার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে অন্তরায় হতে সুযোগ করে দেয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুরই 'ইবাদাত করে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তির ধনসম্পদ বা কামনা-বাসনাও তার প্রভুতে পরিণত হতে পারে। রাসূল ﷺ বলেন,

"অর্থের পূজারীরা সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত হবে।"[১]

তাছাড়া কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ...﴾ (سورة الفرقان: ٤٣)

"তুমি কি তাকে দেখ না যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে?..."

[আল-ফুরক্বান (২৫): ৪৩]

মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করার কারণে 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্‌কে নিমজ্জিত হওয়ার গুনাহ সম্পর্কে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

"আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।"

[সূরা আয্-যারিয়াত (৫১): ৫৬]

বৃহৎ শির্‌ক মূলত সমগ্র বিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বড় ধরণের বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয় এবং এটি বড় ধরণের গুনাহের কাজও বটে। এ গুনাহ্ এত বিশাল যে, কোন মুশরিক ব্যক্তি যত নেক কাজ করুক না কেন তা কোনই কাজে আসবে না এবং সকল প্রকার নেক 'আমল আল্লাহ্‌র নিকটে অগ্রহণযোগ্য হবে। শুধু তা-ই নয়, বরং এ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। মিথ্যা ধর্ম মূলত এ বৃহৎ শির্‌কের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল মানবসৃষ্ট ধর্ম তাদের অনুসারীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টের উপাসনা করতে আহ্বান জানায়। স্রষ্টার প্রতিমূর্তি হিসেবে দাবী ক'রে যিশু (ঈসা عليه السلام) নামক এক মানুষকে উপাসনা করতে খ্রিস্টানদেরকে আহ্বান জানানো

---

[১] ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ২৯৬, হাদীছ নং ৪৪৩।

হয়; অথচ যিশু (ঈসা ﷺ) একজন আল্লাহ্‌র সত্যিকার নাবী বৈ কিছু নয়। আবার, খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকরা স্রষ্টার মা হিসেবে মেরীর (মারইয়াম)[১] নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করে। এছাড়াও তারা মিকল (মাইকেল)-এর[২] মত ফিরিশতার নিকটেও প্রার্থনা করে। এমনকি এই ফিরিশতাকে সম্মান জানাতে তারা ২৯ সেপ্টেম্বরকে 'Michaelmas Day'[৩] হিসেবে ঘোষণা করেছে।[৪] অধিকন্তু, ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা বিভিন্ন বাস্তব বা কল্পিত সাধুদের নিকটও প্রার্থনা করতে ভুল করে না।

যদি কোন মুসলিম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ বা মরমীবাদী বিভিন্ন সুফি দরবেশ, ওলী বা আওলিয়ার নিকটে এ বিশ্বাসে প্রার্থনা করে যে, তারা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেয়; তাহলে সে শির্কে আকবারে লিপ্ত হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনঃ

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾﴾ (سورة الأنعام: ٤٠)

"বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়ে কিংবা তোমাদের উপর ক্বিয়ামাত এসে যায় তাহলে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? (বল না) তোমরা যদি সত্যবাদী হও।"

[সূরা আল-আন'আম (৬): ৪০]

২. *শির্ক আস্‌গার (ক্ষুদ্রতর শির্ক)*

মাহ্‌মূদ ইবনে লাবীদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'আমি সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হল 'শির্ক আসগার' (ক্ষুদ্রতর শির্ক)। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ, ক্ষুদ্রতর শির্ক কী? তিনি ﷺ বলেন, 'রিয়া' (লোক দেখানো বা প্রদর্শনেচ্ছা)। কিয়ামাতের দিন মানুষকে যখন তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে থাকাবস্থায় যাদেরকে দেখানোর জন্য 'আমল করেছ, তাদের নিকটে যাও এবং দেখ কিছু প্রতিদান পাও কি-না।"[৫]

---

[১] ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর নামের বিকৃত রূপ হল Mary (মেরি)।

[২] মিকাঈল (আঃ)-এর নামের বিকৃত রূপ হল Michael (মিকল বা মাইকেল)।

[৩] রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের পর্ববিশেষ (২৯ সেপ্টেম্বর সন্ত মাইকেলের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত)।

[৪] William Halsey (ed.), *Colliers Encyclopedia*, (U.S.A.: Crowell-Collier Educational Foundation, 1970), ১৬ খণ্ড, পৃ. ১১০।

[৫] আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৫/৪২৮-২৯; হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ১/১০২; আত্ব-ত্বাবারানী ও আল-বায়হাক্বী কর্তৃক আয-যাহদে সংগৃহীত; দেখুন তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ, পৃ. ১১৮। হাদীছটির সনদ সহীহ।

মাহ্মূদ ইবনে লুবাইদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বাইরে বের হয়ে আসলেন এবং ঘোষণা করলেন,

"'হে লোকজন, গোপন শির্কের ব্যাপারে সতর্ক থাক।' লোকজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ, গোপন শির্ক কী?' তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'মানুষ যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন অন্য লোকজনকে দেখানোর জন্য যথাযথ সুন্দরভাবে আদায় করতে যে চেষ্টা চালায়, তা হল গোপন শির্ক।"'[১]

আর-রিয়া'

'রিয়া' (الرياء) অর্থ 'দেখানো', 'প্রদর্শন করা' *(to act ostentatiously, make a show before people, to do eyeservice)*। লোকজনকে দেখিয়ে প্রশংসিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের 'ইবাদাত সম্পাদন করাকেই সাধারণত রিয়া' বলা হয়। নেক 'আমলের বিপরীতে প্রাপ্ত সুফলের পুরো অংশকে এ গুনাহটি ধ্বংস করে ফেলে ঐ 'আমলকারীর জন্য ভয়ানক শাস্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। বিশেষ করে এ গুনাহটি ভয়ংকর, কারণ মানুষ এমনিতেই তার সঙ্গী মানুষের নিকট থেকে প্রশংসা লাভের আশ্যা পোষণ করে এবং পরিণামে প্রশংসিত হলে সে অনেক আনন্দ লাভ করে। লোকদের অন্তরে নিজের সম্পর্কে অনুকূল ধারণা সৃষ্টিতে বা তাদের দ্বারা প্রসংশিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমন ধরণের গুনাহের কাজ যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালাতে হবে। এ গুনাহটি সেই সব ঈমানদারদের জন্য খুবই ভয়ংকর যাদের জীবনের ধর্মীয় নেক 'আমলসমূহ একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদন করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে। বৃহৎ শির্কের ভয়াবহতা সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে যদিও জ্ঞানী ও সত্যিকারের ঈমানদার কর্তৃক এতে (আশ-শির্ক আল-আকবার) লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু রিয়া'র (লোক দেখানো অভিপ্রায়) বিষয়টি খুবই গোপনীয় হওয়ার কারণে অন্যদের মতো একজন সত্যিকারের ঈমানদারের পক্ষে এতে (রিয়া') লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। কোন ব্যক্তির শুধু 'আমলের নিয়াত পরিবর্তন ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। এর পিছনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা শক্তি সক্রিয় তা বেশ শক্তিশালী বলেই দৃষ্টমান হয়, কারণ এ বিষয়টির আগমন ঘটে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। ইবনে 'আব্বাস এ বাস্তবতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেন,

---

[১] ইবনে খুযাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত। অন্য হাদীছে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না?' আমরা বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবেন। তিনি ﷺ বলেন, 'বিষয়টি হল গোপন শির্ক। তা এই যে, একজন লোক সলাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সলাত সুন্দর করে আদায় করবে।' (ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ২/১৪০৬; আলবানী, *সহীহুত তারগীব,* ১/৮৯। হাদীছটি হাছান।)

"শির্ক হচ্ছে চন্দ্রহীন রাতের মাঝামাঝি সময়ে একটা কালো পাথরের উপর বেয়ে ওঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপনীয়"[১]

সুতরাং কোন সৎ 'আমল শুরু করার সময় নিয়ত যেন সর্বদা খাঁটি থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। এ বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্র নামে শুরু করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো 'ইবাদাতে পরিণত করতে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে তীব্র সচেতনতা প্রকাশে খানা খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, যৌনকর্ম এবং এমনকি শৌচাগারে যাবার পূর্বে ও পরে অনেকগুলো দু'আ (অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা) পড়তে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই 'তাক্বওয়া' যা চূড়ান্তভাবে নিয়তের বিশুদ্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

তাছাড়া রাসূল ﷺ শির্কের অনিবার্য 'আমলের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হিসেবে যে কোন সময় পড়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"আল্লাহ্র রাসূল ﷺ একদিন খুতবার সময় বলেন, 'হে লোকজন, পিঁপড়ার পথ চলার চেয়েও গোপনীয় শির্ককে ভয় কর।' আল্লাহ্র ইচ্ছায় কয়েকজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, শির্ক যদি পিঁপড়ার পথ চলার চেয়েও গোপনীয় হয়, তাহলে আমরা কিভাবে তা এড়িয়ে যাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'বল:

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ

"আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা আন নুশরিকা শাই'আন না'লামুহু, ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লামুহ।"

(হে আল্লাহ্, জেনে বুঝে শির্ক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এবং আমাদের অজ্ঞাত শির্ক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।)[২]

তাওহীদের তিনটি ক্ষেত্রে কিভাবে শির্ক সাধারণত সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরো বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

---

[১] ইবনে আবি হাতিম কর্তৃক বর্ণিত এবং *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ* কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৫৮৭।

[২] ***আহমাদ*** ও আত্ব-ত্বাবারানী কর্তৃক সংগৃহীত।

৩য় অধ্যায়

আদমের সাথে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

বারযাখ্‌

ইসলাম কোনক্রমেই হিন্দুধর্মের নূতন দেহে পুনর্জন্ম বা মৃত্যর পর আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি মতবাদকে সমর্থন করে না।[১] এ ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ **'কর্ম'**[২] নামক এক মূলতত্ত্বে বিশ্বাস করে। **'কর্ম'** তত্ত্বানুসারে, এ জীবনে কোন ব্যক্তি যে ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে বা যে ধরণের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করবে তার উপর নির্ভর করে তদনুযায়ী সে পুনর্জন্ম লাভ করবে। যদি সে এ জীবনে মন্দ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তবে সে সমাজের নিম্নবর্ণের নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং তারপর সে যদি উঁচু বর্ণের নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করতে চায় তাহলে তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে । অন্যদিকে, যদি সে এ জীবনে সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকে তবে সে সমাজের উঁচু বর্ণের নারীর গর্ভে ধর্মানুরাগী বা সৎ মানব হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করে। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে সে বার বার উচ্চ থেকে উচ্চতর নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পরিপূর্ণ শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বর্ণের একজন সদস্যরূপে পরিগণিত হয়। পুনর্জন্ম চক্রটির তখনই সমাপ্তি ঘটে যখন তার আত্মাটি বিশ্ব আত্মা ব্রহ্মার সাথে **'নির্বাণ'** নামক এক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পুরোপুরি মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতা অর্জন করে।

---

[১] এ ধরণের বিশ্বাস সঠিক ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত লেবাননের দ্রুজ ও সিরিয়ার নুসাইরাইত আল-ওয়াইতের মত কিছু খারেজি ইসমাঈলী শিয়া সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে।

[২] 'কর্ম' দ্বারা মূলতঃ ক্রিয়া, কাজ বা কোন কিছু সম্পাদন করা বুঝায়। অন্য অর্থে 'কর্ম' দ্বারা কোন কর্মকাণ্ডের ফলাফল বা অতীতের কর্মকাণ্ডের সমষ্টি বুঝায়। চান্দোগ্য উপানিষদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সকল মানুষের অতীতের কর্মকাণ্ড সৎ ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণ নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করিবে। আর যাহাদের অতীতের কর্মকাণ্ড অসৎ ও মন্দ ছিল, তাহারা সমাজচ্যুত নারীর গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করিবে। (*Dictionary of Religion* -এর ১৮০ পৃ. বিস্তারিত দেখুন)

ইসলাম এবং আল্লাহ্ প্রেরিত অন্যান্য ধর্মানুসারে, এ পৃথিবীতে কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর পুনরুত্থান দিবসের পূর্বে সে আর কখনই পুনরায় জন্ম লাভ করবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও একমাত্র ইলাহ মহান আল্লাহ্ সুবহনাহূ ওয়া তা'আলা কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পাওয়ার আশায় সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। কোন মানুষের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় আরবীতে 'বারযাখ'[1] হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়টিতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তি যে হাজার হাজার বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে সে হয়তো পুনরুত্থান দিবসের প্রতীক্ষায় রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে যখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। কারণ, রাসূল মুহাম্মাদ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুই তার পুনরুত্থানের প্রারম্ভিক পর্যায়। আর সময়ের হিসাব তো যারা পৃথিবীতে বেঁচে আছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই। কোন ব্যক্তি মৃত্যবরণ করলে সে কালের সীমারেখা অতিক্রম করে এবং হাজার বছরের সময়ও তখন তার নিকটে চোখের এক পলক পড়ার মত সময়ে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন এক গল্পের মধ্যে, যা সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের পর পুনরায় তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন এক ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য শত বছরব্যাপী মৃতাবস্থা প্রদান করেন এবং পুনরুত্থান ঘটানোর পর তার ঘুমন্তকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে ব্যক্তিটির উত্তর ছিল এই যে,

﴿... يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ...﴾ (٢٥٩) (سورة البقرة: ٢٥٩)

"... একদিন ছিলাম কিংবা একদিন হতেও কম...।"

[সূরা আল-বাকারাহ (২): ২৫৯]

একইভাবে, কেউ যদি অজ্ঞান অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর সচেতন অবস্থা ফিরে পেয়ে মনে ক'রে থাকে যে, সে হয়তো খুব অল্প সময় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল বা তেমন উল্লেখযোগ্য সময়ই সে অতিবাহিত করে নি। অনেকেই কয়েক ঘন্টাব্যাপী ঘুমানোর পরও ভাবে যে, সে এই কিছুক্ষণ পূর্বে চোখ বন্ধ করেছিল। সুতরাং বারযাখে শত শত বছরব্যাপী অপেক্ষা করার ব্যাপারে বৃথা কল্পনা করার কোনই যুক্তি নেই, কারণ এ ক্ষেত্রে সময়ের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

---

[1] শাব্দিক অর্থে 'অন্তরায়'। এ সম্পর্কে কুরআনে মহান আল্লাহ্ যা বলেন তার অর্থ হচ্ছে: "এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে হাজির হয় তখন সে বলে : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দাও। যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি করি নি। কখনো না, এটা তো তার একটা কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।" [কুরআন, (২৩): ৯৯-১০০]

সৃষ্টির পূর্বাবস্থা

মানুষের আত্মার ধারাবাহিকভাবে পুনর্জন্ম লাভ সংক্রান্ত মতবাদটিকে যদিও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তবুও ইসলাম এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে যে, পৃথিবীতে জন্মলাভ করার পূর্বে প্রতিটি শিশুর আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর 'আরাফার[1] দিনে না'মান নামক এক জায়গায় তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর বংশধরসমূহ যারা বিশ্বের শেষ সময় পর্যন্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করবে তাদের সবাইকে একত্রিত করেন সকলের নিকট থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি তোমাদের সকলের রব নই?' তারপর তারা সবাই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলাম।' এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে সব বিষয়সমূহ তাদের নিকটে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন, যে সব কারণে তাঁর স্রষ্টা ও 'ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের নিকট থেকে এ জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল যদি তোমরা (মানুষেরা) সেই পুনরুত্থান দিবসে বল, 'আমরা নিশ্চয়ই এ সব ব্যাপারে অবগত ছিলাম না। তাছাড়া আপনিই আল্লাহ্ যে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এ বিষয়েও আমাদের কোনই ধারণা ছিল না। উপরন্তু, আমরা যে একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করতে প্রতিশ্রুত ছিলাম সে ব্যাপারেও আমাদেরকে কেউ জ্ঞাত করেনি।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'তোমাদের কেউ যদি বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা অংশীদার স্থাপন করেছিল (আল্লাহ্র সাথে) এবং আমরা ছিলাম শুধুমাত্র তাঁদেরই অনুসারী; তাহলে ঐসকল মিথ্যাবাদীরা যা করেছে সেজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?"[2] এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ

---

[1] চান্দ্রমাসের দ্বাদশ মাসের ৯ম দিন জুল-হিজ্জা নামে পরিচিত।

[2] কুরআন (৭): ১৭২-১৭৩। এ সংক্রান্ত হাদীছটি ইবনে 'আব্বাসের ছহীহ বর্ণনা যা *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন আল-আলবানীর *'সিলসিলাহ আল-আহাদীছ আছ-ছহীহাহ,* (কুয়েত: আদ-দার আস-সালাফিয়্যা ও আমান: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩) ৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃ., হাদীছ নং ১৬২৩।

تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

(سورة الأعراف: ١٧٢-١٧٣)

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এটা এজন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'। অথবা তোমরা এ কথা না বল যে, 'পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই শিরক্ করেছে আর তাদের পরে আমরা তাদেরই সন্তানাদি (যা করতে দেখেছি তাই করছি) তাহলে ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যা করেছে তার জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?' [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৭২-১৭৩]

এ আয়াতটি এবং রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যা সেই সত্যটিই নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং বিচার দিবসে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের ছাপ প্রতিটি মানুষের আত্মার উপর বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রত্যেক মূর্তিপূজারীর জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেও এ কথা প্রমাণ করেন যে, তারা যে সব মূর্তির পূজা-অর্চনা সম্পাদন করে, তারা তাদের স্রষ্টা নয়। অতএব প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষের একান্ত প্রয়োজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা-কে তাঁর সৃষ্টের মধ্যে না খুঁজে বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, এই মহান স্রষ্টা তাঁর অপরূপ সৃষ্টি সকল কিছুর সীমা বহির্ভূত ও উর্দ্ধে।

অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তারপর প্রতিটি মানুষকে তার ঈমান প্রদর্শনের নিমিত্তে প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে এক আলোর দ্যুতি স্থাপন করলেন এবং সকল মানুষের এ অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে দেখালেন। অসংখ্য মানুষের দু'চোখের মাঝখানে আলোর দ্যুতি ছড়ানো এ দৃশ্য অবলোকন করার পর আদম শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, ঐসব মানুষ কারা?' আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন যে তারা সকলে তার (আদমের) বংশধর। অতঃপর আদম একজন মানুষের খুব কাছাকাছি এসে সে ব্যক্তির দু'চোখের মাঝখানের আলোর দ্যুতি দেখে বিস্মিত হয়ে আল্লাহ্কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ্ বললেন, 'ঐ ব্যক্তি হচ্ছে দাউদ, যিনি তোমার বংশধরদের মধ্যে শেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত।

তারপর আদম ঐ ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে জানালেন যে, ঐ ব্যক্তির বয়স ষাট। তখন আদম প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর কেটে নিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন।' কিন্তু আদমের বয়স যখন একেবারে শেষপ্রান্তে তখন মালাকুল মউত এসে জান কবজ করতে গেলে আদম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জীবনের কি এখনও চল্লিশ বছর বাকী নেই?' মালাকুল মউত উত্তর দিলেন, 'আপনি কি আপনার বংশধর দাউদকে আপনার জীবন থেকে ঐ চল্লিশ বছর দেন নি?' কিন্তু আদম এ বিষয়টি অস্বীকার করল এবং তার বংশধরগণও আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করল। আল্লাহ্র নিকটে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়টি পরবর্তীকালে আদম ও তাঁর বংশধরগণ ভুলে গেল এবং তারা সবাই ভুলের মধ্যে পতিত হল।"[১]

আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়টি ভুলে যাওয়া ও শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ ধোঁকার ফলশ্রুতিতে আদম (ﷺ) নিষিদ্ধ গাছ থেকে ভক্ষণ করেন। আর মূলতঃ এ দু'টি প্রধান কারণেই অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন ও একমাত্র তাঁকেই 'ইবাদাত করার মত দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ) বলেন, 'তারপর আদম ও তার সন্তানদের কিছু বংশধরগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমি এ সব মানুষকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করবে। এরপর আল্লাহ্ অবশিষ্ট মানুষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এ সব মানুষকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসীদের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করবে।' এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহ্র নাবী, ব্যাপারটি যদি আসলে এ রকমই হয়, তাহলে ভাল কাজ করে লাভ কী? রাসূল (ﷺ) উত্তর দেন, 'প্রকৃতপক্ষে যদি আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি তাকে জান্নাতবাসীদের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করতে সাহায্য করেন, আর এ ধরণের কর্ম সে তার মৃত্যু অবধি করতে থাকে। অবশেষে এ কারণেই তাকে আল্লাহ্ জান্নাতের অধিবাসী করেন। যদি আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি তাকে জাহান্নামবাসীদের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করতে সাহায্য করেন, আর এ ধরণের কর্ম সে তার মৃত্যু অবধি করতে থাকে। অবশেষে এ কারণেই তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামের অধিবাসী করেন।[২]

---

[১] এ হাদীছটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর একটি ছহীহ বর্ণনা যা *তিরমিযি* কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন: আলবানী কর্তৃক তাহক্বীককৃত *আল-'আক্বীদাহ আত-ত্বহাভীয়্যা,* (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪) ২২১ নং পাদটীকা, পৃ. ২৪১।

[২] এ হাদীছটি 'উমার ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ)-এর একটি ছহীহ বর্ণনা যা *আবূ দাউদ* কর্তৃক সংগৃহীত, সুনান *আবূ দাউদ,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১৮, হাদীছ নং ৪৬৮৬। *তিরমিযি* ও *আহমাদ,* দেখুন আলবানী

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরোক্ত বর্ণনার মর্মার্থ এ রকম নয় যে, কোন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা ভাল-মন্দের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাশক্তি নেই। আসলে যদি ব্যাপারটি এ রকমই হয়, তাহলে বিচার, পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়সমূহ পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে যায়। জান্নাতের জন্য কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সংক্রান্ত বিষয়টির মূল তাৎপর্য হচ্ছে, কোন মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল রয়েছেন যে ঐ ব্যক্তিটি অবিশ্বাস বা অস্বীকারের পরিবর্তে বিশ্বাস তথা ঈমানকে ও অসৎ-এর পরিবর্তে ভালকে পছন্দ করার কারণে জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোন মানুষ যদি আল্লাহ্কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালায়, তাহলে তার বিশ্বাস তথা ঈমানের বৃদ্ধি সাধনের নিমিত্তে ও তার সৎকর্মের পরিধি তথা বেশি পরিমাণে সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তা'আলা কখনোই কোন বিশ্বাসী বান্দার আন্তরিক বিশ্বাস তথা ঈমানকে নিষ্ফল হতে দেন না, যদিও সেই বিশ্বাসী বান্দা ভুলক্রমে শয়তানের ধোঁকায় সরল পথ হতে ভ্রান্তিতে পতিত হয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সেই বান্দাকে পুনরায় সরল পথে ফিরে আসতে সাহায্য করেন। যখন সে পথভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন তার ভুলক্রটিসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য উদ্দীপ্ত করতে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে হয়তো তাকে এ জীবনে শাস্তি প্রদান করতে পারেন। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা এতটা দয়াশীল যে, অকৃত্রিমভাবে তাঁকে বিশ্বাসকারীদের জীবন এমন সময় গ্রহণ করেন যখন তারা সৎকাজে লিপ্ত থাকে, ফলশ্রুতিতে যেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, তারা জান্নাতের ভাগ্যবান অধিবাসী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে, যদি কোন মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস না রাখে ও সৎকর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমে সর্বদা অসৎকর্মে লিপ্ত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সকল প্রকার অসৎ কর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করা খুবই সহজ করে দেন। এ ব্যক্তিটি কোন অসৎকর্ম সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তাতে সফলতা দান করেন। যার ফলে সে আরও বেশি পরিমাণে অসৎকর্ম করতে উৎসাহিত হয়। অবশেষে সে এক পাপপূর্ণ অবস্থায় বড় পাপী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে এবং তার অসৎকর্মের কারণে সে চিরস্থায়ী শাস্তির জায়গা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

কর্তৃক তাহক্বীককৃত *আল-'আক্বীদাহ আত-ত্বহাভীয়্যা,* (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪) পাদটীকা ২২০ নং, পৃ. ২৪০।

মানবের জন্মগত স্বভাবঃ ফিৎরাত্

আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর যেহেতু সকল মানবজাতিকে তাঁর স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে শপথ করিয়েছেন, তাই এমনকি গর্ভাবস্থায় মানবভ্রুণের বয়স পাঁচ মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এ শপথটি মানুষের আত্মার উপর ছেপে দেয়া হয়। ফলে আল্লাহ্র প্রতি জন্মগত স্বভাব তথা ঈমান নিয়েই প্রতিটি শিশু এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত মানুষের এ জন্মগত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে আরবীতে ফিৎরাত্ বলা হয়।[১] এ শিশুটিকে যদি একাকী বড় হতে দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই সে তার অন্তরে আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের প্রতি ঈমান নিয়ে বড় হতে থাকবে। কারণ, এ সাধারণ মৌলিক বিশ্বাসটি প্রোথিত রয়েছে মানবীয় স্বভাবের আত্ম-প্রকৃতির গভীরে। এটি মানুষের অনুভূতির ব্যাপক সীমান্তব্যাপী এমন শক্ত মৃত্তিকায় শিকড়ায়িত হয়ে আছে যে শত চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাকে উপড়ে ফেলা, কিংবা স্মৃতি থেকে আমূল ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব নয় কারো পক্ষে। অর্থাৎ এটি এমনই এক অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য যাকে মুছে ফেলা যায় না কখনো, এর প্রীতি থেকে কেউ মুক্ত করতে পারবে না কখনো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল শিশুই তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের চাপে প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে বড় হয়ে ওঠে।

নাবী ﷺ বর্ণনা করেন যে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি আমার বান্দাদেরকে সঠিক ও সত্য ধর্মে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তানের দল তাদেরকে সরল পথ থেকে দিকভ্রান্ত করেছে।'[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, 'প্রতিটি শিশু ফিৎরাতের উপরেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু শিশুটির বাবা-মা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান হতে সাহায্য করে এবং অবশেষে সে তা-ই হয়। একটি প্রাণী যেভাবে তার বাচ্চাকে স্বাভাবিকভাবে জন্মদান করে, এ ঘটনাটি ঠিক সেই রকম। তোমরা কি কখনও কোন স্বল্পবয়স্ক বাচ্চা প্রাণী দেখেছ যাকে তোমরা অঙ্গহীন করার পূর্বেই সে জন্মগ্রহণ করেছে অঙ্গহীন অবস্থায়?[৩]

অতএব, আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিধানের নিকটে যেহেতু একটি শিশুর দেহ সমর্পিত হয়, তাই এ শিশুটির আত্মাও স্বাভাবিকভাবে সেই মহা সত্যের নিকটে সমর্পিত হবে যে, আল্লাহ্ই তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। এদিকে

---

[১] আল-'আক্বীদা আত-ত্বহাভীয়্যা, (৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪) পৃ. ২৪৫।

[২] *মুসলিম* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৮৮, হাদীছ নং ৬৮৫৩।

[৩] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৯৮, হাদীছ নং ৬৪২৩; *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ৩৮৯-৩৯০, হাদীছ নং ৫৯৭।

শিশুটির বাবা-মা প্রাণপণে চেষ্টা চালায় যেন এ শিশুটি তাদের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে বড় হয়, কিন্তু শিশুটি যেহেতু তার এ বয়সের সীমাবদ্ধতার কারণে তেমন কোন শক্তির অধিকারী হয় না যাতে সে তার পিতামাতার সংশ্লিষ্ট ঐ চেষ্টার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা বিরোধিতা করতে পারে। তবে শিশুটি এ বয়সে যে ধর্মের অনুসরণ করে, তা হচ্ছে স্বভাবজাত রীতিনীতি, লালনপালন ও শিক্ষা সংক্রান্ত ধর্ম; তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা এ ধর্মকে অনুসরণের জন্য শিশুটির নিকট থেকে কোনপ্রকার হিসাব গ্রহণ বা শাস্তি প্রদান করবেন না। যখন শিশুটি যৌবন প্রাপ্ত হয় ও শিশুটির নিকটে তার এত দিনের অনুসৃত ধর্ম নামক মিথ্যাচারিতার স্বচ্ছ প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপন করা হয়, তখন সেই শিশুটি তখন একজন সাবালক হিসেবে অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির ধর্মকে অনুসরণ করবে।[১] আর এ সময়েই শয়তান সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে সেই সাবালকটি তার পূর্বাবস্থায় থাকতে উৎসাহিত হয় অথবা আরও পথভ্রান্ত হয়। সকল প্রকার মন্দ কর্মকে তার নিকটে সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তাই সরল পথের সন্ধানে যখন সে ফিৎরাত ও তার কামনা-বাসনার মধ্যে সৃষ্ট সংগ্রামের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করতে থাকে। এ মুহূর্তে যদি সে তার ফিৎরাতকে প্রাধান্য দিয়ে সত্যকে অন্বেষণ ও গ্রহণ করে নিতে সক্ষম হয়, তাহলে তার সকল প্রকার কামনা-বাসনার উপর জয় লাভ করতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন, যদিও এ সব ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলী থেকে মুক্তি লাভ করতে তার সমগ্র জীবনের সময়ের প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয়। অধিকাংশের মধ্যে যদিও অনেক পূর্ব থেকে ইসলাম গ্রহণ করার মানসিকতা বিদ্যমান থাকে, তবুও তাদের অনেকেই বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মাধ্যমে আন্তরিক মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয়।

এ সকল শক্তিশালী বিষয়াবলী যেহেতু ফিৎরাতের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধে রত আছে, তাই লোকদের নিকটে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা স্বচ্ছভাবে প্রকাশের নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু পুণ্যবান মানুষ বাছাই করেন, যাদেরকে আমরা নাবী বা রাসূল বলে সম্বোধন করে থাকি। এ সব নাবী বা রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল আমাদের সাহায্য করার জন্য যাতে আমরা ফিৎরাতের সকল শত্রুদেরকে পরাজিত করতে পারি। সমগ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে যে সব সমাজ বর্তমানে বিদ্যমান সে সব সমাজের সকল প্রকার সত্য ও কল্যাণকর আচার-অনুষ্ঠান শুধুমাত্র তাঁদের প্রচারিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত। তাঁদের সেই মহা মূল্যবান শিক্ষার ছোঁয়া ব্যতীত সুন্দর এ পৃথিবীতে কোনপ্রকার শান্তি বা নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকা

---

[১] শরহ-'আক্বীদাহ আত-ত্বহাভীয়্যা, (৫ম সংস্করণ, ১৯৭২), পৃ. ২৭৩।

কল্পনাতীত হয়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অধিকাংশ পশ্চিমা দেশগুলোর আইনকানুন নাবী মূসার **'দশটি বাণী'**র বিধানকে[১] ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন, 'চুরি করিবে না', 'হত্যা করিবে না' ইত্যাদি। এত কিছুর পরেও তারা দাবী করে যে, তাদের সরকার ধর্ম নিরপেক্ষ তথা যে কোন ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত।

তাই মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে নাবী ও রাসূলগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। কারণ, এটিই একমাত্র সঠিক ও সত্য পথ যা সত্যিকার অর্থেই মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, মানুষের জন্মগত স্বভাবজাত প্রকৃতিবিরুদ্ধ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়ার দ্বারা কল্যাণকর কিছুই অর্জিত হয় নি। বাঁধ বেঁধে না দিলে প্রমত্ত নদী তার সকল অস্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হবে, কিন্তু তাতে গড়ার চেয়ে ধ্বংসের পরিমাণই হবে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফিৎরাত্-বিচ্ছিন্ন জীবন অবশ্যই পুরোপুরি অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ জীবনের মানুষের নিকট থেকে আমরা আর কিই-বা পেতে পারি বা পাওয়ার আশা করতে পারি। অতএব, মানুষকে কিছু ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে সচেতন হতে হবে, যেমন, শুধুমাত্র তার পিতামাতা ও পূর্বপুরুষেরা করত বলেই কোন কর্ম সম্পাদন করা কখনই কারো জন্য সমীচীন হবে না যদি সে তার সত্য জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করে কর্মগুলোকে ভুল হিসেবে বিবেচনা করে। এ ক্ষেত্রে যদি সে সত্যের অনুসরণ না করে, তাহলে সে ঐসকল ভ্রান্তপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾﴾ (سورة البقرة: ١٧٠)

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ জিনিসের অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই উপর চলব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝতো না এবং সঠিক পথে চলতো না তবুও।" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১৭০]

উপরন্তু আমাদের পিতামাতা যদি এমনটি আশা করেন যে, আমরা নাবী ও রাসূলদের প্রদর্শিত পথের বিপরীতে কর্ম সম্পাদন করি, তবে এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা মেনে নিতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেন:

---

[১] তবে প্রকৃতপক্ষে তাদের আইন-কানুন 'দশটি বিধান' এর পরিবর্তে 'নয়টি বিধান'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা দশটি বিধানের একটি হচ্ছে **"শির্ক না করা।"** অথচ তাদের আইন-কানুনে এটির উল্লেখ নেই। *-অনুবাদক*

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا... ﴿٨﴾﴾ (سورة العنكبوت: ٨)

"পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য আমি মানুষের প্রতি ফরমান জারি করেছি। তারা যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে আমার সঙ্গে শরীক করার জন্য এমন কিছুকে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মান্য কর না...।" [সূরা আল-'আনকাবূত (২৯): ৮]

জন্মসূত্রে মুসলিম

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার কারণে যারা ভাগ্যবান, তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে ভালভাবে অবগত যে, এ রকম নামধারী **'মুসলিম'**রা কখনও আপনা হতেই জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার কোন নিশ্চয়তা পায় নি। কারণ, রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এ বলে সতর্কবাণী প্রদান করেছেন যে, মুসলিম জাতির এক বড় অংশ ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে এত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করবে যে, এ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যদি সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করে তবে মুসলিমরাও সাথে সাথে তাদের পিছু পিছু তাতেই প্রবেশ করবে।[১] তিনি আরও বলেন যে, শেষ দিবস তথা কিয়ামাতের পূর্বে কিছু মুসলিম সত্যিই মূর্তি পূজা করবে।[২] এ ধরণের সকল লোকজন মুসলিম নামের অধিকারী হবে এবং তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হিসেবে মনে করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সব কোনকিছুই বিচার দিবসে তাদের জন্য সুফল আনয়ন করবে না। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে এমন ধরণের মুসলিম জনগণ রয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের পূজা-অর্চনা করছে, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এমনকি তথাকথিত এ সব তীর্থস্থানসমূহকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছে। কিছু মানুষ এমনও রয়েছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে কিন্তু 'আলীকে আল্লাহ্ হিসেবে পূজা করে।[৩] কেউ কেউ কুরআনকে সৌভাগ্য আনয়নকারী হিসেবে চেইনের সাথে গলায়, গাড়িতে

---

[১] আবূ সা'ঈদ আল-খুদরি কর্তৃক বর্ণীত ও *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ৩১৪-৩১৫, হাদীছ নং ৪২২; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১৪০৩, হাদীছ নং ৬৪৪৮।

[২] আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণীত ও *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৯, পৃ. ১৭৮, হাদীছ নং ২৩২; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ১৫০৬, হাদীছ নং ৬৯৪৪-৬৯৪৫।

[৩] সিরিয়ার *নুসাইরীস* ও ফিলিস্তিন ও লেবাননের *দ্রুজরা* ।

অথবা চাবির রিং-এ ঝুলিয়ে রাখে। ফলশ্রুতিতে, যারা এ ধরণের মুসলিম বিশ্বে জন্মগ্রহণ করে, তারা সম্পূর্ণ অন্ধভাবে অনুসরণ করছে সেই 'আমল বা কর্ম যা তাদের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষেরা সম্পাদন করেছে অথবা সেই বিষয়াবলী যার উপর তাদের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষেরা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এ সকল মুসলিমদের উচিত এ মুহূর্তে সকল প্রকার অন্ধ অনুসরণ বন্ধ করে শান্তভাবে ভেবে দেখা যে, তারা কি মুসলিম হয়েছে ঘটনাক্রমে নাকি তাদের ঐকান্তিক পছন্দের কারণে? ইসলাম কি তা-ই যা তার পিতামাতা, পূর্বপুরুষ, গোত্র, দেশ বা জাতি যা পূর্বে সম্পাদন করেছে বা বর্তমানে করছে, না কি তা-ই যা কুরআন শিক্ষা দেয় এবং যা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) করেছিলেন?

প্রতিশ্রুতি

প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র নিকটে যে অঙ্গীকার করেছিল তা হচ্ছে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলাকে তার প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে ও একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদাত করবে না তথা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করবে না। আর এটিই শাহাদাতের (আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা) মূল, পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে যার সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*** (আল্লাহ্ ছাড়া কোনই সত্য ইলাহ নেই) বাক্যটি কালিমা আত-তাওহীদ নামে পরিচিত, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্বের বর্ণনা ঘোষিত হয়। অতীতে রূহের জগতে সর্বপ্রথম যে ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছিল তা বাস্তবায়নের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে এ জীবনে আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সেই অঙ্গীকারটি নিখুঁতভাবে রক্ষা করা যায়?

তাওহীদের উপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এবং দৈনন্দিন জীবনে এ বিশ্বাসের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অঙ্গীকারটি সুচারুরূপে রক্ষা করা যায়। **শির্‌ক** (আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর অংশীদার স্থাপন করা) সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আচার-আচরণ বর্জন দ্বারা এবং ঘনিষ্ঠভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ দ্বারা তাওহীদের চর্চা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন তাওহীদের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের সম্পূর্ণ বাস্তব ও প্রাণবন্ত এক অনন্য অত্যুজ্জ্বল নমুনা হিসেবে। আল্লাহ্ তা'আলাকে যেহেতু মানুষ তাদের একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল, তাই তাকে অবশ্যই ঐ সকল কর্মকে সৎকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে যা শুধুমাত্র

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক সৎকর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। আর পাপ কর্মের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য অর্থাৎ ঐ সকল কর্মকে পাপকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক পাপকর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাওহীদের মূল নীতিমালা মানসিকভাবে চর্চা করতে হবে। এ পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। কারণ, কোন একটি কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৎ বলে মনে হলেও আসলে তা পাপকর্ম। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন মহল থেকে এ কথা বলা হয়েছে যে, কোন গরীব লোক যদি তার নিজের কাজের ব্যাপারে রাজাকে কিছু বলার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ লোকটার পক্ষ থেকে রাজার সাথে কথা বলার জন্য কোন রাজকুমার বা এমন কাউকে খোঁজা দরকার যার সাথে রাজার সখ্যতা রয়েছে, এভাবে অগ্রসর হলে সহজেই সুফল আনয়ন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ের উপর দৃঢ়ভাবে ভিত্তি করে পরবর্তীতে বলা হয়, কারও প্রার্থনার বিপরীতে কেউ যদি আসলেই আল্লাহ্র সাড়া প্রত্যাশা করে, আর যেহেতু সে সর্বদা পাপ কাজ করায় লিপ্ত, তাই তার জন্য ভাল হবে নাবী, রাসূল, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলিয়া বা দরবেশের নিকটে প্রার্থনা করা। এ ব্যাপারটি অবশ্য যৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ উভয়ই খুব স্পষ্টভাবে মানুষকে কোনপ্রকার মধ্যস্থতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ... ﴿٦٠﴾﴾ (سورة غافر: ٦٠)

"তোমার প্রতিপালক বলেন— তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব... ।"
[সূরা গাফির (আল-মু'মিন) (৪০): ৬০]

রাসূল ﷺ বলেন, 'তুমি যদি কোন কিছু প্রার্থনা কর, তবে একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই কর, এবং তুমি যদি সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে শুধু আল্লাহ্র নিকটেই কর।[১]

---

[১] ইবনে 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত ও তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন, আন-নববীর ***চল্লিশ হাদীছ***, (ইংরেজি অনুবাদ), পৃ. ৬৮। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, *'তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তাহলে তাও একমাত্র তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।'* (*সুনান তিরিমিযী*, হা/৩৯৭৩; *সহীহ ইবনু হিব্বান*, ৩/১৪৮, ১৭৬; *মাওয়ারিদুয যাম'আন*, ৮/৪১-৪২, *মাযমাউয যাওয়াইদ*, ১০/১৫০; হাদীছটি ছহীহ।) 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, *'তোমরা সবকিছু আল্লাহ্র কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও আল্লাহ্র কাছে চাইবে। কারণ আল্লাহ্ ব্যবস্থা না করলে জুতার ফিতাও মিলবে না।'* (আবূ ইয়ালা মাওসিলী, ***আল-মুসনাদ***, হা/৪৫৬০; *মাযমাউয যাওযাইদ*, ১০/১৫০; হাদীছটির সনদ সহীহ।)

একইভাবে, কোন একটি কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দ বলে মনে হলেও আসলে তা ভাল কর্ম। কিছু মানুষ এ কথা বলতে পারে যে, কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলার কাজটি এক প্রকার বর্বরতা বলেই প্রতীয়মান হয় অথবা কেউ মদ্যপান করলে তাকে চাবুক মারা এক ধরণের অমানুষিক কাজ। আবার অনেকেই ভাবতে পারে যে, এ ধরণের শাস্তি খুবই কঠোর ও ভাল নয়। তথাপি, এ সকল শাস্তির বিধান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, আর এ সব শাস্তির প্রয়োগের কল্যাণকর পরিণাম এগুলোর যথোপযুক্ততার সাক্ষ্য প্রদান করে। অতএব, কোন মানুষের পিতামাতা মুসলিম হোক বা না হোক, এ ক্ষেত্রে তার পক্ষে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যদি সে শুধুমাত্র তার নিজের ঐকান্তিক পছন্দের কারণে ইসলামকে নির্বাচন করে থাকে। ইসলামের বিধানসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা মূলতঃ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করারই নামান্তর। ইসলামের উপর মানুষের *ফিৎরাত্* প্রতিষ্ঠিত। ফলে, যখন সে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের চর্চা অব্যাহত রাখে, তখন তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপও সেই ফিৎরাতের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়, যা সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তা হিসেবে। এ ঘটনাটি যখন ঘটে যায়, তখন মানুষের অভ্যন্তরীণ মানসিক সত্তার সাথে তার বাহ্যিক সত্তার ঐক্য সাধিত হয়ে থাকে, যা তাওহীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে ফিরিশতারা যার প্রতি সিজদা করেছিল সেই আদমের রূপে সত্যিকার ধার্মিক মানুষের সৃষ্টি এবং যাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছিলেন এ পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করতে- এগুলো সবই তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটির ফলাফল হিসেবে প্রকাশমান। কারণ, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই সত্যিকার ন্যায়সঙ্গত বিচার পরিচালনা করতে পারে, যে প্রকৃত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ অধ্যায়

যাদু ও শুভ-অশুভ আলামত

সকল মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁকে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও রক্ষা কর্তা হিসেবে মেনে নেয়ার স্পষ্ট উপলব্ধিকে *তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ* (কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় একত্ব) বলে, যা তাওহীদের উপরে বর্ণিত প্রথম অধ্যায়ে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বিশ্বজাহানের সৃষ্টি, পরিচালনা এবং এ সকল কিছুর চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন সংঘটিত হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর সকল প্রকার সৌভাগ্য ও দুভার্গ্যের নিয়ন্ত্রক এবং নির্ধারকও একমাত্র আল্লাহ্। তবুও যুগে যুগে মানুষের মনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, কাঙ্ক্ষিত সুসময় বা অনাকাঙ্ক্ষিত মন্দসময় আসার পূর্বেই কি মানুষ তা কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জানতে পারে? কারণ, এটা যদি সম্ভব হতো, তাহলে দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে সাফল্য নিশ্চিত করা যেত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই কিছু কিছু মানুষ এ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করেছে। ফলে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক অর্থকড়ি খরচের মাধ্যমে তাদের জন্য নির্ধারিত ভাগ্যের লিখনের অদৃশ্য তথা সংঘটিতব্য বিষয়াবলী জানতে তথাকথিত ভবিষ্যৎবক্তার পিছনে ঘুরঘুর করেছে। তাই সৌভাগ্য আনয়নে বিভিন্ন প্রকার তা'বিজ, কবজের ছড়াছড়ি অধিকাংশ সমাজে প্রায়ই দৃষ্টমান হয়। কিছু কল্পিত গোপনীয় পথ ও পদ্ধতি রয়েছে যেগুলোকে সাধারণত বিশেষ জ্ঞান বলে গণ্য করা হয়; ফলে বিভিন্ন প্রকার শুভ-অশুভ আলামত ও এগুলোর ব্যাখ্যা বিভিন্ন সভ্যতায় বিদ্যমান রয়েছে। এ সব জ্ঞানের যৎসামান্য গোপন অংশটি অবশ্য যাদুমন্ত্র ও ভাগ্যগণনার বিভিন্ন প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্র রূপে বংশ পরস্পরায় হস্তান্তরিত হয়েছে।

মানব সমাজে এ সব চর্চা করার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করার কারণে এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রকাশ করা অতি জরুরী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, এ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে, ঐসব চর্চার অভ্যন্তরে বিদ্যমান শির্‌কে যে কোন মুসলিম খুব সহজেই লিপ্ত হতে পারে।

ঐ সব কথিত দাবী যা আল্লাহ্‌র একক গুণাবলীর (সিফাত) বিরুদ্ধে সর্বদা ক্রিয়াশীল এবং সৃষ্টির উপাসনার ('ইবাদাত) ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কিংবা সৃষ্টির উপাসনার দিকে মানুষকে তাড়িত করে- এর সাথে ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কুরআন ও রাসূলের বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে প্রতিটি দাবী বিশ্লেষণ করা হবে এবং প্রতিটি দাবী সম্পর্কে তাঁদের জন্য নির্দেশনা আকারে ইসলামি বিধানাবলী জানানো হবে যাঁরা আন্তরিকভাবে প্রকৃত তাওহীদের বাস্তবতাকে খুঁজছেন।

যাদুমন্ত্র

শয়তান তাড়িয়ে সৌভাগ্য আনয়ন করতে কঙ্কন/বালা, চুড়ি, পুঁতির মালা, ঝিনুক ইত্যাদি কবচ হিসেবে পরার রেওয়াজ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমকালীন আরবের জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া সৌভাগ্য বহনকারী বিভিন্ন প্রকার তাবিজ ও মন্ত্রপূত কবচ পৃথিবীর প্রায় সব এলাকায় পাওয়া যেত। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে যে, যাদু, মন্ত্রপূত কবচ ও তাবিজের মত সৃষ্ট বস্তুকে শয়তান দূরীকরণ ও সৌভাগ্য আনয়নকারী হিসেবে বিশ্বাস করা মানে আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকারের বিশ্বাসের বিরোধিতা করা। শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময়ে বিদ্যমান এ সকল বিশ্বাসের বিরোধিতায় ইসলাম এ কারণে সদা সক্রিয় ছিল যাতে এমন একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয় যাতে যখনই বা যেখানেই অনুরূপ বিশ্বাসের আত্মপ্রকাশ লাভ করুক না কেন তৎক্ষণাৎই যেন তা বাতিল ও নিষিদ্ধ করা যায়। এ ধরণের বিশ্বাস মূলত মূর্তিপূজকদের সমাজে পৌত্তলিকতার ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলে এবং যাদুমন্ত্র স্বয়ং মূর্তিপূজারই একটি অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ সকল বিশ্বাসের সাথে খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়; কারণ নাবী যিশুকে (ঈসা عليه السلام) এরা শুধু প্রভুত্বের আসনেই উন্নীত করেনি, বরং তাঁর মাতা মেরিসহ (মারইয়াম) বিভিন্ন সাধুদের উপাসনা করে। অধিকন্তু তারা সৌভাগ্য আনয়নের উদ্দেশ্যে তাঁদের কল্পিত আকৃতি সম্বলিত ছবি, মূর্তি ও পদককে সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করে।

নাবী ﷺ-এর সময় নবদীক্ষিত মুসলমানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করত যা আরবীতে তামা'ইম (একবচনে 'তামীমাহ') বলা হয়। এর ফলে, রাসূল ﷺ-এর অনেক হাদীছ রয়েছে যেখানে তিনি জোরালোভাবে এ ধরণের সকল চর্চাকে নিষিদ্ধ করেছেন। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল:

'ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন,

"একটি লোকের হাতের বাহুতে বালা দেখে রাসূল ﷺ লোকটিকে বললেন, লা'নত পড়ুক তোমার উপর! এটা কী? লোকটি উত্তর দিল যে, *আল-ওয়াহিনাহ*[১] নামক এক রোগ হতে রক্ষা পেতে এটি ব্যবহার করছি। তারপর রাসূল ﷺ বলেন: এটাকে পরিত্যাগ কর, নিশ্চয়ই এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে। আর তুমি যদি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি কখনই সফল হবে না।"[২]

সুতরাং পিতল, তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে প্রস্তুত ধাতু বা লোহা বা তামার তৈরি বালা, চুড়ি ও আংটি যদি কোন অসুস্থ বা স্বাস্থ্যবান লোক পরে এই বিশ্বাসে যে, এগুলোর মাধ্যমে অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বা রোগের উপশম হয়, তাহলে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এ বিষয়টি '*হারাম* (নিষিদ্ধ) দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসা নিষিদ্ধ' নামক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন,

'তোমরা একে অপরের অসুস্থতার চিকিৎসা কর, তবে নিষিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করো না।'[৩]

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইছি বর্ণনা করেন,

"আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যখন হুনাইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে *যা-তু আনওয়াত*[৪] নামক এক বৃক্ষ অতিক্রম করলেন। সৌভাগ্য লাভের আশায় এ গাছের ডালে ডালে মূর্তিপূজারীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। ইসলামে নবদীক্ষিত কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-কে ঐ বৃক্ষটির মতো অন্য একটা বৃক্ষকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে বলল। রাসূল ﷺ বললেন, *সুবহানাল্লাহ!*[৫] এ বিষয়টি তো ঠিক সেই রকম যা মূসা (আঃ)-কে লোকজন বলেছিল:

﴿... اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ... ﴾ (١٣٨) (سورة الأعراف: ١٣٨)

"...*আমাদের জন্যও 'কোন দেবতা বানিয়ে দাও যেমন তাদের দেবতা আছে...।*" [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৩৮]

---

[১] আভিধানিক অর্থে *অসুস্থতা*। সম্ভবত গেঁটে বাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

[২] *আহমাদ*, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত।

[৩] আবূ দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবি দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৭।

[৪] আভিধানিক অর্থে, "এমন ধরণের বস্তু যার উপর কিছু ঝুলছে"।

[৫] এর অর্থ 'আল্লাহ্ তা'আলা মহা পবিত্র'।

যাঁর হাতে আমার এ প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা সবাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।"[১]

এ হাদীছে রাসূল ﷺ শুধু সৌভাগ্যের আলামত ও বস্তুগুলোর ধারণাকেই নাকচ করেন নি; বরং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকে অনুকরণ করবে। যিক্‌র[২] করার জন্য মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

---

[১] তিরমিযি, নাসাঈ ও *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত। শায়খ আল-আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; *ছহীহ সুনান তিরমিযি,* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), খণ্ড ২, পৃ. ২৩৫, হাদীছ নং ১৭৭১।

[২] যিক্‌র ইসলামের অন্যতম ইবাদত। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীছেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যিক্‌র (আল্লাহ্‌র স্মরণ) ও তাসবীহ (আল্লাহ্‌ পবিত্রতা বর্ণনা)-এর বৈধ্যতা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যিক্‌র দু'ভাবে আদায় করা যায়ঃ বেশি বেশি পাঠ করে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ করে। নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্‌রের জন্য গণনার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখি যে, কোন কোন সাহাবী ও পরবর্তী ইমামগণ যিক্‌র গণনা করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলতেন, আল্লাহ্‌ই তো গণনা করছেন, তুমি কেন গণনা করবে, তুমি কি আল্লাহ্‌র কাছে যেয়ে গুণে হিসাব বুঝে নিবে? আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) কাউকে যিক্‌র গণনা করতে দেখলে বলতেন, তোমাদের গোনাহগুলো গণনা করে হিসাব করে রাখ, সাওয়াব গণনার কোন প্রয়োজন নেই। উকবা ইবনু সুবহান নামক এক তাবিঈ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, যদি কেউ যিক্‌রের সময় তার তাসবীহ-তাহলীল গণনা করে হিসাব করে রাখে তাহলে কী হবে? তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তোমরা কি আল্লাহ্‌র হিসাব নিবে? *(ইমাম তহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার, ১০/২৯১; এই হাদীছ দু'টির সনদ সহীহ)* এ সকল হাদীছের আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) ও তাঁর সঙ্গীগণ তথা ফিকহের ইমামগণ যিক্‌র ও তাসবীহ-তাহলীল গণনা মাকরুহ বলে মনে করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহি.)-এর সনদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) থেকে ইমাম ত্বহাবী (রাহি.) এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ত্বহাবী (রাহি.) এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, যে সব যিক্‌র হাদীছে নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত তা গণনা করে পাঠ করা। কারণ গণনা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয়েচে কিনা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত সাওয়াবের পরিমাণ যিক্‌র পালিত হয়েছে কিনা তা জানার উপায় নেই। এ জন্য এ-সব যিক্‌র গণনা করে পালন করতে হবে। আর যে সব যিক্‌র সাধারণভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিশেষ সংখ্যার জন্য বিশেষ সাওয়াব বর্ণনা করা হয় নি, সে সব যিক্‌র গণনা করা বাতুলতা। সেক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র হিসাব গ্রহণের প্রশ্ন আসে। নির্ধারিত সংখ্যক যিক্‌রের অতিরিক্ত সকল সাধারণ যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব কোন রকম গণনা বা হিসাব ছাড়া যথাসম্ভব বেশি বেশি এবং মনোযোগ সহকারে এ সকল যিক্‌রের বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। হিসাবপত্রের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিতে হবে। *[আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী, আল-মুসান্নাফ ২/২৩৮; ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ১/৪৪৬, মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/৩৩২; শাওকানী, নাইলুল আউতার ২/৩৫৯; মানাবী, ফাইযুল কাদীর, ৪/৩৫৫]* সাহাবী ও তাবিঈগণের কর্ম থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সলাত, তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ, রাসূলের প্রতি সালাম, ইত্যাদি যিক্‌র যা সাধারণভাবে বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনেকে নিজের সুবিধা মতো নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এগুলি তাঁরা গণনা করে আদায় করতেন। এর অতিরিক্ত অগণিত যিক্‌রও তাঁরা আদায় করতেন। তবে যিক্‌র গণনা করার ক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করা সুন্নাত ও অধিকতর উত্তম, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাসবীহ-তাহলীল

তথাকথিত তসবীহ্ নামক গুটিকার মালা মূলত ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জপমালার অনুকরণ, বড়দিনের অনুকরণে মিলাদ[১] (রাসূলের জন্মদিন পালন) এবং পীর, বুযুর্গ, দরবেশ, ওলী বা আওলিয়াদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশ্বাস করার

ও যিক্‌র-আযকার সর্বদা হাতে গণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (ﷺ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখলাম তিনি নিজের হাতে (অন্য বর্ণনায়ঃ ডান হাতে) তাসবীহের গিঠ দিচ্ছেন (হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করছেন।)' *[সুনানুত তিরমিযী, হা/৩৪৮৬; সুনানু আবূ দাউদ, হা/১৫০২; মুসতাদরাক হাকিম, ১/৭৩১-৩২; নাসাঈ, ১/৪০৩; সহীহ ইবনু হিব্বান, ৩/১২৩, মাওয়ারিদুয যামআন, ৭/৩৪০-৪১; হাদীছটির সনদ সহীহ]* হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করার উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতে গণনা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইউসাইরাহ (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন, 'তোমরা মহিলাগণ অবশ্যই তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন) করবে এবং আঙ্গুলের গিটে গণনা করবে। কারণ এদেরকে কিয়ামাতের দিন প্রশ্ন করা হবে এবং কথা বলানো হবে (এরা যিক্‌রের সাক্ষ্য প্রদান করবে)। *[সুনানুত তিরমিযী হা/৩৪৮৬, ৩৫৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২২; হাকিম ১/৭৩২; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৫/৭৪; মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৩৯]* অতএব, এ কথা সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, সংখ্যা নির্ধারিত যিক্‌র তথা তাসবীহ-তাহলীল সর্বদা হাতের (ডান হাতের) আঙ্গুলে গণনা করাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রকৃত সুন্নাত ও নির্দেশনা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাইতে বেশী পরিমাণে তাসবীহ-তাহলীল কেউই করেন নি, কিন্তু তিনি (ﷺ) কখনোই তা গুণে রাখার প্রয়োজনানুভব করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তথাপি প্রয়োজনে, বিশেষত যাঁরা দৈনিক বেশি সংখ্যক যিক্‌র নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন, তাঁরা তাসবীহ দানা, কাঁকর, খেজুরের বা সীমের বা অন্য কোন বীচি, ছোলা, গিঠ দেয়া সূতা (তাসবীহ দানার মতো) ইত্যাদি ব্যাবহার করতে পারেন। তবে এগুলো উপকরণ মাত্র। এ উপকরণসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যেন, এগুলো ইবাদতের অংশ হিসেবে বা মূল ইবাদাতের পদ্ধতি বা দ্বীনের মধ্যে গণ্য করা না হয়। অর্থাৎ কেউ যদি এ কথা মনে করে যে, এ সকল উপকরণ তথা তসবীহ দানা ব্যবহারের মাধ্যমে যিক্‌র সম্পন্ন করলে বেশী সাওয়াব লাভ করা সম্ভব তবে এটি বিদ'আত বলে পরিগণিত হবে। উপরন্তু একটি কথা না বললেই নয় তা হচ্ছে, হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করলে কিয়ামাতের দিন তা আল্লাহ্‌র নিকটে সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, এমনকি এ কথার সমর্থনে কুরআনের অনেক আয়াতও রয়েছে; কিন্তু এসব উপকরণের মাধমে যিক্‌র গণনা করলে তা সাক্ষী হবে কিনা এ বিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণই পাওয়া যায় না। *[বিস্তারিত দেখুনঃ* ইবনু রাজাব, *জামিউল উলূম আল হিকাম ১/৪৪৬,* মুবারাকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/৩৩২;* শাওকানী, *নাইলুল আউতার ২/৩৫৯;* মানাবী, *ফাইযুল কাদীর, ৪/৩৫৫;* শায়খ সালিহ বিন ফাওযান, *'হাক্বীকাতুত তাসাউফ ওয়া মাওক্বিফুস সূফীয়্যাহ মিন উসূলিল 'ইবাদাতি ওয়াদ দ্বীন'; 'রাহে বেলায়াত', পৃ. ১৮৭-৮৯; 'এহ্ইয়াউস সুনান', পৃ. ৩০৫-১৮] - অনুবাদক*

[১] বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন মূলত অমুসলিম সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা নিজেদের দেশজ বা পূর্বধর্মের রীতিনীতি ত্যাগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ-অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব, পারসিক ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, যার মধ্যে পবিত্র! ঈদে মিলাদুন্নাবী অন্যতম। (বিস্তারিত দেখুনঃ *এহ্ইয়াউস সুনান,* পৃ. ৫২৩) -অনুবাদক

সাথে খ্রিস্টানদের যাজক, পাদ্রী ও ধর্মীয় পণ্ডিত এবং মক্কার তৎকালীন মুশরিকদের মূর্তিকে মধ্যস্থতাকারী বলে গ্রহণ করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। রাসূলের ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে!

যারা মন্ত্রপূত কবচ ব্যবহার করে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলে রাসূল ﷺ তা'বিজ ও কবচ ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদেরকে আরো জোরালোভাবে সতর্ক করেছেন। 'উক্ববাহ্ ইবনে 'আমির বর্ণনা করেন যে একদা রাসূল ﷺ বলেন,

'আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে ব্যর্থতা ও অস্থিরতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করান, যে নিজে মন্ত্রপূত তা'বিজ-কবচ পরে ও অন্যকে পরায়।'[1]

সাহাবীগণ যাদুমন্ত্র ও তা'বিজ-কবচ সম্পর্কে রাসূলের ﷺ বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। ফলে এমন অনেক ঘটনা হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যার মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীরা তাঁদের সমাজের পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের মধ্যে যখনই এ ধরণের কোন কিছুর চর্চা করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন তখনই তাঁরা এ ব্যাপারে সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। 'উরাহ বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়ে ঐ লোকটির বাহুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিঁড়ে ফেলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ (سورة يوسف: ١٠٦)

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।"

[সূরা ইউসুফ (১২): ১০৬][2]

অন্য সময়, তিনি অসুস্থ লোকটির বাহুতে একটি *খিয়াত* নামক বালার সন্ধান পেয়ে সে সম্পর্কে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি উত্তর দিল, বিশেষ করে আমার নিজের জন্য মন্ত্রপূত বস্তু। তৎক্ষণাৎ লোকটার বাহু থেকে সেই বস্তুটি ছিঁড়ে ফেলে হুযাইফা বললেন, তুমি যদি এটা তোমার সঙ্গে থাকাবস্থায় মারা যেতে, তাহলে আমি কখনোই তোমার জন্য জানাযা সলাত আদায় করতাম না।[3] আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

---

[1] ***আহমাদ*** ও আল-হাকীম কর্তৃক সংগৃহীত।

[2] ***আহমাদ*** ও আল-হাকীম কর্তৃক সংগৃহীত। ইবনু কাসীর, *তাফসীর,* ২/৪৯৫।

[3] ইবনে আবী হাতীম কর্তৃক সংগৃহীত।

যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সূতা দেখতে পান। তিনি বলেন, এ কিসের সূতা? আমি বললাম, এ ফুঁক দেওয়া সূতা। যায়নাব বলেন, তখন তিনি সূতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহ্‌র পরিবারের শির্‌ক করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: 'ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ-কবচ এবং মিল-মহব্বতের তা'বীজ শির্‌ক।' যায়নাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসউদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহ্‌র কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত। আমি অমুক ইহুদীর কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত, তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাস'ঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এ হল শয়ত্বানের কর্ম। শয়ত্বান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোঁচাতে থাকে। এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোঁচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলতেন তা বলবে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন:

أَذْهَبِ الْبَأْس رَبَّا النَّاس وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءً إِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا

"আযহিবিল-বা'স রব্বান-নাস ওয়াশফি, আংতাশ-শা'ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউক, শিফা আন লা ইউগহাদিরুহু সাক্বামা"

অর্থ: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই একমাত্র শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা) ছাড়া আর কোন শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোন অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না।[১]

---

[১] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ১/৩৮১; হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* ৪/২৪১। আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবী দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৮৯, হাদীছ নং ৩৮৭৪। ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান। শাইখ আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, *সহীহ সুনান আবী দাউদ,* খণ্ড ২, পৃ. ৭৩৬-৩৭, হাদীছ নং ৩২৮৮। এ দু'আটি অবশ্য 'আয়িশা ও আনাস কর্তৃকও বর্ণিত এবং ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত। ***বুখারী*** (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪২৭-২৮, হাদীছ নং ৫, ৬৩৮-৩৯; ***মুসলিম*** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯৫, হাদীছ নং ৫৪৩৪।

যাদু সম্পর্কে ইসলামের বিধান

পূর্বে উল্লেখিত রাসূল ﷺ কর্তৃক মন্ত্র, তা'বিজ-কবচ, সূতা, তাগা, অবৈধ ঝাড়-ফুঁক ও যাদুর নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুধু আরব দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কোথাও যদি কোন বস্তুকে ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে সেখানেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও পশ্চিমা সমাজে[১] এখনও বিভিন্ন প্রকারের জাদুমন্ত্রের ছড়াছড়ি প্রত্যক্ষ করা যায়। অনেক তা'বিজ-কবচ, সূতা, তাগা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে যে কেউ এ সম্পর্কে ভাবার অবকাশ পায় না। কিন্তু এ সব তা'বিজ-কবচের উৎস দেখিয়ে দিলে, এগুলোর মূলে শির্কের শক্ত অবস্থান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত অসংখ্য তা'বিজ-কবচ হতে সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

খরগোশের পা

খরগোশের পেছনের থাবা বা এই থাবার মতই স্বর্ণ ও রূপার নকল থাবাকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে পশ্চিমা দেশের লাখ লাখ মানুষ গলায় হারের সাথে ও চুড়ি বা বালার সাথে পরে। খরগোশের পিছনের পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করার অভ্যাস হতেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রাচীন লোকদের মতানুযায়ী, ভূগর্ভস্থ আত্মাদের সঙ্গে খরগোশরা সাধারণত মাটিতে আঘাত করার মাধ্যমে কথা বলত। তাই সাধারণত সৌভাগ্য আনয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে ও আত্মাদের নিকটে কারো মনোবাঞ্ছা জানাতে খরগোশের পিছনের থাবা সংরক্ষণ করা হতো।

ঘোড়ার পায়ের নাল

সৌভাগ্য আনয়নকারী হিসেবে আমেরিকার অনেক বাড়ির দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল পেরেক দিয়ে লাগানো রয়েছে। তাছাড়া ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে চুড়ি, বালা, চাবির চেইন বা গলার হারের উপরেও ঘোড়ার খুরের নালের প্রতিকৃতি ছাপিয়ে পরা হয়। এ বিশ্বাসের উৎসমূল হিসেবে সাধারণত প্রাচীন গ্রীক

---

[১] কেবল পশ্চিমা সমাজের কথা বা এ সমাজে প্রচলিত শির্ক সম্বন্ধে এখানে আলোচনার কারণ হল, লেখক এ বইটি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন মূলত ইংরেজি ভাষাভাষী তথা পশ্চিমা সমাজের সংশোধন কল্পে। যা হোক, শুধুমাত্র পশ্চিমা সমাজেই নয় বরং বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল সমাজ এমনকি মুসলিম সমাজেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে গেছে তা'বিজ-কবচের নানারূপে। -*অনুবাদক*

কাহিনীকেই দায়ী করা যায়। প্রাচীন গ্রীসে ঘোড়াকে পবিত্র প্রাণীর মর্যাদা দেয়া হতো। ঘোড়ার খুরের নাল কোন বাড়ির দরজায় ঝুলিয়ে ভাবা হতো যে এটি ঐ বাড়িটির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। সৌভাগ্যকে ধরে রাখতে এ নালের খোলা দিক উপর মুখী করে রাখা হতো। নালের এ খোলা দিকটি যদি নীচু করে রাখা হয়, তাহলে সৌভাগ্য ঝরে পড়বে বলে মনে করা হতো।

কোন সৃষ্টি জীব বা বস্তু থেকে দুর্ভাগ্য ও বিপদ-আপদ এড়াতে যাদুমন্ত্রের ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা মূলত সৃষ্টের উপর সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী আরোপ করার নামান্তর। ফলে এ ধরণের বিশ্বাসের ধ্বজাধারীরা দাবী করে, আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাহ (কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা) তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, সেই দুর্ভাগ্য দূর করতে এ সব যাদুমন্ত্র সক্ষম যা তার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে -এ ধরণের বিশ্বাসের দ্বারা প্রকারান্তরে যাদুমন্ত্রকে আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশি শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান বলে মনে করা হয়। সুতরাং উপরোল্লিখিত ইবনে মাস'ঊদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ অনুসারে যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করা মানেই সুস্পষ্ট শির্কে লিপ্ত হওয়া। এ বিধানটি নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা আরো শক্তিশালী হয়। 'উত্ববাহ ইবনে 'আমির বর্ণনা করেন যে,

"দশজন লোকের একটি কাফেলা রাসূলের ﷺ নিকটে আনুগত্যের শপথের জন্য আসলে তিনি শুধু নয়জনের নিকট থেকে গ্রহণ করলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কেন আমাদের নয়জনের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন ও এর থেকে অঙ্গীকার কেন গ্রহণ করলেন না? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই তার সাথে মন্ত্রপূত কবচ আছে।' তৎক্ষণাৎ সে লোকটি তার জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কবচটি বের করে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তির শপথ গ্রহণ শেষে লোকজনের দিকে ফিরে বললেন, 'যে ব্যক্তি সূতা, তাগা, তা'বিজ-কবচ পরে, সে *শির্ক* করে!"[১]

কুরআনের তা'বিজ

ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু 'আব্বাস ও হুযায়ফা, উক্ববাহ বিন আমির এবং 'আব্দুল্লাহ বিন উকাইম জুহানীসহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্যান্য সকল সাহাবীরা কুরআনের আয়াত, হাদীছ বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে অথবা তা ফুঁক দিয়ে তা'বিজ-কবচ আকারে ব্যবহারের

---

[১] *তিরমিযি* ও *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত। আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, *সিলসিলাহ আল-আহাদীছ আছ-ছহীহাহ,* খণ্ড ১, পৃ. ২৬১, হাদীছ নং ৪৯২।

বিরোধী ছিলেন।[১] তাবেঈনদের[২] মধ্যে যদিও কিছু বিদ্বান এ ধরণের তা'বিজ-কবচ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এ মতের বিপক্ষে, যেমন- তাবিঈ বিদ্বান ইবরাহীম নাখঈ (রাহি.)ও অনুমতি দেন নি এবং ইমাম আহমাদ ও তাঁর সাথীদের অভিমতও এরূপ।[৩] যা হোক, মন্ত্রপূত তা'বিজ-কবচ ব্যবহারের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত হাদীসে কুরআনের তা'বিজ-কবচ ও যাদুমন্ত্রের তা'বিজ-কবচের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা বলা হয় নি। উপরন্তু, তা'বিজ ব্যবহার কোনক্রমেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীছে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনেককে ফুঁক দিয়েছেন। তবে এ ধরণের কোন প্রমাণ নেই যা দ্বারা জানা যায় যে, উদ্দেশ্য পূরণের আশায় রাসূল ﷺ নিজে কুরআনের আয়াত লিখে নিজের শরীরে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তা'বিজ লিখে ব্যবহার করেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন। রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদর্শিত যাদুমন্ত্র অকেজো করে দেয়া ও শয়তান তাড়ানোর পদ্ধতির সাথে কুরআনের আয়াতের তা'বিজ-কবচ শরীরে রাখার বিষয়টি পরস্পর বিরোধী ঘটনা বলেই দৃষ্টমান হয়।[4] শয়তানের আগমন ঘটলে সুন্নাহ অনুযায়ী কুরআনের কয়েকটি সূরা (১১৩ নং এবং ১১৪ নং) ও আয়াত (যেমন, আয়াতুল কুরসি, ২:২২৫) তিলাওয়াত করা।[৫] কুরআন তিলাওয়াত ও

---

[1] *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, 'চিকিৎসা অধ্যায়, ৫/৩৫, আছার নং ২৩৪৬৪-৫; ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ৩/৮১; মুসনাদ আহমাদ, ৪/৩১০; জামে' তিরমিযী তুহফাতুল আহওয়াযী সহ 'চিকিৎসা' অধ্যায়, ৬/২৩৮, হা/২১৫২।*

[2] তাবিঈন সাধারণত তাদেরকেই বলা হয় যারা ঈমান সহকারে তথা মুসসলমান অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে অর্থাৎ মুসলমান অবস্থায় (ইসলামের উপর) মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে তাবিঈ হতে হলে তাকে অবশ্যই কোন সাহাবীর ছাত্র হতে হবে অর্থাৎ তাঁর নিকটে লেখাপড়া করতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই (ছাত্র বলতে সাধারণত তাই বুঝায়)। (দেখুন, মিন আতইয়াবিল মানহি ফি ইলমিল মুসতালাহ, মদীনা ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪৮।)

[3] *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, 'চিকিৎসা অধ্যায়, ৫/৩৫, আছার নং ২৩৪৬২, ৩৩৪৬৯; আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ২/৪৫৯;* যাহাবী, *আত্ব-ত্বিব্বুন নাবাবী,* পৃ. ১৮৯; *তায়সীরুল আযীযিল হামীদ,* পৃ. ১৬৮; বিস্তারিত দ্রঃ ড. ফাহাদ বিন যুইয়ান বিন আওয়ায সুহায়মী, *আহকামুল রুক্বা ওয়াত তামাইম,* পৃ. ২৪৩-৪৪।

[4] তাছাড়া, রাসূল ﷺ যে বস্তুর ব্যবহারকে শির্ক বলে অভিহিত করেছেন, সেখানে কুরআনের আয়াত স্থাপন করার প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ, সিজদা করা মহা পুণ্যময় কাজ হলেও ক্ববরস্থানে সিজদা করা মহা পাপের কাজ। উপরন্তু কুরআনের আয়াত তা'বিযে ভরে ব্যবহারের মাধ্যমে কুরআন কারীমকে অসম্মান করা হয়। প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি অপবিত্র দূর করার স্থানে ঐ সকল তা'বিজ-কবচ নিয়ে যাওয়া হয়, অথচ এসব স্থানে তা নিয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। -*অনুবাদক*

[৫] আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত এবং ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), পৃ. ৪৯১, হাদীছ নং ৫৩০।

বাস্তবায়নই হচ্ছে কুরআন থেকে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত পদ্ধতি। রাসূল ﷺ বলেন,

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ তিলাওয়াত করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে। আমি বলছি না যে, 'আলিফ্-লাম-মিম' একটি বর্ণ; বরং 'আলিফ্' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি 'বর্ণ' ও 'মীম' একটি বর্ণ।"[১]

---

[১] *আহমাদ* ও *আল-হাকীম* কর্তৃক সংগৃহীত। আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, *ছহীহ সুনান তিরমিযি,* খণ্ড ৩, পৃ. ৯, হাদীছ নং ২৩২৭; ৫ম খণ্ড, ১৭৫ পৃ., হাদীছ নং ২৯১০। কুরআন তিলাওয়াত বলতে মূলত কুরআন-হাদীছ বুঝে ও হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করা বুঝানো হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত বলতে অর্থ বুঝে এবং হৃদয়কে অর্থের সাথে একাত্ম করে দিয়ে তিলাওয়াত করাকেই বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ বলেন, *'যখন তাঁদের (মু'মিনদের) নিকট আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।'* (আনফাল: ২) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আয়াতের অর্থ যদি হৃদয়কে আলোড়িত না করতে পারে তাহলে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, *'আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণীকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারংবার আবৃত্তিগ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে এই গ্রন্থ থেকে (এই গ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবন করলে) তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। অতঃপর তাঁদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।'* [যুমার (৩৯): ২৩] কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে? মূলত কুরআন নাযিল করা হয়েছে অনুধ্যাবন করার জন্য, শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত মূলত তিলাওয়াত করে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। হৃদয়ঙ্গম করলেই নবুয়তের ইলম আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হবে। আল্লাহ্ বলেন, *'এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'* [সাদ (৩৮): ২৯] আরও চারস্থানে আল্লাহ্ বলেন, *'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার?'* [কামার (৫৪): ১৭, ২২, ৩২, ৪০] যারা কুরআন অনুধাবন করতে, বুঝতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে না তাদের বিষয়ে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, *'তারা কি কুরআনকে অনুধাবন করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'* [মুহাম্মাদ (৪৭): ২৪] এ বিষয়ে কুরআনে প্রায় ৫০টি আয়াত রয়েছে।

বিভিন্ন হাদীছে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী, ২/২০১; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১/৪৪২) প্রখ্যাত তাবিঈ আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যাঁরা আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন, 'তাঁরা যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই দশটি আয়াতের মধ্যে যা কিছু ইল্‌ম ও আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী দশ আয়াত শেখা শুরু করতেন না।' (মুসনাদ *আহমাদ,* ৫/৪১০; বায়হাকী, ৩/১১৯; ইবনু আবী শাইবা, ৬/১১৭; মাযমাউয, ৭/১৬৫। সনদ সহীহ) ইবনু মাসঊদ, উবাই ইবনু কা'ব, উসমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ

কুরআনকে তা'বিজের মধ্যে ভরে শরীরে রেখে দেয়া মূলত একজন অসুস্থ লোককে ডাক্তার কর্তৃক ব্যবস্থাপত্র দেয়ার মত। অসুস্থতা থেকে দূরে থাকার জন্য সে ব্যবস্থাপত্রটি পড়ে ওষুধ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে এটিকে বলের মত গোল করে থলিতে ভরে গলায় ঝুলায়।

যদি কোন ব্যক্তি এ বিশ্বাসে কুরআনের তা'বিজ-কবচ ব্যবহার করে যে, এটি শয়তান তাড়িয়ে সৌভাগ্য আনয়ন করবে; তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ইতোমধ্যে যা নির্দিষ্ট করেছেন তা বাতিল করার জন্য সৃষ্টির একটি অংশকে ক্ষমতা প্রদান করার

তাঁদেরকে দশ আয়াত শিক্ষা দিতেন। তাঁরা এই দশ আয়াতের মধ্যে যত প্রকার আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী আয়াত শিখতে শুরু করতেন না। এভাবে তিনি তাঁদেরকে কুরআন ও আমল একত্রে শিক্ষা দান করতেন। (তাফসীরে কুরতুবী, ১/৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) আট বৎসর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেছেন। উমার (রাঃ) বার বৎসর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেন। যেদিন তাঁর সূরা বাকারা শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেদিন তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া জানাতে একটি উট জবাই করে খাওয়ান। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, ২/৩৩১; তাফসীরে কুরতুবী, ১/৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, 'আমাদের যুগের মানুষেরা কুরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান অর্জন করতেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর কুরআনের কোন সূরা নাযিল হলে সে সময়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেই সূরার আহকাম, হালাল, হারাম, কোথায় থামতে হবে ইত্যাদি সবকিছু শিখে নিতেন। এরপর মানুষদের দেখছি, যাঁরা ঈমানের আগেই কুরআন শিখছে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না কুরআন তাকে কি নির্দেশ প্রদান করছে, কি থেকে নিষেধ করছে এবং কোথায় তাকে থামতে হবে। এরা কুরআনকে শুধু দ্রুত পড়ে যায় যেমন করে বাজে খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তেমনভাবে। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১৬৫; হাদীছটির সনদ সহীহ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবীগণ ও তাবিঈগণের যুগে বা ইসলামের শতাব্দীগুলোতে এভাবেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন মুসলিমগণ। যে সব অনারব দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে সে সব দেশের মানুষও কুরআন বুঝার মতো আরবী শিখে নিয়েছেন। আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করাকে কুরআনে 'তিলাওয়াত' বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ অনসরণ করা। এজন্য কুরআন শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। বুঝে পাঠ করে তা অনুসরণ করে চললেই তা তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, *'যাঁদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তাঁরা তা সত্যিকারভাবে তিলাওয়াত করে, তাঁরাই এ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।'* [বাক্বারা (২): ১২১] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সকল সাহাবী ও তাবিঈ মুফাসসির একমত যে, দু'টি গুণ থাকলেই সেই তিলাওয়াতকে 'সত্যিকারের তিলাওয়াত' বলা যাবে: (১). পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝে হৃদয়কে তার সাথে একাত্ম করে তিলাওয়াত করতে হবে। (২) পঠিত আয়াতের সকল বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ ও পালন করতে হবে। হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ ছাড়া কখনোই সত্যিকারের তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে না। (তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১/১৬৪-৬৫)

আমরা সাধারণত কুরআন না বুঝেই পাঠ করি। আমাদের উচিত আরবী ভাষা শেখা, তা সম্ভব না হলে অন্তত কুরআনের এক বা একাধিক বিশুদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ এবং তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ অনুধাবন করা। তৎসত্ত্বেও আশা করা যায় যে, না বুঝে কুরআন পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন এবং আমাদের না বুঝার অসহায়ত্ব বা আলসেমী তিনি করুণাবশত ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন। (বিস্তারিত দেখুন: *রাহে বেলায়াত*, পৃ. ১৬৭-১৮৭; *এহইয়াউস সুনান*, পৃ. ৩১৯-৩২৮) -*অনুবাদক*

নামান্তর হবে। পরিণামে, সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এ সকল তা'বিজ-কবচের উপর সোপর্দ হবে। আর এটাই যাদুমন্ত্রের শির্‌কের সারাংশ। এ বিষয়টি নিম্নবর্ণিত বর্ণনা দ্বারা আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়, তাবিঈ 'ঈসা ইবনু হামযা (আবী লাইলা) (রাহি.) বলেন,

"আমরা সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উকাইম আবূ মা'বাদ জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোন তা'বিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তা'বিজ ব্যবহার করব? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ওগুলো থেকে নিরাপদে রাখুন!' অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি কেউ দেহে (তা'বিজ জাতীয়) কোন কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তা'বিজের উপরেই ছেড়ে দেয়া হয়।[১]

কুরআনকে গলার লকেটের মধ্যে পরার জন্য এমন ক্ষুদ্র করে ছাপানো যা খালি চোখে পড়া যায় না তা শুধু শির্‌ককেই আহ্বান করে। একইভাবে অতিক্ষুদ্রকায় ও কার্যত পাঠের অযোগ্য ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত আয়াতুল কুরসি গহনা হিসেবে ব্যবহার করাও শির্‌কের প্রতি অনুপ্রেরণা জ্ঞাপন বৈ কিছু নয়। তবে যারা শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এ গহনা পরে তারা এ ক্ষেত্রে শির্‌ক করে না। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পরে বিধায় তারা তাওহীদের (ইসলামি মূল নীতির) বিপরীত শির্‌কে নিমজ্জিত হয়।

কুরআনকে সৌভাগ্য আনয়ন ও দুর্ভাগ্য দূরীকরণের উপায় হিসেবে কোন অবৈধ পদ্ধতিতে কুরআনের অপব্যবহার কিংবা সুন্নাত বহির্ভূত পন্থায় ব্যবহার মুসলিমদেরকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে হবে। অমুসলিমরা যেভাবে বিভিন্ন প্রকার তা'বিজ, ও মন্ত্রপূত কবচ ব্যবহারের মাধ্যমে শির্‌কের দরজা খুলে দেয়, সেভাবে গাড়িতে, চাবির চেইনে, হাতের বালা ও তা'বিজের মধ্যে ভরে কুরআনকে ঝুলিয়ে শির্‌কের দরজা উন্মুক্ত না করাই শ্রেয়। সুতরাং যে সব কারণে নির্ভেজাল তাওহীদের স্বচ্ছ ধারণা কলুষিত হয়ে যায়, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেতনভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে।

---

[1] ইবনে মাস'উদ কর্তৃক বর্ণিত। আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ৪/৩১০; তিরমিযি, *আস-সুনান,* ৪/৪০৩; আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* ৩/৩০০ ও আল-হাকীম কর্তৃক সংগৃহীত। হাদীছটি হাছান। আল-আরনা'উত, *শারহ আস-সুন্নাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮), খণ্ড ১২, পৃ. ১৬০-৬১, পাদটীকা নং ৫।

শুভ-অশুভ আলামত

পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে প্রাক-ইসলামি যুগে বসবাসকারী আরব দেশের লোকেরা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের আলামত বলে গণ্য করত এবং তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সব আলামতকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শুভ বা অশুভ আলামত নির্ধারণের চর্চাকে আরবীতে *তিয়ারা*[1] (উড়াল দেয়া) বলা হতো। যেমন, কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলে যদি একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বামে চলে যেত, তাহলে সে ভাবত যে তার দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী; ফলে সে পুনরায় ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এ ধরণের সকল কুপ্রথাকে বাতিল করেছে, কারণ এগুলো তাওহীদ আল-'ইবাদাত ও তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত এর ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেয়।

১. 'নির্ভরশীলতা' (তাওয়াক্কুল) নামক 'ইবাদাতকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে।

২. আসন্ন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করার ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির উপরে আরোপ করে।

রাসূলের ﷺ নাতি আল-হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করেই *তিয়ারা*'র নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমাদের দলভুক্ত (আমার উম্মাত নয়) যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য বা গাইবী কথা বলে অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোন (সূতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিট দেয়।"[2]

এখানে 'আমাদের' বলতে ইসলামের জাতি তথা মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং *'শুভাশুভ নির্ণয়'* এমন ধরণের কাজ যা কাউকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়। মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রাসূল ﷺ *অশুভ আলামত*-এর প্রভাবকে বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

"রাসূল ﷺ-কে মু'আবিয়া বলেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা পাখির শুভ-অশুভ আলামতকে অনুসরণ করে।' রাসূল ﷺ প্রত্যুত্তরে

---

[1] এ শব্দটি *'তারা'* নামক ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত। শুভ-অশুভ আলামতের উপর সাধারণ বিশ্বাসই *'তিয়ারা'*।

[2] তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১১৭। হাদীছটি সহীহ।

বললেন, 'এ সবই তোমাদের নিজেদের তৈরি, অতএব এগুলো যেন তোমাদেরকে না থামিয়ে দেয়।'[১]

অর্থাৎ এ শুভ-অশুভ আলামতগুলো যেহেতু মানুষের কল্পিত ও বানানো তথা অবাস্তব ধারণা, অতএব তোমরা যা করতে চাও তা করতে এটা যেন বাধা প্রদান না করে। এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহামান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা পাখিদের গতিপথকে কোনকিছুর আলামত হিসেবে তৈরি করেন নি। এমনকি, পাখির উড্ডয়নের ফলেই ঘটনা সংঘটিত হয় -এ প্রাক-ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে কোন ঘটনার কিছু মিল বাহ্যিকভাবে দৃষ্টমান হলেও এদের উড্ডয়নের গতিপথের কারণে কোন প্রকার সফলতা বা দুর্দশার সৃষ্টি হয় না।

পাখির আলামতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) নিজেদের এবং তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে যখনই কেউ ইতিবাচক বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করেছেন, তৎক্ষণাৎই তা কঠোরভাবে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে। যেমন, ইকরামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'একদিন আমরা যখন ইবনে 'আব্বাসের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাথে বসেছিলাম তখন একটি পাখি উগ্র শব্দ করতে করতে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল। এ সময় দলের মধ্যে থেকে একজন অকস্মাৎ চিৎকার করে বলল, 'শুভ! শুভ!'। ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন, এটাতে শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই।"[২] একইভাবে, তাবিঈরাও (সাহাবীদের অনুসারী বা ছাত্রগণ) তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম ছাত্রগণ তথা তাঁদের নিজেদের কর্তৃক প্রকাশিত (কথায়, লেখায় ও আচরণে) শুভাশুভ সংক্রান্ত সকল ধরণের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাউছ যখন তাঁর এক বন্ধুর সাথে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন তখন একটি কাঁক উগ্র চিৎকার করে উড়ে গেলে তাঁর বন্ধু বলল, শুভ! তাউছ প্রত্যুত্তরে বলেন, এটার মধ্যে তুমি কী শুভ দেখলে? তুমি আর আমার সাথে ভ্রমণ করো না।"[৩]

ছহীহ্ আল-বুখারীতে[৪] বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীছকে তাঁর অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে সমন্বয় না করে পৃথকভাবে উল্লেখ করলে এ হাদীছটির অর্থ স্ববিরোধী বলেই দৃষ্টমান হয়:

---

[১] ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীছ নং ৫৫৩২।

[২] *তাইসীর আল- 'আযীয আল-হামীদ,* পৃ. ৪২৮।

[৩] তদেব।

[৪] ইমাম ***বুখারী*** কর্তৃক সংগৃহীত হাদীছ হল হাদীছের (রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি) সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংগ্রহ।

"নারী, পশুর পিঠে চড়া হয় এমন পশু ও ঘরবাড়ি- এ তিনটি বস্তুতে নিশ্চয়ই অশুভ আলামত রয়েছে।"[১]

'আয়িশা উপরোক্ত হাদীছের বর্ণনাটির এ রকম ভাষ্যকে এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, "যিনি আবূল ক্বাসিমের[২] উপরে ফুরক্বান (কুরআন) নাযিল করেছেন তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি এ হাদীছের বর্ণনা করেছে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে। কারণ, আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, অজ্ঞ লোকেরা বলত যে, নারী, পশুর পিঠে চড়া হয় এমন পশু ও ঘরবাড়ি -এ তিনটি বস্তুতে নিশ্চয়ই অশুভ আলামত রয়েছে।' তারপর 'আয়েশা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا... ﴿٢٢﴾﴾ (سورةالحديد: ٢٢)

"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবত আসে না যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না।"

[সূরা আল-হাদীদ (৫৭):২২][৩]

এ হাদীছটি বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি হাদীছ এর ব্যাখ্যাস্বরূপ এসেছে যা একে বিশেষায়িত করে:

"অশুভ আলামত বলে কোন কিছুর যদি অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তা ঘোড়া, নারী ও বাসস্থানের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।"[৪]

এ সব অশুভ-আলামতের অস্তিত্ব যদি বাস্তবে বিদ্যমান থাকত, তাহলে রাসূল অবশ্যই সে সব ক্ষেত্রের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন যেখানে এগুলোর প্রভাব বেশি।[৫] মূলত তিনি অশুভ আলামতের অস্তিত্বকে সমর্থন ও অনুমোদন করেন নি। এ তিনটিকে বিশেষ করে উল্লেখ করার পিছনে বিজ্ঞতা এই যে,

---

[1] *বুখারী,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৪৭-৮, হাদীছ নং ৬৬৬। এ হাদীছে ভাষাগত কিছু কমবেশী রয়েছে যা এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা দূর হয়ে যায়।

[2] রাসূল -কে আদর করে ডাকা হতো আবূল ক্বাসিম। যা সাধারণত তাঁর স্ত্রীগণ কর্তৃক ডাকা হতো। এখানে শপথ মানে 'আল্লাহ্‌র নামের শপথ'।

[3] *আহমাদ,* আল-হাকীম এবং খুযাইমা কর্তৃক সংগৃহীত।

[4] *বুখারী,* (আরবী -ইংরেজি), পৃ. ৪৩৫, হাদীছ নং ৬৪৯; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৮, হাদীছ নং ৫৫২৮-৯; সুনান *আবূ দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৯, হাদীছ নং ৩৯১১।

[5] তা সত্ত্বেও বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূল খারাপ মহিলা, ঘোড়া (বাহন) ও ঘর ইত্যাদির বিভিন্ন আলামত বর্ণনা করেছেন। তবে, কুরআন ও হাদীছের আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিজস্ব বিবেচনায় কোন কিছুকে অশুভ আলামত বা সংকেত বলে নির্ধারণ ও বিশ্বাস করা এবং এর প্রেক্ষিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। -*অনুবাদক*

তৎকালীন সময়ে যেহেতু মানুষের জন্য এ তিনটি বস্তুই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই এগুলোর সাথে বারবার দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল বেশি। এ কারণে ঘোড়ার মালিকানা গ্রহণ, নারীর দায়িত্ব গ্রহণ বা গৃহে প্রবেশের সময়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বিশেষ এক প্রকার দু'আর বিধান দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে বিবাহ করলে অথবা কোন দাস ভাড়া করলে, এদের মাথার সম্মুখভাগের চুল ধরে সে যেন আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করে তাঁর নিকট কল্যাণ (রহমত) কামনা করে এবং বলেঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস-আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহা ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা 'আলাইহি।

(হে আল্লাহ্! তার প্রকৃতি হিসেবে যা আপনি তৈরি করেছেন আমি তা থেকে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ কামনা করছি। তাছাড়া আমি সে সব অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আপনি তার প্রকৃতির অংশ হিসেবে তৈরি করেছেন।)

কেউ কোন উট ক্রয় করলে, তার উচিত উটের কুঁজের উপরে হাত রেখে একই রকম দু'আ করা।[১]

তাছাড়াও গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত হাদীছে নাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি গৃহে প্রবেশ করে তাহলে তার এ দু'আটি পড়া উচিত:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আ'উযু বি কালিমা তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খলাক্ব।"

(আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[২]

বাহ্যিকভাবে নিম্নবর্ণিত হাদীছটিকে শুভাশুভ আলামত সমর্থিত বর্ণনা হিসেবে দৃষ্টমান হয়: ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ থেকে আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন যে, আলাহর রাসূলের নিকটে একদিন এক মহিলা আগমন করে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র

---

[১] 'আমর ইবনে শু'আইব কর্তৃক বর্ণিত এবং আবূ দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। সুনান আবী দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৫৭৯, হাদীছ নং ২১৫৫ এবং ইবনে মাজাহ।

[২] খাওলা বিনতে হাকীম কর্তৃক বর্ণিত এবং *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত। (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪২১, হাদীছ নং ৬৫২১।

রাসূল ﷺ! অঢেল সম্পদের অধিকারী অনেক লোকজন একটা বাড়িতে বসবাস করতেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে এবং একসময় ধনসম্পদও দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। তাহলে, আমরা কি এ বাড়িটাকে পরিত্যাগ করব? রাসূল ﷺ বললেন, 'বাড়িটিকে পরিত্যাগ কর, কারণ এ বাড়িটির উপরে আল্লাহ্‌র লা'নত রয়েছে।'[১]

রাসূল ﷺ তাদেরকে জানালেন যে, দুর্ভাগ্য ও একাকিত্বের কারণবশত ঐ জায়গাটি তাদের উপরে মানসিকভাবে বোঝা স্বরূপ হয়ে যাওয়ার ফলে বাড়িটিকে পরিত্যাগ করা কোনপ্রকার ***অশুভ আলামত*** নয়। এ ব্যাপারটি হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতা। কোন বস্তু থেকে মানুষ যখন ক্ষতির সম্মুখীন হয় বা কোন দুর্ভাগ্যে পতিত হয়, এমনকি ঐ বস্তুটি বাস্তবে কোন দুর্ভাগ্য আনয়ন না করলেও মানুষের মধ্যে ঐ বস্তুটি বা বিষয়টি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য যে, ঐ মহিলা যে অনুরোধ রাসূল ﷺ-কে জানিয়েছিল তা দুর্ভাগ্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পূর্বের ঘটনা নয়, বরং এটা পরবর্তীকালের ঘটনা। কোন জায়গা বা মানুষের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পতিত হওয়ার পরে ঐসব জায়গা বা মানুষকে আল্লাহ্‌র লা'নতপ্রাপ্ত হিসেবে উল্লেখ করা বৈধ, এখানে দোষের কিছু নেই। এখানে আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের দ্বারা সংঘটিত অসৎ কর্মের দরুন আল্লাহ্‌র শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। একইভাবে, সৌভাগ্য ও সফলতা আনয়নকারী প্রতিটি বস্তু বা বিষয়কে ভালবাসার প্রবণতা মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল। স্বয়ং এ ধরণের প্রবণতা বা অনুভূতি ***অশুভ আলামত*** নয়, তবে এ রকম মানবীয় অনুভূতি যদি ঐ ধরণের কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের উৎস বা চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য করার বিশ্বাসে পরিণত হয় তাহলে তা তিয়ারা বা শির্ক হবে। কোন ব্যক্তি যখন এমন সব স্থান বা বস্তুকে এড়ানোর প্রচেষ্টা চালায় যার কারণে অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বিপদে বা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল; অথবা যে সব স্থান বা বস্তুর অন্বেষণ করে যার কারণে কোন বিশেষ ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল- তখন সে ব্যক্তির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সে শির্কের দিকে ধাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে সে ঐসব নির্দিষ্ট স্থান ও বস্তুসমূহকে সৌভাগ্য বা

---

[১] আবূ দাঊদ কর্তৃক সংগৃহীত, সুনান আবী দাঊদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৯-১১০০, হাদীছ নং ৩৯১৩; মালিক, মুহাম্মাদ রহীমুদ্দিন, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, (ইংরেজি অনুবাদ), (লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ, ১৯৮০), পৃ. ৪১৩, হাদীছ নং ১৭৫৮।

দুর্ভাগ্যের প্রতীক বা আলামত হিসেবে ধারণা করতে থাকে এবং এমনকি ঐ সকল স্থান ও বস্তুকে কেন্দ্র করে কিছু উপাসনার কাজও সম্পন্ন করতে অগ্রসর হয়।

ফা'ল (শুভ আলামত)

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদিও 'সংক্রমণ'[১] বা 'অশুভ আলামত' বলে কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান নেই; ওটার উত্তম হল ফা'ল। তারপর সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফা'ল কী?' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, একটি সৎ বা উত্তম কথা, যা তোমাদের কেউ শুনে।[২]

কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ আলামত উপস্থিতির স্বীকৃতি মূলত আল্লাহ্ সম্পর্কে কু-ধারণা ও শির্ক সংশ্লিষ্ট ধারণার বিদ্যমানতার সূচনা করে। শুভ আলামত পছন্দের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি আনুগত্য করার প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, যদি কেউ শুভ সংকেত বাহী শব্দকে আসমানী ক্ষমতা সম্পন্ন বলে মনে করে তাহলে তা শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে। ফা'ল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিস্মিত করেছিল। তবে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের জন্য ইসলামী বিধানানুযায়ী গ্রহণীয় ফা'লের সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করেছেন। এটা হচ্ছে আশাপূর্ণ পরিভাষার ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ ব্যক্তিকে *'সালিম'* (সুস্থ) অথবা যে ব্যক্তি কোন কিছু হারিয়েছে তাকে *'ওয়াজিদ'* (খোঁজারু) বলে ডাকা। এ ধরণের শব্দসমূহ ও অনুরূপ পরিভাষার ব্যবহার দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বা ভাগ্যপীড়িতদের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার ক'রে কল্যাণময় অনুভূতি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ঈমানদারদেরকে সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি আশাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা আবশ্যক।[৩]

---

[১] আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত এবং ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত অন্য একটি হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংক্রমণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। এক বেদুইন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! বনে স্বাস্থ্যবান উটের পালে মধ্যে যখন কোন রোগগ্রস্ত উটকে আনা হয়, তখন সবগুলো উটই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাহলে, আপনি এ ব্যাপারটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, ব্যাপারটা যদি সংক্রমণ ঘটিতই হয়, তাহলে প্রথম উটটিকে অসুস্থ করলো কে? [***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪১১-২, হাদীছ নং ৬১২ এবং ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৬, হাদীছ নং ৫৫০৭; আরও দেখুন, আবী দাঊদ, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ৩৯০৭।] প্রাক-ইসলামী বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করা সেই সকল সংক্রমণকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করেন, যা আল্লাহ্র অংশীবাদের সমতুল্য বলে গণ্য।

[২] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৭, হাদীছ নং ৪৩৬, ৬৫১; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৮, হাদীছ নং ৫৫১৯। আরও দেখুন, *সুনান আবী দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৮, হাদীছ নং ৩৯০৬।

[৩] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* পৃ. ৪৩৪-৪৩৫। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল কোন বস্তু, শব্দ বা সংকেতকে পছন্দ করা মানুষের মানবীয় স্বভাব। এটা দোষের কিছু নয়, তবে ভালকে নিশ্চিতভাবে ভাল বা শুভ বলে জানতে হলে কিংবা তাতে বিশ্বাস বা পছন্দ করতে হলে শরী'য়তের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। যেমন,

শুভাশুভ আলামত সম্পর্কে ইসলামের বিধান

পূর্বোক্ত হাদীছগুলোর মাধ্যমে এ বিষয়টি আমাদের নিকটে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শুভ-অশুভ আলামতের উপর সাধারণ বিশ্বাসই *'তিয়ারা'*। পাখির গতিবিধি পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করার নীতি সুন্নাহ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে আরবের জনগণ যেখানে পাখির গতিবিধি হতে শুভ-অশুভ আলামত গ্রহণ করেছে, সেখানে অন্যান্য জাতি এটা গ্রহণ করেছে ভিন্ন ধরণের উৎসমূল হতে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে তারা সকলে অভিন্ন মূলনীতির অনুসারী। এ শুভ-অশুভ আলামতের উৎসমূলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শির্‌কই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নিম্নবর্ণিত শুভ-অশুভ আলামতগুলো বর্তমান পশ্চিমা সমাজে[1] ব্যাপকভাবে প্রচলিত অসংখ্য শুভ-অশুভ আলামত থেকে হাতেগোনা কয়েকটি।

কাঠে টোকা দেওয়া :

কোন ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যখন সে চায় যে তার সৌভাগ্য যেন পরিবর্তন না হয়, তখন সে বলে 'কাঠে টোকা দাও' এবং এ সময় সে তার চতুর্দিকে খুঁজে দেখে কোন কাঠ পাওয়া যায় কি না যেখানে সে টোকা দিতে পারে। এ বিশ্বাসের উৎস বের করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সুদূর

শরী'য়ত কর্তৃক যদি কোন কিছুর ভাল-মন্দ, শুভ ও অশুভ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন 'আলামত' বা 'সংকেত' বর্ণিত থাকে তাহলে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে। -*অনুবাদক*

[1] আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রাম ও শহর তথা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শির্ক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শির্ক রয়েছে যা এ সব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে, সে সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. **শুভ আলামতঃ** কোথাও যাওয়ার সময় পেছন থেকে ডাকা, টিকটিকি ডাকা, পায়ে হোঁচট খাওয়া ইত্যাদি অশুভ আলামত বলে যাত্রা বিরতি দেয়া হয়।

২. **ভাদ্র মাসঃ** নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না। কারন নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর দেখা অকল্যাণকর।

৩. **নব জাতকের জন্যঃ** নব জাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরণের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জ্বিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে।

৪. **শনিবার বা মঙ্গলবারঃ** শনিবার বা মঙ্গলবারে দূর কোথাও যাত্রা না করা বা কোন বিশেষ কাজ শুরু না করা।

৫. **সংখ্যাঃ** কোন সংখ্যা যেমন- ৭ (সাত)/৮ (আট)/২৩ (তেইশ্) ইত্যাদি সংখ্যাকে শুভ বা অশুভ বলে বিশ্বাস করা। -*অনুবাদক*

অতীতে, যখন ইউরোপের জনগণ বিশ্বাস করত যে দেবতারা সাধারণত গাছের মধ্যে বাস করে। গাছে বসবাসকারী দেবতার নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ লাভ করতে তারা গাছ স্পর্শ করত। তাদের এ প্রার্থনা যদি গৃহীত হতো, তাহলে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তারা পুনরায় গাছ স্পর্শ করত।

লবণ পড়া :

লবণ পড়ে গেলে বেশিরভাগ মানুষ ভাবে যে তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বা অশুভ কিছুর আগমন অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা সেই পড়ে যাওয়া লবণকে বাম কাঁধের উপরে নিক্ষেপ করে দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। লবণ যেহেতু কোন কিছুকে তাজা রাখতে পারে, অনুরূপভাবে এটি দুর্ভাগ্য প্রতিহত করে তাদেরকে রক্ষা করবে বলে ধারণা করা হয়। লবণের আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক কার্যকারিতা শক্তির কারণে প্রাচীনকালের মানুষেরা এ বিশ্বাস করত। এভাবে লবন পড়ে যাওয়াকে কোন অশুভ আলামতের অশনি সংকেত হিসেবে ধরা হয়। আবার যেহেতু তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, শয়তানী আত্মা বা অশুভ শক্তি মানুষের বামপার্শ্বে অবস্থান করে; তাই পড়ে যাওয়া লবণ বাম কাঁধে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়।

আয়না ভেঙ্গে যাওয়া :

অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে, হঠাৎ করে একটি আয়না ভেঙ্গে যাওয়া সাত বছরের জন্য দুর্ভাগ্য আগমনের আলামত। প্রাচীনকালের মানুষেরা মনে করত যে, পানির উপরে কোন ব্যক্তির আত্মার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। ফলে, কেউ পানিতে ঢিল ছুঁড়লে বা অন্য কোনভাবে যদি তাদের আত্মার প্রতিবিম্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে আত্মাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আয়না আবিষ্কারের পর থেকে এ বিশ্বাস আয়নাতে স্থানান্তরিত হয়।

কালো বিড়াল :

সামনে দিয়ে কোন কালো বিড়াল অতিক্রম করাকে দুর্ভাগ্য আগমনের পূর্বআলামত হিসেবে অনেকেই গণ্য করে থাকে। এ বিশ্বাসটির উৎপত্তি হয় মধ্যযুগে। তখনকার যুগে কালো বিড়ালকে লোকজন ডাইনীদের প্রাণী বলে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত যে, কালো বিড়ালের মাথার মগজের সঙ্গে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকামাকড়ের শরীরের অংশের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ডাইনীরা যাদুর পাঁচন তৈরি

করে। যাদুর পাঁচনের সংস্পর্শ ব্যতীত কোন বিড়াল সাত বছর বেঁচে থাকলে কালো বিড়ালটি ডাইনীতে রূপান্তরিত হতো বলে ধারণা করত।

তের নম্বর:

আমেরিকার লোকজন সংখ্যা ১৩-কে অশুভ বলে মনে করে। আর এ কারণেই অধিকাংশ বহুতল বিল্ডিংয়ের ১৩ তলাকে ১৪ তলা বলা হয়। কোন শুক্রবার ১৩ তারিখ হলে এ দিনটিকে যেহেতু বিশেষভাবে অশুভ মনে করা হয়, তাই অধিকাংশ লোক এই শুক্রবারে কোথাও ভ্রমণ করা বা কারো সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকে। আবার এই শুক্রবারে ক্ষতিকর কোনকিছু ঘটলে তৎক্ষণাৎ তারা শুধু এ দিনটিকেই দায়ী করে থাকে। যদি কেউ মনে করে যে, এ কুসংস্কারটি শুধু সাধারণ জনগণের মধ্যেই প্রচলিত তাহলে সে ভুল করবে। কারণ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭০ সালে এ্যাপোলো চন্দ্র অভিযান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পৃথিবীতে অবতরণের পর নভোযানটির ফ্লাইট কমান্ডার বলেন, তার এ বিষয়টি জানা ছিল যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, ১৩ তারিখ শুক্রবার ১৩.০০ ঘটিকায় (অর্থাৎ একটায়) আকাশে উড্ডয়ন করা হয়েছিল এবং ফ্লাইট নম্বরও ছিল এ্যাপোলো ১৩।[1]

বাইবেলে বর্ণিত যিশুর শেষ নৈশ ভোজের ঘটনা থেকেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটেছে। এ নৈশ ভোজে ১৩ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জুডাস নামক ব্যক্তিটি যিশুর সাথে প্রতারণা করেছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৩ তারিখের শুক্রবারকে অশুভ মনে করার পিছনে কমের পক্ষে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার কথা ছিল এ শুক্রবারেই। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ডাইনিরা সাধারণত শুক্রবারে তাদের আলোচনা সভায় মিলিত হতো।

এ সকল বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র ভাল (সৌভাগ্য) ও মন্দ (দুর্ভাগ্য) ভাগ্য ঘটানোর ক্ষমতাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝে বণ্টন করা হয়। দুর্ভাগ্য আগমনের আশংকা এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গেই নির্দিষ্ট না ক'রে এ ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে যুক্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে

---

[1] এ সম্পর্কে আরেকটি অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন: চীনের জাতীয় শুভ সংখ্যা হল ৮ (আট), তাই চীনে *'অলিম্পিক'* খেলা অনুষ্ঠান করার জন্য বছর হিসেবে তারা ২০০৮ সালকে বেছে নিয়েছিল এবং অবশেষে সেই খেলার উদ্বোধন হয় ২০০৮ সালের ৮ মাসের (August) ৮ তারিখ রাত ৮টা ৮ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময়ে।-*অনুবাদক*

পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার দাবীও করা হয়; অথচ তা একমাত্র আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ গুণের অধিকারী হওয়ার ঘোষণা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে ***'আলিম আল-গাইব বা অদৃশ্যের জ্ঞানী*** বলে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। কুরআনেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়টি প্রকাশ করতে বলেছেন যে, যদি তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন, তাহলে তিনি সকল প্রকার দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হতেন।[১]

অতএব, তাওহীদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শির্‌কের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইবনু মাস'ঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এ বিধানটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

'অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্‌ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্‌ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্‌ক।'[২]

এ সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু আল-'আস ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

"অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শির্‌ক করল।" সাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এর কাফফারা কী?" তিনি ﷺ বলেন, "এ কথা বলবেঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়া লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুক ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

(হে আল্লাহ্, আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনার দেয়া শুভাশুভত্ব ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"[৩]

---

[১] সূরা আল-আ'রাফ (৭) : ১৮৮

[২] তিরমিযি, ***আস-সুনান,*** ৪/১৬০; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ১৩/৪৯১; হাকীম, ***আল-মুসতাদরাক,*** ১/৬৪; আবূ দাউদ, ***আস-সুনান,*** ৪/১৭; ***আবূ দাউদ,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ৩/১০৯৬-১০৯৭; ইবনু মাজাহ, ***আস-সুনান,*** ২/১১৭০। ***তিরমিযী,*** ইবনু হিব্বান, হাকিম প্রমুখ হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩] ***আহমাদ,*** *২/২২০;* হাইসামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১০৫;* আলবানী, *সিলসিলাতুস সাহীহাহ, হাদীছ নং ১০৬৫; আত্ব-ত্ববারানী* । হাদীছটির সনদ সহীহ।

পূর্বোক্ত হাদীছ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, *তিয়ারা* কেবল পাখীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শুভ-অশুভ আলামতের অন্তর্ভুক্ত সকল বিশ্বাসের রূপই এর পর্যায়ে পড়ে। স্থান ও কালভেদে এ বিশ্বাসগুলো বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেও তার মূল ভিত্তি শির্ক।[১]

অতএব, সকল মুসলিমকে এ ধরণের বিশ্বাস হতে উদ্ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে পূর্বোক্ত দু'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। এ বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শির্কের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি, মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয় নি। এ ধরণের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শির্কের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। এভাবে, শয়তানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে ইসলাম সর্বদা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়।

---

[1] যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, ক্ষণ, বস্ত, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোন প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শির্ক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্, কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শির্ক আসগার বলে গণ্য হবে। (*ইসলামী 'আক্বীদা*, পৃ. ৩৮২-৩)

পঞ্চম অধ্যায়

ভাগ্য গণনা

মানুষের মধ্যে যে সব লোক অদৃশ্য ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে তাদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন- গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, যাদুকর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তি, জ্যোতিষী, হস্ত রেখা বিশারদ প্রভৃতি। এ সব ভবিষ্যৎ-বক্তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাবলী উপস্থাপন করার দাবী করে থাকে সে সব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছেঃ চায়ের পাতা পড়া, নানা প্রকার রেখা বা নকশা আঁকা, সংখ্যা লেখা, হাতের তালুর রেখা পড়া, রাশিচক্র খুঁটিয়ে দেখা, স্ফটিক বলের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করা, হাড় দিয়ে খটর খটর বা ঝনঝন করানো, লাঠি ছোঁড়া ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে যাদু ব্যতীত ভাগ্য গণনার নানাবিধ কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং যাদু সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আলোচনায় আসবে, ইংশাআল্লাহ্।

অদৃশ্য প্রকাশে ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হওয়ার দাবীদার জ্যোতিষীদেরকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. সে সব জ্যোতিষী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন সত্য জ্ঞান বা গুপ্ত রহস্য জানা নেই; বরং তারা তাদের খরিদ্দারদেরকে তাই বলে যা সাধারণত অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে থাকে। তারা প্রায় সময়ই অর্থহীন কিছু ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার মাধ্যমে পূর্বপরিকল্পিত সাধারণ অনুমান প্রকাশ করে থাকে। কখনো কখনো তাদের কিছু অনুমান অতি সাধারণতার জন্য সত্য হয়ে যায়। অতিসামান্য যে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে আত্মপ্রকাশ লাভ করে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সেগুলো মনে রাখার প্রবণতা দেখা যায়; কিন্তু যেগুলো

আদৌ সত্য বলে প্রকাশিত হয় না, তার বেশিরভাগই মানুষ খুব দ্রুত ভুলে যায়। আসলে প্রকৃত সত্য কথা এই যে, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পুনরায় মনে না পড়ে, তাহলে কিছু দিন পরে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেকই মানুষ অবচেতনভাবে ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি নতুন বৎসরের শুরুতে আসন্ন বছরে মানুষের জীবনে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন খ্যাতিমান জ্যোতিষীদের নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা উত্তর আমেরিকায় একটা সাধারণ প্রথার রূপ পরিগ্রহ করেছে।[1] ১৯৮০ সালে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যৎ-বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ২৪% সঠিক হয়েছিল!

২. যাদের সঙ্গে জিনের সখ্যতা ও যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ধরণের অপজ্ঞান রয়েছে, তারা এ দ্বিতীয় শ্রেণীর দলভুক্ত। এ দলটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ এরা শির্কের মত বৃহত্তর ও জঘন্যতম গুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কাজে জড়িতদের উপস্থাপিত তথ্যাবলী সাধারণত কিছুটা নির্ভুল হয়, যা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য বড় ধরণের ফিৎনার কারণ।

জিনের জগৎ

'জিন' (একবচন হচ্ছে 'জিন্নি') সম্পর্কে কুরআনে সম্পূর্ণ একটি সূরা 'সূরা আল-জিন (৭২ নং)' অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। ক্রিয়াপদ 'জান্না', 'ইয়াজুন্ন' হতে উৎপন্ন হওয়া 'জিন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের ভিত্তিতে তারা দাবী করে, জিন হচ্ছে 'চতুর ভিনদেশী' বা 'ভিন্ন জাতের প্রাণী'। আবার অনেকে এমনও দাবী করে বলে যে, জিন হচ্ছে স্বভাবে অগ্নিময় এমন ধরণের মানুষ যার মস্তিষ্কে অন্তরের উপস্থিতি নেই। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, এ পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানকারী আল্লাহ্‌র অপর এক সৃষ্টি হল জিনজাতি। মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা জিনজাতি সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্নতর উপাদানের সমষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা জিনজাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন:

---

[1] কেবল উত্তর আমেরিকাতেই নয় বরং বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বের প্রায় দেশের জ্যোতিষীরা নতুন বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে থাকে। -*অনুবাদক*

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾﴾ (سورة الحجر: ٢٦-٢٧)

"পচা কর্দমের ঠনঠনে গাড়া থেকে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এর পূর্বে আমি জ্বীনকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।"

[সূরা আল-হিজ্‌র (১৫): ২৬-২৭]

লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে তাদেরকে জিন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সিজদা করার হুকুম দানকালে ফিরিশতাদের মাঝে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইবলীস (শয়তান) জিন জগতের অন্তর্ভুক্ত। সিজদা করতে অস্বীকার করলে তাকে এ অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন:

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾﴾ (سورة الزمر: ٧٦)

"সে বলল- আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" [সূরা স-দ (৩৮): ৭৬]

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

'ফিরিশতাদেরকে নূর (আলো) হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনদেরকে করা হয়েছে আগুন হতে।'[1]

আল্লাহ্ আরও বলেন:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ... ﴿٥٠﴾﴾

(سورة الكهف: ٥٠)

"স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সাজদাহ কর।' তখন ইবলিশ ছাড়া তারা সবাই সাজদাহ করল। সে ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত...।" [সূরা আল-কাহফ (১৮): ৫০]

এ কারণে ইবলিসকে পদস্খলিত ফিরিশতা বা ফিরিশতা মনে করা ভুল।

জিনদের অস্তিত্বের ধরণ অনুযায়ী সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

[1] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৪০, হাদীছ নং ৭১৩৪।

'তিন শ্রেণীর জিন রয়েছেঃ এক প্রকার জিন সারাক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়ায়, দ্বিতীয় প্রকার জিনেরা সাপ ও কুকুর হিসেবে অস্তিত্বশীল, তৃতীয় প্রকার জিন পৃথিবী অভিমুখে অগ্রসরমান তথা পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং এরা এক জায়গায় বসবাস করা সত্ত্বেও এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে।[১]

জিনজাতির বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদেরকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ মুসলিম (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী) এবং কাফির (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী)। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জিনদের সম্পর্কে 'সূরা আল-জিন'-এ বলেনঃ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾﴾ (سورة الجن: ١-٤)

"বল, "আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেন নি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত।" [সূরা আল-জিন (৭২):১-৪]

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾﴾ (سورة الجن: ١٤-١٥)

"আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহর প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।"

[সূরা আল-জিন (৭২):১৪-১৫]

কাফির (অবিশ্বাসী) জিনদেরকে বিভিন্ন নামে আরবীতে ও বাংলাতে উল্লেখ করা হয়ঃ 'ইফরীত, শয়ত্বান, ক্বারীন, দৈত্য, পিশাচ, অপদেবতা, ভূত, পেত্নী, প্রেতাত্মা ইত্যাদি। এরা নানাভাবে মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যে কেউ তাদের প্রতি কর্ণপাত করে, সেই তাদের কর্মী হিসেবে মানবীয় শয়ত্বান রূপে পরিগণিত হয়।

---

[1] আত্ব-ত্বাবারী ও আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ... ﴿١١٢﴾﴾

(سورة الأنعام: ١١٢)

"এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি...।" [সূরা আল-জিন (৬):১১২]

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ক্বারীন (সঙ্গী) নামক একজন জিন রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। এটা এ জীবনে মানুষের পরীক্ষার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যতীত কিছুই না। এ জিনটি তাকে নিচু প্রকৃতির কামনা-বাসনার প্রতি অবিরত উৎসাহিত করে এবং সরল-সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর প্রচেষ্টায় রত থাকে। এ সম্পর্ককে রাসূল ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে,

"জিনদের মধ্যে হতে একজন করে সাথী তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, "এমনকি আপনারও, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, আমারও, কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এবং সে আনুগত্য স্বীকার করেছে, তাই সে আমাকে শুধু সৎকাজ করতে বলে।"[১]

নাবী সুলায়মান (عليه السلام)-কে নবুয়তের নিদর্শনস্বরূপ জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার মত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾﴾

(سورة النمل: ١٧)

"সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল, জিন্ন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হল।"

[সূরা আন্-নামাল (২৭): ১৭]

কিন্তু অন্য কাউকে এ ক্ষমতা দেয়া হয় নি। জিনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি কাউকে প্রদান করা হয় নি। তাছাড়া কেউ তা পারেও না। রাসূল ﷺ বলেন,

"প্রকৃতই আমার সলাত ভাঙ্গার জন্য গতরাতে জিনদের মধ্য হতে এক 'ইফরীত[২] থু থু নিক্ষেপ করেছিল। তবে তার উপরে বিজয়ী হতে আল্লাহ্ আমাকে

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৭২, হাদীছ নং ৬৭৫৭।

[২] খুব শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান শয়ত্বান জিন (E.W. Lane, *Arabic-English Lexicon,* (Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1984), Vol. 2, p. 2089)

সাহায্য করেছেন। সকালে তোমাদের সবাইকে দেখানোর জন্য আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চেয়েছিলাম। তারপর আমার ভাই সোলায়মানের দো'আ মনে পড়ল:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِيٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾﴾

(سورة ص: ٣٥)

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন রাজ্য দান কর যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় হবে না। তুমি হলে পরম দাতা...।" [সূরা স-দ (৩৮): ৩৫][১]

মানুষ জিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। কেননা, এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা কেবল নাবী সুলায়মান ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছিল। বাস্তবে, এমতাবস্থায় 'আছর বা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত অধিকাংশ সময় জিনদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধারণত ধর্মদ্রোহী ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে করা হয়।[২] এভাবে হাজির করা জিনেরা তাদের সাথীদেরকে পাপকাজে লিপ্ত হতে ও স্রষ্টায় অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের বা আল্লাহ্র সাথে শরীক করার মতো বৃহত্তম পাপকর্মে লিপ্ত করতে যত বেশি মানুষকে পারা যায় আকৃষ্ট করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

জিনদের সাথে গণকদের একবার যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জিন তার অনুসারী গণকদেরকে জানাতে পারে। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনার সংবাদ জিনেরা কিভাবে সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন, জিনেরা প্রথম আসমানের নিম্নাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাবলী সম্পর্কে ফিরিশতারা পরস্পর যে আলোচনা করে তা শুনতে সক্ষম। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে শ্রবণকৃত সংবাদগুলো তাদের সেই চুক্তিকৃত বন্ধুদের নিকটে পরিবেশন করে।[৩] মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে এ ধরণের অনেক

---

[১] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮, হাদীছ নং ৭৫; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৭৩, হাদীছ নং ১১০৪।

[২] আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স, *জিন সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যার রচনা,* (রিয়াদ: তাওহীদ পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ২১।

[৩] *বুখারী* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২১০; *মুসলিম* (ইংরেজি অনুবাদ), হাদীছ নং ৫৫৩৮।

ঘটনা সংঘটিত হতো এবং গণকরাও তথ্য প্রকাশে অনেকাংশে নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পাশাপাশি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে তাদের পূজা-অর্চনাও করা হতো।

রাসূল ﷺ-এর উপরে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আসমানের নীচের অংশে পাহারা দেবার জন্য ফিরিশতাদেরকে নিযুক্ত করা হল এবং বেশিরভাগ জিনকে উল্কা ও ধাবমান নক্ষত্র দিয়ে তাড়ানো হতো। এক জিন কর্তৃক বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾﴾

(سورة الجن: ٨-٩)

"আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে।" [সূরা আল-জিন (৭২): ৮-৯]

আল্লাহ্ আরও বলেন:

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾﴾

(سُوْرَةُ الحجر: ١٧-١٨)

"আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শায়ত্বন থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে।" [সূরা আল-হিজ্‌র (১৫): ১৭-১৮]

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন,

"রাসূল ﷺ এবং তাঁর একদল সাহাবী উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে আসমান থেকে ইলাহী সংবাদ শ্রবণে শয়ত্বানরা বাধাগ্রস্ত হল।[১] তাদের

---

[১] মূলত, এই দিন বা এ সময় থেকে শয়ত্বানদেরকে ইলাহী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান এবং তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা শুরু হয় নি। বরং তা এর আগে থেকেই শুরু করা হচ্ছিল। হয়তো শয়ত্বানরা এর কারণ এ ঘটনার মাধ্যমে এ সময়ে জানতে পেরেছে মাত্র। কারণ, এ সম্পর্কিত যে সব শব্দ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা অতীত নির্দেশক। *(দেখুন, ছহীহ বুখারী, (আরবী), ২য় খণ্ড, পৃ. নং ৭৩২) -অনুবাদক*

প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হল। তাই তারা ফিরে এল তাদের লোকজনের নিকটে। তাদের লোকেরা ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বলল। কেউ কেউ বলল, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে; ফলে তারা কারণ উদঘাটনে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কয়েকজন রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সলাতরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কুরআন পড়া শ্রবণ করল। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, নিশ্চয়ই এটাই তাদেরকে আসমানী সংবাদ শ্রবণ থেকে বাধা দান করেছে। যখন তারা তাদের লোকজনের নিকটে ফিরে গিয়ে বলল:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢﴾ (سورة الجن: ١-٢)

"আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না।" [সূরা আল-জিন (৭২):১-২][১]

রাসূল ﷺ কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বে জিনেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে তা আর পারে নি। এ কারণে, তারা তাদের সংবাদের সংগে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসূল ﷺ বলেন,

"জিনেরা সংবাদ পাঠাতেই থাকবে যতক্ষণ না এটা যাদুকর বা গণক পর্যন্ত পৌঁছায়। মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠানোর পূর্বেই একটি উল্কাপিণ্ড আঘাত করবে। আর উল্কাপিণ্ড দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই যদি সংবাদটি পাঠাতে সক্ষম হয়, তাহলে এর সঙ্গে একশ'টা মিথ্যা যোগ করে পাঠাবে।[২]

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরা কিছুই না। তারপর গণকদের কথা মাঝে মাঝে সত্য হওয়ার ব্যাপারে 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উল্লেখ করলেন। রাসূল ﷺ বললেন,

"এটা সত্য সংবাদের একটি অংশবিশেষ যা জিনেরা চুরি করে এবং এ তথ্যের সঙ্গে একশ'টি মিথ্যা যুক্ত করে তার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে।"[৩]

---

১ *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৫-৪১৬, হাদীছ নং ৪৪৩; *মুসলিম*, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ২৪৩-২৪৪, হাদীছ নং ৯০৮; *তিরমিযী* ও *আহমাদ*।

২ *বুখারী*, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ১৫০, হাদীছ নং ২৩২ এবং *তিরমিযী*।

৩ *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩৯, হাদীছ নং ৬৫৭; *মুসলিম*, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীছ ৫৫৩৫।

'উমার ইবনে আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন বসেছিলেন, এমন সময় এক সুদর্শন লোক[১] তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়, লোকটি এখনও প্রাক-ইসলামী বিশ্বাসের অনুসরণকারী অথবা সম্ভবত সে তাদের মধ্যে যে সব গণক রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লোকটিকে তাঁর নিকটে আনার জন্য আদেশ করলেন এবং তিনি তাঁর অনুমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটা উত্তর দিল, একজন মুসলিমকে আজ এমন এক অভিযোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা আমি আর কখনও দেখি নি। 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নিশ্চয়ই আমাকে এ ব্যাপারে জানানো তোমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তারপর লোকটি বলল, জাহেলি যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ-গণনাকারী ছিলাম। এ কথা শুনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বিষয়টি তোমার পরী (নারী জিন) তোমাকে বলেছে তা আমাকে বল। লোকটি তখন বলল, "আমি একদিন বাজারে থাকাবস্থায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার নিকটে আগমন করে বলল, 'অপমান হওয়ার পর হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি কি জিনদের দেখতে পাও নি? এবং তাদেরকে (জিনদেরকে) এমন অবস্থায় দেখতে পাও নি যে, তারা মাদী উট ও এদের পিঠে আরোহণকারীদের অনুসরণ করছে?"[২] উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্য'।[৩]

জিনদের সাথে যোগাযোগকারী মানুষকে অর্থাৎ জিনদের সাহায্যে যে সব ভবিষ্যৎবক্তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদেরকে জিনেরা অতিনিকট ভবিষ্যত সম্পর্কে জানাতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ভবিষ্যৎবক্তার নিকটে কেউ গমন করলে, উপস্থিত ব্যক্তিটি গণকের নিকটে আসার পূর্বে কী কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল তা গণকের জিন আগত ব্যক্তির সাথী জিনের (ক্বারীন)[৪] নিকট থেকে অবগত হয়। ফলে, আগত ব্যক্তিটি কী কী করবে বা কোথায় কোথায় যাবে তা জানাতে গণক সক্ষম হয়। আর এভাবেই, একজন প্রকৃত গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা আগন্তুক ব্যক্তির অতীত সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। সেই গণক সবিস্তারে বলতে সক্ষম হয়- আগন্তুকের পিতা-মাতার নাম, জন্মস্থান এবং ছোটবেলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। জিনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন সত্যিকারের ভবিষ্যৎবক্তার আলামত হচ্ছে যে, সে বিস্তারিতভাবে অতীতের বর্ণনা দিতে

[১] তার নাম হল, সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব।

[২] ফিরিশতাদের উপর আড়িপাতা থেকে জিনদেরকে বাধা প্রদান করা হলে, এ বাধা দানের কারণ উদঘাটনে তারা আরববাসীদেরকে অনুসরণ করা শুরু করেছিল।

[৩] *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৫, পৃ. ১৩১-১৩২, হাদীছ নং ২০৬।

[৪] যে জিন প্রতিটি মানুষের সাথে সর্বদা অবস্থান করে।

পারবে। কারণ, মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করা, গোপনীয় বিষয় বা ঘটনা, হারানো দ্রব্য, অদৃষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা জিনের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষমতার সত্যতা আমরা নাবী সুলায়মান ﷺ এবং সাবার রাণী বিলকিস সম্পর্কে কুরআনের বিবরণে দেখতে পাই। সুলায়মান ﷺ-কে রাণী বিলকিস দেখতে আসলে, রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে তিনি (সুলায়মান ﷺ) উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত মানুষ, জিনসহ অন্যান্যদের মধ্যেঃ

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾﴾ (سورة النمل: ٣٩)

"এক শক্তিধর জিন বলল– 'আপনি আপনার জায়গা থেকে উঠবার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব, এ কাজে আমি অবশ্যই ক্ষমতার অধিকারী ও আস্থাভাজন।" [সূরা আন্-নামাল (২৭): ৩৯]

ভবিষ্যৎ গণনা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

তাওহীদ বিরুদ্ধ শির্কী ও কুফরী বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভবিষ্যৎ গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যত গণনায় লিপ্তদেরকে এ নিষিদ্ধ চর্চা ত্যাগ করতে উপদেশ দান ছাড়াও ইসলাম তাদের সঙ্গে যে কোন ধরণের সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে।

গণকের নিকটে গমন করা

গণকের যে কোন ধরণের দর্শনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে নীতি নির্ধারণ করেছেন। হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সাফিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন,

'যদি কেউ কোন গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন ক'রে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সলাত কবুল করা হবে না।'[১]

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২১১, হাদীছ নং ৫৫৪০।

এ হাদীছে বর্ণিত শাস্তি শুধু গণকের নিকটে গমন করে কৌতুহল বশতঃ তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। এ নিষিদ্ধতা আরও সমর্থিত হয়েছে মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম আস-সালামী বর্ণিত হাদীছ দ্বারা। এ হাদীছে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা গণকের নিকটে যায়। রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন, তাদের কাছে যাবে না।"[১]

এ ধরণের কঠিন শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবল গণকের নিকট গমনের জন্য, কারণ ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এটাই প্রথম পর্যায়। যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গণকের নিকট গমন করে, আর গণকের কোন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যরূপে পরিগণিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে গণকের গোঁড়া সমর্থক ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি উৎসাহী বিশ্বাসীতে পরিণত হবে।

গণকের নিকটে গমন করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি উক্ত চল্লিশ দিনের বাধ্যতামূলক সলাত আদায় করতে বাধ্য, যদিও ঐ সালাতের জন্য সে কোন প্রকার পুরস্কার পাবে না। আর সে যদি সকল সলাত পরিত্যাগ করে, তাহলে তো সে আরও একটি গুরুতর গুনাহ করল। চুরিকৃত সম্পদের উপরে বা ভিতরে সলাত আদায় করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান অধিকাংশ ইসলামি ফিকাহবিদদের মতে একই। তারা সবাই এ মত পোষণ করেন যে, ফরয সলাত আদায় করলে সাধারণত তা দু'ধরণের ফলাফল বহন করে:

১. উক্ত ব্যক্তির উপর ঐ সলাত আদায়ের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকে না।

২. তার জন্য পুরস্কার অর্জিত হয়।

চুরিকৃত সম্পদের উপরে বা ভিতরে সলাত আদায় করলে সলাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি এজন্য কোন পুরস্কার পেতে পারে না।[২] এর ফলে, রাসূল (ﷺ) ফরয সলাত দু'বার আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

গণকের প্রতি বিশ্বাস

অদৃশ্য ও ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে গণক ওয়াকিবহাল এ বিশ্বাসে যদি কেউ গণকের নিকটে গমন করা কুফরী (অবিশ্বাসীদের) কাজ।

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২০৯, হাদীছ নং ৫৫৩২।

[২] আন-নববীর *'তাইসীর আল- 'আযীয আল-হামীদ,* পৃ. ৪০৭।

আবূ হুরায়রা এবং আল-হাছান উভয়ে বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ বলেন, "যদি কেউ কোন গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস ক'রে, তবে সে মুহাম্মাদের ﷺ উপর অবতীর্ণ দ্বীনের প্রতি কুফরী করল।"[১]

এ ধরণের বিশ্বাস দ্বারা অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র জ্ঞান রাখার মত গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়। ফলস্বরূপ তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাওহীদের এ ক্ষেত্রে শির্‌কের সূচনা হয়। অর্থাৎ কেউ কোন জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, পীর, ফকীর, সাধু, দরবেশ ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবীদারকে সত্যই 'গাইবী' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করলে শির্‌ক আকবার সংঘটিত হয়।

গণকদের লেখা বই, পত্র-পত্রিকা বা গবেষণা-পত্র পড়া এবং তাদের অনুষ্ঠান রেডিওতে শ্রবণ করা বা টিভিতে দেখা ইত্যাদির মধ্যে সাদৃশ্যতা বিরাজমান থাকায় এ সব কর্মকাণ্ড কুফরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত[২]; কারণ ভবিষ্যৎবক্তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার ও প্রসারে বিংশ শতাব্দিতে এ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, এমনকি রাসূলও না।

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ... ﴿٥٩﴾﴾ (سورة الأنعام: ٥٩)

"সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না...।" [সূরা আল-আন'আম (৬): ৫৯]

তারপর তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন:

﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ... ﴿١٨٨﴾﴾ (سورة الأعراف: ١٨٨)

---

[১] *আবূ দাঊদ* কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীছ নং ৩৮৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ২/৪২৯; বায়হাক্বী; আলবানী, *সাহীহুত তারগীব,* ৩/৯৭-৯৮।

[২] কেউ যদি গণকদের বিরোধিতা, মোকাবেলা তথা তাদের বিভ্রান্তিকে যথাযথভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এগুলোর কিছু পড়ে বা শোনে এবং সে নিজে যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না অর্থাৎ সে যদি খাঁটি তাওহীদে অটল বিশ্বাসী হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তা কুফ্‌রী বলে গণ্য হবে কি না- এ বিষয়ে সাল্‌ফে-সালেহীনদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, একমাত্র মোকাবেলা ও প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিতান্ত প্রয়োজনে ও প্রয়োজনানুপাতে তা পড়া বা জানা কুফরী বলে গণ্য হবে না, যদি সে নিজে খাঁটি তাওহীদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয় এবং তার এ যৎসামান্য জানা শোনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ। তবে এ উদ্দেশ্য ব্যতীত কৌতুহলবশত প্রশ্ন করা কঠিন পাপ ও শির্‌ক আসগর। -*অনুবাদক*

"বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি ফায়দা হাসিল করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না...।" [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৮৮]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴿٦٥﴾﴾

(سورة النمل: ٦٥)

"আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া...।" [সূরা আন্-নামাল (২৭): ৬৫]

অতএব, ভবিষ্যৎবক্তা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত নানা রকম পন্থা বা পদ্ধতিসমূহ মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। হস্তরেখা গণনা, ভাগ্য গণনার মাধ্যম আই চিং, সাফল্যের বিস্কুট বা কেক ও চায়ের পাতার পাশাপাশি রাশিচক্র ও 'Bio-rhythm' নামক কম্পিউটার প্রোগ্রাম- এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকজনের দাবী অনুযায়ী, এ সব উপায়সমূহ তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাতে পারে। যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র তিনিই অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾

(سورة لقمان: ٣٤)

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন্ জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।" [সূরা আল-লুকমান (৩১): ৩৪]

ফলে, মুসলিমদের অবশ্যই বই-পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির পাশাপাশি সে সব লোকদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যারা বিভিন্ন উপায়ে দাবী করে যে তারা ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

উদাহরণস্বরূপ, কোন মুসলিম আবহাওয়াবিদ কর্তৃক আগামীকালের বৃষ্টি, তুষারপাত বা আবহাওয়ার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে প্রচার করার সময় *'ইনশাআল্লাহ্'* (আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন) শব্দসমষ্টি যোগ করা উচিত। অনুরূপভাবে, কোন মুসলিম ডাক্তার যখন তার কোন রোগীকে জানায় যে, সে নয় মাসের মধ্যে অমুক দিনে একটি সন্তান প্রসব করবে- এ ক্ষেত্রেও *'ইনশাআল্লাহ্'* বলতে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ, এ ধরণের বর্ণনা শুধু ধারণাভিত্তিক পরিসংখ্যান বৈ আর কিছুই নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্যোতিষশাস্ত্র

নক্ষত্র ও গ্রহসংক্রান্ত গণনা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাকে পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতেরা সামগ্রিকভাবে *'তানযীম'* বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়টির উপর ইসলামী বিধানকে বিশেষভাবে কার্যকর করতে তারা *তানযীম*কে তিনটি ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

১. প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষীরা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সমগ্র বিশ্ব যেহেতু জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভাবে প্রভাবিত, তাই ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করা সম্ভব।[১]

যতদূর জানা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিত এ চর্চার উদ্ভব হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায়। গ্রীক সভ্যতার সময়কালে তা পূর্ণতা লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দিতে মেসোপটেমিয়ার জ্যোতিষীদের উদ্ভাবিত পুরাতন পদ্ধতিগুলো ভারতে ও চীনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তবে কেবল নক্ষত্রের মাধ্যমে ভবিষ্যত গণনার পদ্ধতির চর্চা চীনে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। মেসোপটেমিয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্রের মর্যাদা অনেক উঁচুস্তরে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের জ্যোতিষীরা আকাশে দৃশ্যমান নানা প্রতীকের বিশ্লেষণ করে রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ-অকল্যাণ সংক্রান্ত শুভাশুভ সংকেতের ঘোষণা প্রদান করত। 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হল ক্ষমতাবান দেবতা'- এ বিশ্বাস মেসোপটেমিয়ার মূল বিশ্বাস ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে নক্ষত্ররূপী দেবতারা গ্রীসে পরিচিতি লাভ করলে এগুলো গ্রীসের গ্রহসংক্রান্ত গণনার উৎসে পরিণত হয়। ভবিষ্যত নির্ধারণের বিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র শুধু গ্রীসের রাজকীয়

---

[1] *তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ,* ৪৪১ পৃ.।

প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা ধন-সম্পদশালীদের নাগালেও চলে যায়।[১]

ধর্ম, দর্শন এবং সমসাময়িক সমগ্র ইউরোপের পৌত্তলিকতার বিজ্ঞানের উপরে জ্যোতিষশাস্ত্র দুই সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছে। ইউরোপের 'Dante' এবং সেইন্ট 'Thomas Aquinant' উভয়ে পৃথকভাবে তাদের নিজস্ব দর্শনে জ্যোতিষশাস্ত্রের 'কার্যকারণ' মতবাদের প্রয়োগ করেন খ্রিষ্টীয় ১৩ শতাব্দিতে। ইব্রাহিম (আব্রাহাম) ﷺ-এর উম্মাত সাবীয়রাও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করত। এরা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে পূজা করত। তাছাড়া, এই সাবীয়রা গ্রহ-নক্ষত্র তথা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতীক ছবি ও মূর্তি তৈরি করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সেগুলোকে স্থাপন করত। তারা বিশ্বাস করত এগুলো জগত নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদাপদ দূরীভূত করে, দু'আ কবূল করে, প্রয়োজন পূরণ করে। তারা আরো বিশ্বাস করত এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ্ ও সৃষ্টি জগতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পৃথিবী পরিচালনার দায়-দায়িত্ব। তারা এও বিশ্বাস করতে যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আত্মা নেমে এসে এ মূর্তির মধ্যে অবস্থান করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে মানুষের চাহিদা পূরণ করে। এ সব বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে তারা সে সব গ্রহ-নক্ষত্র, ফিরিশতা প্রভৃতির মূর্তির নিকটে গমন করে প্রার্থনা করত।[২] *তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্*-কে সমূলে ধ্বংস করার কারণে এ সকল জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাকে শির্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদিকে সিজদাহ করা কিংবা ছবি, মূর্তি ও প্রতিমা ইত্যাদির নিকট প্রার্থনা করা *তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ্*-তে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যদি কেউ নক্ষত্রকে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ ইত্যাদির পূর্বাভাষ বা প্রতীক ও আলামত হিসেবে বিশ্বাস করে, তাহলে তা হবে *আল-আসমা ওয়াস সিফাত*-তে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। মূলত, এ শাস্ত্রের চর্চাকারীরা একইসাথে শির্ক ও কুফর চর্চায় লিপ্ত। কারণ, এ সব জ্যোতিষীরা সাধারণত ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু সম্পর্কে জানাতে সক্ষম বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র কিছু গুণাবলীতে গুণান্বিত বলে মিথ্যা দাবী করে এবং যে ভাল-মন্দ ভাগ্য আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্ট করে

---

[১] William D. Halsey (ed.), *Collier's Encyclopedia*, (USA: Crowell-Collier Educational Corporation, 1970) vol. 3, p. 103.

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪১ পৃ.।

রেখেছেন তা পরিবর্তন করার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে। জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে। উক্ত হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

'জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হচ্ছে যাদুবিদ্যার জ্ঞান লাভ করা। সুতরাং এভাবে কেউ যত জ্ঞান অর্জন করল, ততই তার গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকল।'[১]

২. দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষীদের দাবী এ রকম যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি এবং তাদের অবস্থানের ভিন্নতার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন।'[২] ব্যাবিলনের জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা ও চর্চাকারী মুসলিম জ্যোতিষীরা সাধারণত এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করত। জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার প্রচলন মুসলিম রাজ্যে রাজকীয়ভাবে শুরু হয় উমাইয়া খিলাফাতের শেষ প্রান্তে এবং আব্বাসীয় খিলাফাতের সূচনাকালে খলিফার আসনে আসীন শাসকদের মাধ্যমে। একজন জ্যোতিষী নিয়োগ করা হতো এজন্যে যে, সে খলিফাকে দৈনন্দিন বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণে পরামর্শ এবং আসন্ন বিপদ-আপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত মৌলিক বিষয়গুলোকে মুসলিম জনগণ যেহেতু কুফর বলে গণ্য করত, তাই মুসলিমদের মাঝে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করাকে তথাকথিত এ সব মুসলিম জ্যোতিষী ইসলামসম্মত বলে চালিয়ে দেয়ার নিমিত্তে একটা কৌশল প্রয়োগ করল। ফলে, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভিন্ন আলামত ও প্রতীক আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তি বলে প্রচার করা হল। যা হোক, জ্যোতিষশাস্ত্রের এ ধরণের চর্চাও হারাম এবং এর চর্চাকারীকে কাফির বলে গণ্য করা উচিত। কারণ, এ বিশ্বাস এবং মুশরিকদের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে এবং এদের বিভিন্ন অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ার দাবীদারেরা ভবিষ্যত জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে, অথচ ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তথাপি, পরবর্তীকালের

---

[১] আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১০৯৫ পৃ., হাদীছ নং ৩৯৮৬ এবং ইবনু মাজাহ।

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪২ পৃ.।

কিছু সুবিধাবাদী মুসলিম পণ্ডিত আসমানী বিধানের যথাযথ প্রয়োগ সাধনে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিষয়গুলো মুসলিমদের মাঝে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয় বিধায় মুসলিম পণ্ডিতেরা এ ধরণের জ্যোতিষশাস্ত্রেও চর্চাকে অনুমোদন করেন।

৩. তৃতীয় ও শেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে সব বিষয় যা নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থান ও এর গতিবিধির উপর ভিত্তি করা সম্পর্কিত। এর দ্বারা নাবিক বা মরুভূমির পথিকেরা তাদের দিক নির্ণয় এবং কৃষকেরা তাদের শস্য রোপনের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি করে থাকে।[১] জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কেবল এ রূপটিই অনুমোদনযোগ্য (হালাল)। কারণ, এটি হালাল হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

এ বিধানের মূল ভিত্তি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۝٩٧﴾

(سورة الأنعام: ٩٧)

"তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা সেগুলোর সাহায্যে জলে স্থলে অন্ধকারে পথের দিশা লাভ করতে পার।"

[সূরা আল-আন'আম (৬): ৯৭]

ক্বাতাদাহ[২] থেকে ***বুখারী*** বর্ণনা করেন:

'দিক সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে এবং শয়ত্বানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, নক্ষত্রমণ্ডলীকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যতিরেকে যদি অন্য কিছু প্রত্যাশা করা হয় এগুলোর নিকট থেকে, তাহলে এর দ্বারা বুঝা যায় যে তারা বড় ধরণের বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। ফলে, সে ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয়ে পড়ে, কল্যাণের সঙ্গে তার জীবনের সাক্ষাত মেলে না এবং সে তার নিজের উপর এমন সব বিষয়কে আরোপ করে যে সম্পর্কে সে অজ্ঞ। নিশ্চয়ই এ কাজ যারা সম্পাদন করে তারা আল্লাহ্র আদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তারা নক্ষত্র সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে। এ সব ব্যক্তি দাবী করে, এই এই নক্ষত্রের সময় বিয়ে করলে এটা ঘটবে,

---

[১] *তাইসীর আল- 'আযীয আল-হামীদ*, ৪৪৭-৪৪৮ পৃ.।

[২] আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত। (রাহিমাহুল্লাহ)

ওটা ঘটবে ইত্যাদি; এই এই নক্ষত্রের সময় কোন কাজ শুরু বা কোথাও যাত্রা বা ভ্রমণ করলে এটা-ওটার সম্মুখীন হবে ইত্যাদি। আমার জীবন অতিবাহিত হওয়ার সময়ে প্রতিটি নক্ষত্রের নীচে লাল, কাল, লম্বা, খাটো, কুৎসিত এবং সুদর্শন প্রাণীর জন্মলাভ হয়েছে। কিন্তু কোন নক্ষত্র, প্রাণী বা পাখি এরা কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জনের কৌশল শিক্ষা দিতেন, তাহলে আদম ﷺ-কেই শিক্ষা দিতেন। কারণ, তিনিই তাঁর নিজ হাত দ্বারা আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন, ফিরিশতাদেরকে দিয়ে তাকে সিজদা করিয়েছেন এবং তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।'

পূর্বে উল্লেখিত নক্ষত্র ব্যবহারের সীমারেখাকে ক্বাতাদাহ (রহ.) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মূলত সূরা আল-আন'আমের ৯৭ নং আয়াতের ভিত্তিতে। এ সীমারেখা সম্পর্কে নিচের আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছেঃ

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ... ﴿٥﴾﴾

(سورة الملك: ٥)

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি...।" [সূরা আল-মুল্‌ক (৬৭): ৫]

রাসূল ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৃথিবীতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনারত ফিরিশতাদের কথাবার্তা মাঝেমাঝে জিনেরা নিচের আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে আড়ি পেতে শ্রবণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে জ্যোতিষীদের অবগত করত। তিনি ﷺ আরও বলেন, অধিকাংশ সময় আড়িপাতা বন্ধে বেশিরভাগ জিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কক্ষচ্যুত নক্ষত্র (উল্কাপিণ্ড) ব্যবহার করেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী কিছু সত্যের সঙ্গে শত শত মিথ্যার সংমিশ্রণ বৈ কিছুই নয়।'[১] অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যে মানদণ্ড প্রদান করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বৈধ উপায়সমূহ ব্যতীত সকল প্রকার নক্ষত্র সংশ্লিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলিমের আবশ্যিক দায়িত্ব।

---

[১] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৭ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃ., হাদীছ নং ৬৫৭ এবং *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১২০৯ পৃ., হাদীছ নং ৫৫৩৫।

মুসলিম জ্যোতিষীর খোঁড়া যুক্তি

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিমরা তাদের এ চর্চাকে সমর্থন এবং এর বৈধতা প্রমাণের নিমিত্তে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-বুরূজকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে, 'রাশিচক্রের প্রতীক'-এর সূরা হিসেবে।[১] শুধু তাই নয়, এ সূরাটির প্রথম আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে 'রাশিচক্র প্রতীকের শপথ'। এটি নিশ্চয়ই *'বুরূজ'* শব্দের ভুল ও ভ্রান্ত অনুবাদ। শব্দটির সত্যিকার অর্থ হচ্ছে 'নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান'। 'রাশিচক্রের প্রতীক' নয়। নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝাতে প্রাচীন ব্যাবিলন এবং গ্রীকবাসীরা রাশিচক্রের প্রতীক হিসেবে কেবল কিছু প্রাণীর প্রতিরূপকে ব্যবহার করত। ফলে, নক্ষত্র পূজার পৌত্তলিক চর্চার সমর্থনে কোনক্রমেই এ সূরাকে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কল্পিত চিত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মহাশূন্যে নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তীকালে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে সমর্থন করতে খলিফাদের দরবারে সূরা *আন-নাহ্‌লের* নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যবহৃত হতো:

﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾﴾ (سورة النحل: ١٦)

"আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে।" [সূরা আন্-নাহল (১৬): ১৬]

মুসলিম জ্যোতিষীরা দাবী করে, 'এ আয়াতের অর্থ হল, নক্ষত্রমণ্ডলী অদৃশ্যকে প্রকাশ করার প্রতীক এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে ভবিষ্যত সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।'[২] যা হোক, *'তুরজুমান আল-কুরআন'* অর্থাৎ কুরআনের অর্থের অনুবাদক বলে ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ, এ আয়াতে উল্লেখিত 'প্রতীক' দ্বারা সূর্যালোকের 'পথচিহ্ন' বা 'বিশেষচিহ্ন' বুঝানো হয়েছে বলে ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ওগুলো কোনক্রমেই নক্ষত্রসম্বন্ধীয় নয়। তিনি আরও বলেন: *'তারকারাজির সাহায্যে তারা পথনির্দেশ লাভ করে।'* -এ শব্দসমষ্টির অর্থ হচ্ছে, সমুদ্র ও মরুভূমিতে রাত্রিকালে ভ্রমণাবস্থায় তারা

---

[১] আব্দুল্লাহ ইউসূফ 'আলী, *এওযব ঐড়ষু ছঁৎধহ,* (ইংরেজি অনুবাদ, বৈরুত: দার আল-কুরআন আল-কারীম), ১৭১৪ পৃ.।

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ১৪৪ পৃ.।

নক্ষত্রমণ্ডলীর মাধ্যমে পথনির্দেশ প্রাপ্ত হয়।[১] অন্যভাবে, এ আয়াতের অর্থ *সূরা আল-আন'আম*-এর ৯৮ নং আয়াতের অনুরূপ।

প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত অবাস্তব ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং এর প্রয়োগের সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। *'একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভবিষ্যতের জ্ঞান সংরক্ষণ করেন'*, এ বিষয়টি কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, অথচ উপরোক্ত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এ মহাসত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং এ সংক্রান্ত সকল অবাস্তব ও মিথ্যা বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ ও বিশ্বাস করতে সুস্পষ্টভাবে অনেক হাদীছে কঠোরভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও উক্ত ছহীহ হাদীছগুলোর বিরোধীরূপে দাঁড়িয়েছে তথাকথিত ভ্রান্ত তাফসীরটি।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্র রাসূলের ﷺ সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন,

'যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখার জ্ঞান অর্জন করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখার জ্ঞান লাভ করল।'[২]

আবু মাহযামও রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

'আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মাতের জন্য আমি যা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে আশংকা করি তা হলঃ তাদের বিচারকদের নীতিহীনতা, নক্ষত্রের উপরে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত ভাগ্যকে অস্বীকার করা।'[৩]

সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করা এবং এর চর্চা করার ভিত্তি ইসলামে নেই। যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত মতবাদকে নিজের স্বপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে বিকৃত করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে, সে-ই মূলত ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অনুসরণ করে। কারণ, ইহুদীরা স্বজ্ঞানে তাওরাতের বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ বিকৃত করেছে।[৪]

---

[১] ইবনু জারীর আত্ব-ত্ববারি তাঁর তাফসীর *'জামি' আল-বায়্যানা'ন তা'ভীল আল-কুরআন,* (মিশরঃ আল-হালাবি পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮), ১৪তম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

[২] আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১০৯৫ পৃ., হাদীছ নং ৩৯৮৬ এবং ইবনু মাজাহ।

[৩] ইবনু 'আসাকির কর্তৃক সংগৃহীত। আছ্-ছুয়ূতী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। (*তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ৪৪৫ পৃ.।)

[৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে *সূরা আন-নিসা,* ৪:৪৭, *সূরা আল-মায়িদা,* ৫:১৩ এবং ৫:৪১ দেখা যেতে পারে।

রাশিচক্র সম্পর্কে ইসলামের বিধান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা শুধু *হারামই* নয়, বরং জ্যোতিষীর নিকটে গমন করা, তার দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করা, এ সংক্রান্ত বইপত্র ক্রয় অথবা কারো ভাগ্য গণনা করাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ! জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এ শাস্ত্রের চর্চাকারীরা জ্যোতিষী বলে বিবেচিত হয়। ফলস্বরূপ, কোন ব্যক্তি ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে সে রাসূল ﷺ ঘোষিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়ঃ

"গণকের নিকটে কোন ব্যক্তি গমন করে যদি তাকে কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে ৪০ দিন ও ৪০ রাত পর্যন্ত তার সলাত কবূল হবে না।"[১]

গণকের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়ার পরেও কেউ তার নিকটে গমন করে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সেজন্য শাস্তির বিধান সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবার, জ্যোতিষসংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা বা মিথ্যার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ থাকলে, তাহলে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্যরাও অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বলে সন্দিহান হয়। এ ধরণের সন্দেহ পোষণ করাও এক প্রকার শির্‌ক। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ...﴾ (٥٩) (سورة المائدة: ٥٩)

"সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না...।" [সূরা আল-মায়িদা (৬): ৫৯]

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ...﴾ (٦٥)

(سورة النمل: ٦٥)

"বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না...।" [সূরা আন্-নামাল (২৭): ৬৫]

কোন জ্যোতিষী কর্তৃক প্রদানকৃত হোক অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বই-পত্রিকায় লিখিত হোক কেউ যদি তার জন্য প্রদত্ত রাশিচক্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এর উপর নির্ভর করে বা এ বিষয়ে শংকাগ্রস্ত হয়, তবে সে সরাসরি কুফরীতে লিপ্ত হল। কারণ, এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] হাফসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১২১১, হাদীছ নং ৫৫৪০।

"যে কেউ গণকের বা জ্যোতিষীর নিকটে গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদের ﷺ উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অবিশ্বাস করল।"[১]

এ হাদীছটিতে পূর্বে বর্ণিত হাদীছের মতো *গণক* শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, *গণক* ও *জ্যোতিষী*-এরা উভয়ই যেহেতু ভবিষ্যত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বলে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে, তাই উক্ত হাদীছদ্বয় জ্যোতিষীদের জন্য তো বটেই বরং ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবীদার সকল ব্যক্তির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাও সাধারণ গণকের মতো আল্লাহ্‌র তাওহীদকে অস্বীকার করে। জ্যোতিষীদের দাবী, নক্ষত্র দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপরে নক্ষত্রের বিশেষ প্রভাব রয়েছে এবং প্রত্যেকের জীবনে সংঘটিত বা সংঘটিতব্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নক্ষত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর সাধারণ গণকের দাবী এরূপ, কোন কাপের তলায় চায়ের পাতার গঠন অথবা হাতের তালুর রেখার মাধ্যমে অনুরূপ বিষয়াবলীর প্রকাশ ঘটে। মাধ্যম ব্যবহারের পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও উভয়ক্ষেত্রেই তারা সৃষ্ট বস্তুর বাহ্যিক গঠন-বিন্যাসের বিচিত্রতায় অদৃশ্য প্রকাশ করার দাবী করে থাকে।

ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষার সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস ও রাশিচক্র পরীক্ষা করার সুস্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে। এ সব পথ খুঁজে বেড়ানো আত্মা আদতে সেই শূন্য আত্মার মতো যা প্রকৃত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে নি। আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত ভাগ্য থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস বৈ এ সব পথ আর কিছু নয়। অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস এ রকম যে, আগামীকাল কী ঘটবে তা জানতে পারলে, আজকেই তার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সম্ভাব্য দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে কল্যাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। যা হোক, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ্ তা'আলা জানান:

﴿...وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝١٨٨﴾ (سورة الأعراف: ١٨٨)

"...আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি ফায়দা হাসিল করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। যারা ঈমান আনবে আমি সেই সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া অন্য কিছু নই।" [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৮৮]

---

[১] আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। *আহমাদ, আবূ দাউদ* কর্তৃক সংগৃহীত, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০৯৫, হাদীছ নং ৩৮৯৫ এবং বায়হাক্বী।

সে কারণেই সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার দাবীদারেরা এ সকল ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। অতএব, রাশিচক্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও, রাশিচক্রের চিহ্নবিশিষ্ট আংটি, গলার হার (চেইন) ইত্যাদি অলংকার বা অন্যান্য কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়। কুফর আগমনের সকল পথের শাখা-প্রশাখাকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে হবে, যাতে ভ্রান্ত পথসমূহের কোন আলামতের লেশ মাত্র না থাকে। একমাত্র আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিমের জন্য তার রাশিচক্রের প্রতীক সম্পর্কে অনুমান করা বা 'আমার রাশি কী?'- এ ধরণের প্রশ্ন করা কখনো উচিত হবে না। সংবাদপত্র বা পত্রিকা-সাময়িকীতে প্রকাশিত রাশিচক্রের কলাম পড়া বা কাউকে পড়তে শ্রবণ করা কোন নর-নারীর জন্য উচিত নয়। আর কোন ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে নির্ভরশীল হলে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে ইসলামের মূল বিশ্বাসের দিকে ফিরে এসে নিজের বিশ্বাসকে নবায়ন করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

যাদুমন্ত্র

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা বা অন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে অতি-প্রাকৃত মাধ্যম বা শক্তিসমূহের নিকট প্রার্থনা করে অথবা সেগুলোকে আহ্বান করে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করা অথবা প্রাকৃতিক শক্তির ভবিষ্যদৃষ্টিকে অর্জন করাকেই সাধারণত যাদু বলে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার, পদ্ধতি ও কর্মের ব্যবহার দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে- এ ধরণের বিশ্বাসকেও যাদু বলা হয়। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পাপাত্মা বা শয়তান অথবা দেবদূতের সহায়তা ব্যতীত অনুষ্ঠিত 'ঐন্দ্রজালিক বা কুহকময় বা অপ্রাকৃত অনুষ্ঠান', 'ভেলকিবাজি', 'ভানুমতীর খেল' বা 'প্রাকৃতিক যাদু' নামে পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বস্তুর অধ্যয়ন পাশ্চাত্য সমাজে বর্তমানে আধুনিক ভৌত বা প্রকৃতি বিজ্ঞান হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত বা বদ বা কুটিল উদ্দেশ্যে অলৌকিক শক্তি তথা পাপাত্মা বা শয়ত্বান বা দেবদূতকে আহ্বান করা বা সহায়তা গ্রহণ করা ও ব্যবহার করার প্রচেষ্টা হচ্ছে ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে 'অদৃশ্য যাদু' বা 'মায়াবিদ্যা', 'ইন্দ্রজাল', 'ডাইনিবিদ্য', 'ডাকিনীবিদ্যা'-এর পার্থক্যের মূল বিষয়। যাদু এবং এর চর্চাকারী ব্যক্তিদেরকে বুঝাতে সাধারণত ডাইনীবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রেতসিদ্ধি[১] নামক পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়। 'অপদেবতা', 'ভূত', 'দৈত্য' বা 'প্রেত'তাড়িত বা মন্ত্রচালিত নারীর যাদু চর্চাকে ডাইনীবিদ্যা বলা হতো। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতিক (অলৌকিক) দৃষ্টি অর্জনের প্রয়াসকে ভবিষ্যৎ-কথন বলা হয়। অন্যদিকে, প্রেতসিদ্ধি অথবা মৃতব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও ভবিষৎ-কথনের পদ্ধতিসমূহের একটি।

আরবী سِحْرٌ *(সিহর)* শব্দটি যেহেতু যাদুবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না, সুতরাং মায়াবিদ্যা, কুহক, ইন্দ্রজাল, ডাইনীবিদ্যা,

[১] মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভবিষ্যদ্বাণী করার তথাকথিত যাদু বা ডাইনীবিদ্যা।

ভবিষ্যৎ-কথন এবং প্রেতসিদ্ধিকে বুঝাতেও *'সিহর'* শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূলত, অদৃশ্য ও রহস্যময় শক্তি হতে ঘটা সবকিছুকে আরবীতে *সিহর* বলে বুঝানো হয়।[১] উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীছের কথা বলা যায়। হাদীছটিতে রাসূল ﷺ বলেন,

'নিশ্চয়ই, কিছু বক্তব্য হল যাদু।'[২]

একজন বাগ্মী ও প্রেরণাসঞ্চারকারী বক্তা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে উপস্থাপন করতে পারে। সে কারণেই বাগ্মীতার একাংশকে রাসূল ﷺ যাদু বলে অভিহিত করেছেন। শেষরাত্রের অন্ধকার যেহেতু তখনও অবশিষ্ট থাকে[৩] তাই সাওম পালন করার পূর্বে শেষ রাতের খাবারকে *সাহূর*[৪] (মূল *সিহ্র* হতে) বলা হয়।

যাদুর বাস্তবতা

যাদুর মধ্যে যে বাস্তবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে তা অস্বীকার করার প্রবণতা বর্তমানকালের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূর্ছারোগের মত মানসিক বিকারগ্রস্ততা যাদুর প্রভাবে হয় বলে জনপ্রিয় সব গল্পসমূহে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং এ কথাও বলা হয় যে, যারা যাদুতে বিশ্বাস করে তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।[৫] যাদুর দ্বারা সম্পন্ন কর্মকে অক্ষিবিভ্রম ও কিছু কৌশলের সমষ্টি নির্ভর ধোঁকা বৈ কিছু নয় বলে প্রচার করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যকে দূরীভূত করে সৌভাগ্য আনয়নে যাদু ও কবচের প্রভাবকে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও যাদুর কিছু অংশ ইসলাম বাস্তব বলে স্বীকার করে। তবে এ কথাটিও সত্য যে, আজকালকার যাদুর বেশিরভাগই জটিল কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তৈরি করা চমকপ্রদ যান্ত্রিক বস্তু যা প্রদর্শন করা হয় কেবল দর্শকদেরকে ধোঁকা দিতে। কিন্তু কিছু লোক রয়েছে যারা ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রে *শয়তান*দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাদুবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখে। *জিন* এবং জিনদের শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র প্রমাণের আলোকে যাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমর্থন

---

[১] *Arabic-English Lexicon*, ১ম খণ্ড, ১৩১৬-১৩১৭ পৃ.।

[২] *সহীহ আল-বুখারী*, (আরবী-ইংরেজি), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫, হাদীছ নং ৬৬২; *সুনান আবূ দাঊদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯৩, হাদীছ নং ৪৯৮৯।

[৩] *তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ*, পৃ. ৩৮২।

[৪] অথবা সূহর। দেখুন: *Arabic-English Lexicon*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১৭।

[৫] সূরা আল বাকারার ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আশআরী বিদ্বান ফখরুদ্দীন আর রাযী (মৃত্যু ১২১০ ঈসায়ী) এ ধরনের মন্তব্য করেন। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন এ মতবাদের পক্ষাবলম্বন করেন।

বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। মানুষের নিকটে প্রেরিত আসমানী বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড নিহিত বিধায় মূল বিধানের প্রতি প্রথম পদক্ষেপেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

যাদু সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠١﴾ (سورة البقرة: ١٠١)

"এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না।" [সূরা আল-বাক্বারা (২) : ১০১]

ইহুদীদের প্রতি প্রেরিত নাবীদের সঙ্গে তাদের কপটতার বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মিথ্যা সম্পর্কে আমাদের নিকটে বর্ণনা করছেন যা নাবী সুলায়মান ﷺ-এর ﷺ ব্যাপারে তারা উদ্ভাবন করেছিল:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝١٠٢﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শায়ত্বনরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শায়ত্বনরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফিরিশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফিরিশতাদ্বয় কাকেও শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা

আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হতো আর এদের কোন উপকার হতো না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি এ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত।"

[সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

'কাবালা' নামক একটি দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে চর্চা করা যাদুর সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে ইহুদীরা তাদের যাদুচর্চার পন্থাটি নাবী সুলায়মান ﷺ-এর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেছিল বলে দাবী করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ যে বর্ণনা দিয়েছেন তার 'মর্মার্থ' বা 'ব্যাখ্যা' বা 'সারাংশ' হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র কিতাবকে পিছনে ফেলে দিয়ে এবং শেষ নাবীকে অস্বীকার করে ইহুদীরা শয়ত্বানের শেখানো যাদুমন্ত্রের পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ব করে। এই শয়ত্বানেরা কুফরী কর্ম করেছে যাদু শিখিয়ে। তারা জ্যোতিষশাস্ত্র নামক মায়াবিদ্যার এক কৌশলও শিখিয়েছে। ব্যাবিলনের জনগণের নিকটে পরীক্ষাস্বরূপ প্রেরিত হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশতা তাদেরকে এ বিদ্যা শিক্ষাদান করেছিল। মায়াবিদ্যার কোন তত্ত্ব শিক্ষা দেবার পূর্বেই ফেরেশতারা জনগণকে এ বিদ্যা শিখে কুফরী কর্ম সম্পন্ন না করতে সতর্ক করত, কিন্তু ফিরিশতাদের সতর্কবাণীর প্রতি তারা কোনই কর্ণপাত করেনি। মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে ফিরিশতাদের নিকট থেকে তত্ত্বাবলীর জ্ঞান এমন স্তর পর্যন্ত অর্জিত হয়েছিল যে, তারা মনে করত তাদের ইচ্ছামতো যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কে হবে না। তবে অর্জিত এ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই কাজে আসেনি বরং তারা শুধু নিজেদের ক্ষতি বৃদ্ধি করেছিল। সত্যিকারের যাদুবিদ্যার চর্চা যেহেতু কুফরী তাই এ কর্ম সম্পাদনের ফলস্বরূপ জাহান্নামে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে।

যারা উক্ত কৌশলসমূহ আয়ত্ব করেছিল তারা এটা ভালভাবেই জানত যে, তারা অভিশপ্ত (লা'নত প্রাপ্ত)। কারণ, তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারেও যাদুচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। নিম্নের নিয়মগুলি এখনো তাওরাতে পাওয়া যায়:

"তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে সেখানকার জাতিগুলো যে সব জঘন্য কাজ করে তোমরা তা করতে শিখবে না। তোমাদের মধ্যে যেন এমন কোন লোক না থাকে যে তার নিজের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে কোরবানী করে, যে গোণাপড়া করে কিংবা মায়াবিদ্যা খাটায় কিংবা আলামত দেখে ভবিষ্যতের কথা বলে, যে জাদু করে, যে তন্ত্রমন্ত্র খাটায়,

যে ভূতের মাধ্যম হয়, যে ভূতের সংগে সম্বন্ধ রাখে এবং যে মৃত লোকের সংগে যোগাযোগ রাখে। এই সব কাজ যে করে মাবুদ তাকে জঘন্য মনে করেন। এই সব জঘন্য কাজের জন্যই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ ঐ সব জাতিকে তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবেন।"[১]

কিন্তু এ সব নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার স্থানে তারা স্বশরীরে উপস্থিত ছিল না বলে ভান করে এ বিধানাবলীর প্রতি কর্ণপাতই করে না। তাওরাতে এটাও লেখা ছিল যে, কোন ব্যক্তি যাদু বা মায়াবিদ্যার কৌশলের আংশিক চর্চা করলেই সে জান্নাতের যে-কোন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাকে চিরদিন আগুনে থাকতে হবে। কিন্তু ইহুদীরা উপরোক্ত বাক্যগুলো মূল তাওরাত থেকে বাদ দিয়ে যাদুমন্ত্রের বিভিন্ন কৌশল চর্চায় লিপ্ত রয়েছে।

তাদের এ শোচনীয় অবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত পংক্তিগুলোর ইতি টানেন করুণাপ্রকাশক বাক্যাংশের মাধ্যমে। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে ইহুদীদের কোন জ্ঞান থাকলে তারা ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে কয়েকটি সস্তা কৌশল আয়ত্বের জন্য তাদের মহা মূল্যবান আত্মার ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়ার ভয়ংকর পরিণাম উপলব্ধি করতে পারত।

আয়াতগুলোর এ বাকাংশ দ্বারাও যাদু নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার বিধান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়:

﴿... وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ... ﴿١٠٢﴾﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

"... যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না ...।" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

একমাত্র কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কর্মের শাস্তি হতে পারে জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আবার এটাও প্রমাণিত হয় যে, যাদুকরই নয় বরং এদের পাশাপাশি যারা যাদুবিদ্যা অর্জনকারী ছাত্র ও যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানকারী শিক্ষক উভয়ই কাফির। "যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে"- এ বাক্যাংশটির সুগভীর তাৎপর্য রয়েছে। যাদু শিক্ষা দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করে, যাদুবিদ্যা অর্জনের নিমিত্তে যে অর্থ ব্যয় করে অথবা যাদু সম্পর্কে যে জ্ঞানের অধিকারী -এরা

---

[১] Deuteronomy 18:9-12 [তৌরাত শরীফ: দ্বিতীয় বিবরণ, (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০ ইংরেজি) ১৮: ৯-১২]

সবাই এ বিধানের অধীন। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাদুকে কুফর বলে অভিহিত করে বলেন: "নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী করো না।" এবং "মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শায়ত্বনরাই কুফরী করেছিল।" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ১০২]

কিছু যাদুর যে বাস্তবতা রয়েছে তা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, রাসূল ﷺ নিজেই যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলেন- এ বিষয়টি বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা জানা যায়:

"যায়িদ ইবনু আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, লাবীব ইবনু আ'সাম নামে জনৈক ইহুদী রাসূল ﷺ-এর উপর যাদু করেছিল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূলের ﷺ নিকটে মু'আওয়াযাতান (সূরা আল-ফালাক্ব এবং নাস) নিয়ে জিবরীল (জিবরায়েল) (আলাইহিস সালাম) আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। তারপর সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনতে 'আলী ইবনু আবি ত্বালিবকে রাসূল ﷺ পাঠালেন। 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা নিয়ে ফিরে এলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। রাসূল ﷺ এক এক করে গ্রন্থি খুলতে এবং প্রতিটির সঙ্গে সূরা দু'টি থেকে একটি করে আয়াত পড়তে বললেন। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন।[১]

এ পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছে, যারা কোন না কোন প্রকারের যাদু চর্চা করেছে- এ সম্পর্কে প্রমাণাদি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নিকটে সংগৃহীত রয়েছে। এ সব সাক্ষপ্রমাণের কতিপয় মিথ্যা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, যাদু এবং অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত গল্প তৈরিতে পুরো মানবজাতি একত্রে সম্মত হয়েছে। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তসমূহের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে সুগভীর চিন্তায় মগ্ন হলে অবশ্যই এগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু বাস্তবতার যোগসূত্রের সন্ধান মিলবে। জিনের জগৎ সম্পর্কে পরিচিত নয় এমন লোকদের কাছে 'ভূতুড়ে বাড়ি', 'প্রেত নামানোর আসর'[২], 'ওঝার কাষ্ঠফলক'[৩], ওয়েস্ট

---

[১] 'আবদ ইবনু হুমাইদ এবং আল-বায়হাক্বি কর্তৃক সংগৃহীত। এ হাদীছের অনেকাংশ *বুখারী* ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৭ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৪৪ পৃ., হাদীছ নং ৬৬০ এবং *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১১৯২-১১৯৩ পৃ., হাদীছ নং ৫৪২৮।

[২] মৃতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বৈঠক বা প্রেততাত্ত্বিক গবেষণার সভা।

[৩] প্রেতচক্রের অধিবেশনে ব্যবহৃত অক্ষর ও অন্যান্য চিহ্ন সংবলিত কাষ্ঠফলক।

ইন্ডিজে বিশেষত হাইতিতে প্রচলিত ডাকিনীতন্ত্র[১], ভূতে বা জিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্ট, কেবল জিহ্বা দিয়ে কথা বলা, দেহকে শূন্যে ভাসমান রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রকাশ রয়েছে। এমনকি মুসলিম বিশ্ব বিশেষত বিভিন্ন চরমপন্থী সুফীতন্ত্রের (মরমীবাদের) গুরুজন তথা সুফীবাদীরা এর অস্বাভাবিক প্রভাবে বিপদগ্রস্ত। তাদের অনেকেই দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে, কোন উৎস ব্যতিরেকে খাদ্য ও টাকা-পয়সা তৈরি করতে সক্ষম বলে মনে হয়। আর তাদের অজ্ঞ অনুসারী ও অন্ধ ভক্তরা এ সব যাদুর প্রহেলিকাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনা বা কারামত বলে বিশ্বাস করে। ফলে তথাকথিত এ সব ওলী-আওলীয়া, মুরশিদ, পীর-মাশাইখ, দরবেশদের উদ্দেশ্যে ভক্তরা তাদের সম্পদ ও জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আশ্চর্য হওয়ার মতো এ ধরণের অনেক ঘটনার মূলে জিন জগতের হস্তক্ষেপ থাকে, অথবা জিনের গোপন ও দুষ্ট জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।[২]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, সাপ ও কুকুরের রূপে থাকা জিন ব্যতীত অন্য সকল জিন আদতে অদৃশ্য।[৩] তবে, জিনের জগতে এমন কতিপয় জিন রয়েছে যারা তাদের ইচ্ছামতো মানুষসহ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আলাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে রমাযানের যাকাত হিফাযাত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি [আবূ হুরায়রা] বলেন, আমি ছেড়ে দিলাম; যখন সকাল হল, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

---

[১] এর প্রয়োগ বা বিশ্বাস বা এতে সিদ্ধ ব্যক্তি।

[২] তবে উপরে বর্ণিত সকল ঘটনার মূলে যে জ্বিন জগতের হাত রয়েছে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেননা, আওলিয়াদের কারামত যেটাকে আমরা স্বীকার করি, সেখানেও তো মাঝে-মধ্যে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে থাকে এবং ঘটতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে আমরা সে-সব ঘটনার পিছনেও জ্বিনের জগত সক্রিয় রয়েছে বলে ঘোষণা দিতে পারি না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, অতি প্রাকৃত বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে শুধু ঘটনার ধরণ নয়, বরং আমাদেরকে দেখতে হবে যে ঘটনা কার মাধ্যমে ঘটেছে এবং কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে ঘটেছে। (বিস্তারিত দেখুন: দশম অধ্যায়ের *'ওলী'* বিষয়ক আলোচনা।)

[3] এ বিষয়ের বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জির জন্য ৫ম অধ্যায় দেখুন।

'হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, হে রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া উদ্রেক হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' আল্লাহ্র রাসূলের এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?' আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! সে তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি ﷺ বললেন, 'খবরদার, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, 'আমি তোমাকে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এবার অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হল তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিব। যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, 'যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।' কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহ্র রাসূল আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল যে, এতে আলাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়ত্বান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত

ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবূ হুরায়রা বললেন, না। তিনি ﷺ বললেন, সে ছিল শয়ত্বান।[১]

জিনেরা বিশাল দূরত্বের পথ মূহূর্তের মধ্যে ভ্রমণ করতে এবং মানুষের শরীরে অশরীরী হিসেবে অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। অন্যান্য প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন মানুষের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে তিনি জিনকেও এ অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন। তবুও, সকল সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

সুতরাং জিনের ক্ষমতা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়সমূহ স্মরণ রাখলে সকল প্রকার অতিপ্রাকৃতিক তথা অলৌকিক ও যাদুসংক্রান্ত ঘটনাগুলো যে ধোঁকা বা ভেলকিবাজি নয় তা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, হঠাৎ হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে ও নিভে যায়, দেয়াল থেকে ছবি পড়ে যায়, জিনিসপত্র বাতাসে উড়ে বেড়ায়, মেঝে ফেটে যায় ইত্যাদি ঘটনাগুলো সাধারণত একটি ভূতুড়ে বাড়ির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অদৃশ্য অবস্থায় জিনেরা জড় বা ভৌত উপাদান বা বস্তুর উপর সক্রিয় হয়ে উক্ত ঘটনাগুলোসহ আরও অন্যান্য অভূতপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হতে সহায়তা করে। আধ্যাত্ম বৈঠকের বেলায়ও এ বিষয়টি উপরের ঘটনার অনুরূপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আধ্যাত্ম বৈঠকে মৃতরা জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করে ব'লে বাহ্যিকদৃষ্টিতে মনে হয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের কণ্ঠস্বর যাদের নিকটে পরিচিত তারা মৃতদের জীবনে সংঘটিত নানা প্রকার ঘটনা সম্পর্কে তথাকথিত মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে অনুরূপ কণ্ঠেই শুনতে পায়। মৃতব্যক্তিটির জীবিতাবস্থায় তার জন্য যে জিনটি নিয়োজিত ছিল সর্বক্ষণ, সেই জিনটিকে আহ্বান করে তাকে মাধ্যম করে এ কৃতিত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়। এ জিনটিই মৃতের কণ্ঠস্বরকে হুবহু নকল করে মৃতব্যক্তির জীবনে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সবিস্তার বর্ণনা পেশ করে। ওঝার কাষ্টফলককেও অনুরূপ উত্তর প্রদান করতে দেখা যায়। যথাযথ পরিবেশের ব্যবস্থা করলে জিনের অদৃশ্য হস্তক্ষেপে বিস্ময়কর ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে। যারা শূন্যে ভেসে বেড়াতে অথবা কোন জিনিসকে স্পর্শ না করেই উপরে উঠাতে বা নিচে নামাতে সক্ষম বলে মনে হয়- এগুলোতেও জিনের অদৃশ্য হাত রয়েছে। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করতে অথবা একই সময়ে দুটি স্থানে উপস্থিত থাকতে সক্ষম হয়- এটিও আদতে

[১] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৪র্থ খণ্ড, ৩১৯-৩২০ পৃ., হাদীছ নং ৪৯৫।

তাদের অদৃশ্য সঙ্গী কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়।[১] অনুরূপভাবে, যারা শূন্য থেকে খাদ্যদ্রব্য বা টাকা-পয়সা উপস্থিত করতে পারে তারাও অদৃশ্য ও দ্রুতগতির জিনের সহায়তা নিয়ে এ সব কৃতিত্ব সম্পন্ন করে থাকে। এমনকি পুনর্জন্মগ্রহণের মত বিস্ময়কর ঘটনার প্রকাশেও জিনদের হস্তক্ষেপ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাত বৎসর বয়স্ক *শান্তি দেবী* নামে এক বালিকা তার পূর্ববর্তী জীবনে সংঘটিত ঘটনবলীর সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিল।[২] বালিকাটি তখন যেখানে বাস করত সে স্থান থেকে বহুদূরের অন্য একটি প্রদেশের মুতরা নামক একটি শহরে অবস্থিত তার বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছিল (যেখানে সে তার পূর্ববর্তী জীবনে বসবাস করত)। লোকজন বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে সেখানে গমন করলে, বালিকাটির বর্ণনানুপাতে একটি বাড়ি সে স্থানে এক সময় ছিল বলে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা স্বীকার করেছিল। তাছাড়া তারা সেই বালিকার পূর্ববর্তী জীবনের কিছু ঘটনার সত্যতাও নিশ্চিত করেছিল। নিশ্চয়ই এ সকল তথ্যাবলী জিনেরা বালিকাটির অবচেতন মনে প্রথিত করে দিয়েছিল। রাসূল ﷺ এ বিষয়টিকে সমর্থন করে বলেন,

"নিশ্চয়ই মানুষ ঘুমন্তাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখে তা তিন প্রকার: আর-রাহমান-এর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে, খারাপ স্বপ্ন শয়ত্বান হতে এবং অবচেতন স্বপ্ন।"[৩]

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, জিন মানুষের দেহের পাশাপাশি মনের মধ্যেও প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। জিনের আছর বা জিনে পাওয়া মানুষের ঘটনা অসংখ্য এবং প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এ ঘটনা ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে, এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে বহু খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের কথা বলা যায়, শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যতার দরুন এরা অবচেতন হয়ে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। এমন দুর্বলতর অবস্থায় জিন সহজেই তাদের শরীরে প্রবেশ করে প্রলাপ বকাতে পারে। তথাকথিত মুসলিম সুফীদের[৪] জিকিরের[৫] বৈঠকের সময়েও এ ধরণের ঘটনা ঘটার অনেক নজীর রয়েছে। আবার জিনের এ আছর দীর্ঘস্থায়ীও

---

[১] এ সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে *Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn* -এর ৪৭-৫৯ পৃ. দেখুন।

[২] Colin Wilson, *The Occult,* (New York: Random House, 1971) 514-515 পৃ.

[৩] আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। আবূ দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১৩৯৫ পৃ., হাদীছ নং ৫০০১; *সিলসিলাহ আল-আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ,* ৪র্থ খণ্ড, ৪৮৭ পৃ., হাদীছ নং ১৮৭০।

[৪] ***মুসলিম***দের মধ্য থেকে উৎসরিত আধ্যাত্মবাদ।

[৫] অনবরত আল্লাহ্‌র নাম বলা এবং অনেক সময় গান-বাদ্যের তালে তালে শরীর ঝাঁকিয়ে এমনকি নৃত্যের তালে তালে।

হতে পারে। ফলে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। জিনে বা ভূতে পাওয়া অথবা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবহার করে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটায় অথবা তাদেরকে মাধ্যম করে অনেক সময় নিয়মিতভাবে কথাবার্তা বলতে পারে।

মধ্যযুগে ভূত-প্রেত[১] বিতাড়ন রেওয়াজের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ভূত-প্রেত বিতাড়ন সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের এ প্রথার উৎপত্তি মূলত বাইবেলে। মন্ত্র দ্বারা যিশু ভূত-প্রেত দূর করেছেন- এ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা বাইবেলে দেখতে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এ রকম যে, 'যিশু ও তাঁর সহচরগণ গেরাসেনীদের এলাকায় গিয়ে ভূতে পাওয়া একজন লোকের সাক্ষাত পান। সেই ভূতগুলোকে তার মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করলে তারা লোকটিকে ত্যাগ করল এবং নিকটবর্তী পাহাড়ের ঢালে চরে বেড়ানো শূকর পালের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তাতে সেই শূকরের পাল পাহাড়ের ঢালু পার দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মরল।'[২] সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়া *'The Exorcist', 'Rosemary's Baby'* ইত্যাদি চলচ্চিত্রে এ ভূত-প্রেত বিতাড়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিপ্রাকৃত তথা অলৌকিক যে কোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা যেহেতু বস্তুবাদী পশ্চিমাদের সাধারণ প্রবণতা, তাই ভূত-প্রেত বিতাড়নের কোন যৌক্তিক ভিত্তি পশ্চিমাদের নিকটে নেই এবং এটিকে তারা কুসংস্কার বলে গণ্য করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্ধকার ও মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে ডাইনি খুঁজে বের করে আগুনে পোড়ানোর ঘটনা অহরহ ঘটতে দেখা গেছে। তথাপি, জিনে পাওয়া বা ভূতগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি থেকে জিন বা ভূত বা প্রেতকে বিতাড়ন করতে এবং জিনে পাওয়া বা ভূতগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত রোগের চিকিৎসায় কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বৈধ পদ্ধতি প্রয়োগ জায়েয।

জিনে পাওয়া ব্যক্তির উপর থেকে জিনকে বিতাড়িত করতে সাধারণত তিন ধরণের পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়:

১. প্রথমত, অন্য জিনকে ডেকে এনে উপস্থিত জিনকে বিতাড়িত করা যায়। এ পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, জিনকে ডাকতে প্রায়ই অপবিত্র তথা শির্‌কী-কুফরী ও অবৈধ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। মূলত ইসলামের

---

[১] ইছলামী পরিভাষায় ভূতপ্রেত ইত্যাদি কোন শব্দ নেই। কারণ, কুরআন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, জিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে বিশ্বাসী তথা মু'মিন এবং কিছু সংখ্যক হচ্ছে অবিশ্বাসী বা কাফির, তন্মধ্যে অবিশ্বাসীদেরকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। তন্মধ্যে একটি নাম হচ্ছে **ভূত বা প্রেত** যা আমাদের সামাজিক পরিভাষায় প্রচলিত একটি নাম বা শব্দ। -*অনুবাদক*

[২] মথি ৮:২৮-৩৪, মার্ক ৫:১-২০ এবং লূক ৮: ২৬-৩৯।

মৌলিক বিষয়গুলোর বিরোধিতা করেই জিনকে আহ্বান করতে হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমেই এক যাদুকর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত যাদুমন্ত্রকে অন্য যাদুকর ধ্বংস করে থাকে।[১]

২. দ্বিতীয়ত, জিনের সামনে বড় ধরণের শির্কে লিপ্ত হয়ে তাকে বিতাড়ন করা যায়। যাদুকরের কুফরী ও শির্কে সন্তুষ্ট হয়েও জিন অসুস্থ ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে পারে। এভাবে জিন চলে যাওয়ার মাধ্যমে যাদুকরের ব্যবহৃত পদ্ধতিকে সে সঠিক বলে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ নিয়মেই খ্রিস্টান যাজকেরা যিশুকে ডেকে এবং ক্রুশ ব্যবহার করে ভূত বিতাড়নের কাজ সমাধা করে। আর পৌত্তলিকদের প্রধান পুরোহিত বা ফক্বির বা ওঝাগণও তাদের মিথ্যা দেবতাদের নামে ভূত বিতাড়ন করে।

৩. তৃতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে জিনকে তাড়ানো যায়।[২] এ আসমানী শব্দসমষ্টি এবং বিধানসমূহ

---

[১] জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যাদু দ্বারা যাদু মুক্ত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এটি শয়ত্বানের কর্ম'। *(আহমাদ, ৩/২৯৪; আবূ দাউদ, ১০/৩৪৮; আওনুল মা'বূদ, হা/৩৮৫০; হায়সামী বলেন, অত্র হাদীছটি আনাস থেকে ইমাম বাযযার ও তাবরানী স্বীয় আওসাত্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ বুখারী বা মুসলিমের রাবী। দ্রঃ মাযমাউয যাওয়াইদ, ৫/১০৫; হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই হাদীছটির সনদ হাসান। দ্রঃ ফাতহুল বারী, ১০/২৩৩; গৃহীতঃ আল্লামা ফাহাদ বিন যূইয়ান সুহায়মী, আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম, পৃ. ১৫০-১)*

[২] এ ক্ষেত্রে, সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পাঠ করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা যায়:

১. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা-খালাক্ব।" *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০৮)* তবে যাদু-টোনা ও জিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকতে দু'আটি যে কোন সময় বিশেষ করে রাত্রী বেলায় পাঠ করতে হয়।

২. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَمَّاتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّمَّاتٍ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিন ওয়া হা-ম্মাতিন, ওয়ামিন কুল্লি 'আয়নিন লা-ম্মাতিন। *(বুখারী, হা/৩১২০)*

৩. بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ বিসমিল্লাহ-হিল্লাযী লা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামায়ি, ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম। *(আহমাদ, হ/৪১৮, ৪৪৪, ৪৯৭; তিরমিযী, হা/৩৩১০, আবূ দাউদ, হা/৪৪২৫; ইবনু মাজাহ, হ/৩৮৫৯; হাদীছ ছহীহ)* এছাড়া ফজর ও মাগরিবের সলাতের পরও তিনবার করে এ দু'আটি পাঠ করা যায়।

৪. أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাসি ওয়াশফি আন্তাশ শা-ফী, লাশিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আন লা ইউগা-দিরু সাক্বামা। *(বুখারী, হা/৫৭৪৩; মুসলিম, হা/২১৯১; আহমাদ, হা/৫৩৩; আবূ দাউদ, হা/৩৩৮৫; তিরমিযী, হা/৩৪৮৮)*

৫. সূরা বাক্বারার ২৮৫ ও ১৮৬ নং আয়াত। তাছাড়া, রাতের প্রথম অংশেও এ আয়াতদু'টি পাঠ করা যায়। *(বুখারী, হা/৩৭০৭, ৪৬২৪, ৪৬৫২, ৪৬৬৩; মুসলিম, হা/১৩৪০, ১৩৪১)*

৬. বরইয়ের সাতটি সবুজ পাতা বেটে পাউডার বানিয়ে তা একটি পাত্রে রেখে তাতে গোসলের সমপরিমাণ পানি ঢেলে তার মধ্যে এ আয়াতগুলো পাঠ করবে: আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত), সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিন বার করে এবং যাদু সংক্রান্ত আয়াতসমূহ যেমন- সূরা আ'রাফের ১১৭ থেকে ১১৯ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ৭৯ খেবে ৮২ নং আয়াত এবং ত্বহা-এর ৬৫ থেকে ৬৯ নং আয়াত পাঠ করবে। এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর উক্ত বরই পাতার পাউডার মিশানো পানিতে তিনিবার ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে এবং বাকী পানি দ্বারা গোসল করবে। *(বরই পাতা গুড়া করে তাতে পানি ঢেলে সে পানিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার কথা ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাবিঈর কিতাবে লিখিত আছে বলে ইবনু বাত্তাল উল্লেখ করেছেন। দ্র: ফাৎহুল বারী, ১০/২৩২; আযওয়াউল বায়ান, ৪/৪৬৪; মাহমূদ খলীফা আল-জাসেম, যাদু ও বদ-নযর, পৃ. ৫৪)* হাফিয ইবনু কাছীরও অনুরূপ কথা স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। সউদী 'আরবের সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বাযও অনুরূপ ফাৎওয়া দিয়েছেন। *(মাযমূউল ফাতাওয়া, ৩/২৭৪-৮১)* মিশরের অন্যতম সালাফী বিদ্বান শায়খ হামিদ ফক্বীহ তাঁর প্রতিবাদ করলে তিনি তার জবাব দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে তা বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। ডাক্তারগণ অনুরূপ বহু কিছু বলে থাকেন। যেমন, ওমুক ট্যাবলেট একসাথে দু'টি খেতে হবে, রাতে এই সংখ্যায় খেতে হবে, দিনে এই সংখ্যায় খেতে হবে ইত্যাদি। অতএব এটিকে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। *(দ্র. হামিদ ফক্বীহ কর্তৃক তাহক্বীক কৃত এবং শায়খ ইবনু বায কর্তৃক সম্পাদিত* 'ফাতহুল মাজীদ'*)* ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ একজন তাবিঈ বিদ্বান এবং তাঁর এই 'আমলটি কুরআন-হাদীছ বিরোধী নয় হেতু 'আমলটির বৈধতাকে ঐসমস্ত মুসলিম মনীষীগণ মেনে নিয়েছেন। এরপরও বিষয়টি যেহেতু ইজতিহাদ ভিত্তিক। অতএব কেউ তা মানতে বাধ্য নয়। কুরআনে আয়াত, ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত নাবীর শিখানো দু'আ প্রভৃতি পড়ে পানিতে দম করার কথা সালাফী সালিহীন থেকে বর্ণিত হওয়ায় সউদী আরবের মান্যবর সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায ও আল্লামা ইবনু উছায়মীন এটিকে বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। *(দ্র: ফাতাওয়াল ইলাজ বিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ৯-১০ এর বরাতে ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ১৩৫২-১৩৫৩)* এমনকি যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত দু'আ পানিপাত্র বা কাগজে লিখে তা পানিতে মিশিয়ে সে পানি পান করতে কতিপয় সালাফী সালিহীন যেমন, ইবনু 'আব্বাস, মুজাহিদ, আবূ কিলাবাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হওয়ায় সউদী আরবের স্থায়ী কমিটি তা বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন। *(দ্র: মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়্যাহ, সংখ্যা ২৭, পৃ. ৫১-৫২; ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, ১৩২৩-২৪)* তবে এগুলো ইজতিহাদী বিষয় মাত্র, যা মানতে কেউই বাধ্য নয়। অবশ্য আমভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ ভিত্তিক দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক প্রমাণিত। মনে রাখা আবশ্যক যে, যাদু-টোনা চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম হল যদি জানা যায় যে, ওমুক জায়গার যাদুর উপকরণ রাখা হয়েছে বা প্রোথিত হয়েছে, তবে তা বের করে ধ্বংস করে দেওয়া। এতেই সংশ্লিষ্ট যাদু-টোনার আসর ধ্বংস যাবে ইনশাআল্লাহ্। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। *(বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৩২৪; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/৪০৫৯)*।

জিন-শয়ত্বানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়:

উপরে বর্ণিত দু'আ ও আয়াতসমূহ জিন-শয়ত্বানের অনিষ্ট হতে নিজেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে কেউ জিন, শয়ত্বান দ্বারা আক্রান্ত হলে তার জন্যও উপরোক্ত রূহানী চিকিৎসা যথেষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে যাদু সংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ এবং বরই পাতার ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো শুধুমাত্র যাদু দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের জন্য উপরোক্ত দু'আগুলো ও যিকরগুলোই যথেষ্ট। (আল্লামা ফাহাদ বিন যুইয়ান সুহায়মী, *আহকামুর রুক্বা ওয়াত তামাইম,* পৃ. ১৫০-১৫১; বিস্তারিত দ্র: *মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়াল মাক্বালাত মুতানাব্বিআহ,* ৩/২৭৪-২৮১ এর বরাতে *ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ১৫১২)* তাছাড়া প্রতিদিন সকাল বেলায় সাতটি করে খেজুর বিশেষ করে আজওয়া খেজুর ভক্ষণ করবে। এরূপ করলে বিষ ও যাদু কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

জিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্টের চারদিকের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তারপর, আদেশ বা আঘাতের দ্বারা জিনকে তাড়ানো যায়। যে ব্যক্তি এ কর্ম সম্পাদন করবে তার ব্যক্তিগত ঈমান যদি মজবুত না হয় অথবা সৎকর্মের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভাল সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সে জিন বিতাড়নের এ কর্মে সিদ্ধি লাভ করতে ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।[১]

(*বুখারী*, 'খাদ্য' অধ্যায়, হা/৫২৫ এবং 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/ ৫৩২৬-৭, ৫৩৩৪; ***মুসলিম***, 'পানীয়' অধ্যায়, হা/৩৮১৪) এটি অতি মূল্যবান এক প্রকার খেজুর। দেখতে একেবারেই কালো এবং অন্যান্য খেজুর অপেক্ষা ছোট। এটি সউদী আরবে পাওয়া যায়। মদীনা মুনাওয়ারায় অবশ্য এই খেজুর বেশী দেখা যায়। এ খেজুরের মূল্য সাধারণ খেজুর অপেক্ষা বেশী। অনেক আলেমে দ্বীন মনে করেন, শুধু আজওয়া খেজুরেই উক্ত প্রতিষেধক রয়েছে, অন্যান্য খেজুরে নেই।

এতদ্ব্যতীত কুরআনের আয়াতের নামে তথাকথিত *সুলায়মানী নকশা*, ইহূদীদের থেকে প্রাপ্ত বিদ্যা তথা কুরআনের আয়াতসমূহ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা; যেমন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা ইত্যাদি দিয়ে তা'বীজ-কবচ তৈরি করে ব্যবহার করা শারী'আতের দৃষ্টিতে বড় ধরণের পাপ ও নিকৃষ্ট বিদ'আত।

উল্লেখ্য, যাদু-টোনায় বা জিন-শয়ত্বান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঔষধ-বড়ি মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। কাজেই যাদু-টোনা বা জিন-শয়ত্বান থেকে নিরাপদ থাকা বা এগুলো দ্বরা আক্রান্ত হলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করার ক্ষেত্রে একমাত্র শারী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকই বিকল্প চিকিৎসা। তবে সচরাচর দেখা যায়, উভয় প্রকার রোগী আরোগ্য লাভের জন্য এমন কিছু কাজ করে অথবা প্রচলিত কবীরাজরেদ অনেকেই ঐসব রোগের চিকিৎসা স্বরূপ এমন কিছু কাজ করে থাকে বা রোগী দ্বারা করিয়ে থাকে যা প্রকাশ্য শির্ক। যেমন- তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, ফিরিশতা, নাবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট তারিখে লাল বা কালো মোরগ জিন-ভূতের নামে রোগীকে যবেহ করতে বলে কিংবা ৪/৫ কেজি মিষ্টি গায়রুল্লাহর নামে মানত হিসেবে প্রদান করতে বলে ইত্যাদি। এ সকল কর্মই শির্ক। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত চিকিৎসাই এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ সব শির্কী পন্থায় চিকিৎসা ফলপ্রসূ হলেও তা গ্রহন করা শারী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। এভাবে চিকিৎসা নেওয়া মানেই নিজেকে কাফির, মুশরিক সাব্যস্ত করা। -*অনুবাদক*

[১] শারী'আত সম্মত চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হতে হলে রোগী ও চিকিৎসক উভয়কে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মাত কাজেই তার সুপ্রভাবও সুনিশ্চিত। বিশ্বাস ও আস্থাহীনভাবে শুধু পরীক্ষাস্বরূপ তা ব্যবহার করলে কোনই উপকারে আসবে না। মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ্ পূর্ণ কুরআনকেই 'শিফা' তথা আরোগ্য বলেছেন। (হামীম সিজদাহ: ৪৪; ইসরা: ৮২) এ হল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দ্ব্যর্থহীন বাণী। অতএব চাই এর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। কুরআনের পরপরই নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদীছের স্থান। এটাও এক প্রকার ওহী। সুতরাং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁকের দু'আসমূহেও পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা রাখতে হবে। এভাবে আস্থাশীল হয়ে কুরআন ও হাদীছ সম্মত উক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এ সব ঝাড়-ফুঁক আরোগ্য লাভের বৈধ উপায়-উপকরণ মাত্র, প্রকৃত আরোগ্য দানকারী হলেন আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা। -*অনুবাদক*

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বর্তমানে অনেক মুসলিম জিনে পাওয়া বা ভূতাবিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে। এমনকি অনেক মুসলিম এমনও রয়েছে যারা জিনের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে না। অথচ, কুরআন ও সুন্নাহতে এ ব্যাপারে হ্যাঁ-বাচক বর্ণনা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ লোকদেরকে জিনের আছর থেকে মুক্ত করেছেন। তাছাড়া এমন হাদীছের সংখ্যাও কম নয় যেখানে আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরাও তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে লোকজনকে জিনের আছর থেকে মুক্ত করেছেন। নিম্নের তিনটি হাদীছ থেকে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়:

ইয়ালা ইবনু মারাহ বলেন,

"আমি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে ভ্রমণে বের হয়ে এক মহিলাকে তার বাচ্চাসহ রাস্তায় বসে থাকতে দেখলাম। মহিলাটি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ, এ শিশুটি অসুস্থ এবং আমাদেরকেও যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে। আমি জানি না প্রতিদিন কতবার তাকে যাদু দ্বারা আক্রমণ করা হয়!' রাসূল ﷺ বললেন, 'বাচ্চাটি আমার কাছে দাও।' তাই মহিলাটি বাচ্চাটিকে উপরে উঠিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে দিল। তারপর রাসূল ﷺ বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর বাচ্চার মুখ খুলে তিনবার মুখের ভিতরে ফুঁ[১] দিয়ে বললেন, 'বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা, তাই চলে যাও, ওহে আল্লাহ্‌র শত্রু!' তারপর বাচ্চাটি মহিলার কাছে ফেরত দিয়ে রাসূল ﷺ বললেন, 'ফিরতি পথে আবার এখানে আমাদের সাথে সাক্ষাত করবে এবং বাচ্চাটির অবস্থা সম্পর্কে জানাবে।' তারপর আমরা চলে গেলাম এবং ফিরতি পথে আমরা মহিলাকে সেই জায়গাতেই তিনটি ভেড়াসহ দেখতে পেলাম। তাই রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাচ্চা কেমন আছে?' মহিলা উত্তর দিল, 'তাঁর নামে শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি দু'আ করার পর থেকে তার কোন সমস্যা আমরা দেখতে পাই নি, তাই আমি এই ভেড়াগুলো আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।' রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'ঘোড়া থেকে নামো এবং একটি ভেড়া গ্রহণ কর। আর বাকীগুলো তাকে ফেরত দাও।'"[২]

---

[১] এখানে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে *'নাফাছা'*, যার অর্থ জিহ্বার অগ্রভাগকে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রেখে ফুঁক দেওয়া। অতএব, এটা ফুঁক দেওয়া ও হালকাভাবে থু থু ফেলার মাঝামাঝি পর্যায়।

[২] *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত।

উম্ম আবান বিনতু আল-ওয়াযি' বর্ণনা করেন,

"আমাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমার দাদা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় তিনি তার এক ছেলেকেও সাথে নিয়ে যান, যে ছিল পাগল। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর নিকটে পৌঁছে তিনি বললেন, 'আমার একটি পাগল ছেলে রয়েছে, তাই আপনার দু'আ চাইতে আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি।' রাসূল ﷺ তাকে নিয়ে আসতে বললেন। ফলে তার ছেলের পরনে যে ভ্রমণের পোশাক ছিল তা পরিবর্তন করে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসে পিছন ফিরে দাঁড় করাও।' তারপর রাসূল ﷺ ওই ছেলেটির পরনের কাপড় শক্ত করে ধরে তার পিছে সজোরে আঘাত করতে শুরু করলেন। তাকে আঘাত করা অবস্থায় রাসূল ﷺ বলছিলেন, 'দূর হয়ে যা, আল্লাহ্‌র শত্রু! দূর হয়ে যা, আল্লাহ্‌র শত্রু!' এরপর ছেলেটি এমনভাবে চারদিকে তাকাতে শুরু করল যেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। রাসূল ﷺ তাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন এবং কিছু পানি আনতে আদেশ করলেন। তারপর রাসূল ﷺ পানি দিয়ে ছেলেটির মুখ ধুয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। রাসূল ﷺ-এর দু'আর পর উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে আর কেউই ওই ছেলের মতো সুস্থ ছিল না।'[১]

খারিজাহ ইবনু আছ-ছাল্‌ত বর্ণনা করেন যে তার চাচা বলেছেন,

"আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করে যাওয়ার সময় এক বেদুইন গোত্রের সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন বলল, 'আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তোমরা ঐ ব্যক্তিটি (রাসূল মুহাম্মাদ) থেকে কিছু উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছ। জিনেপাওয়া ব্যক্তির জন্য তোমাদের নিকটে কি কোন ওষুধ বা মন্ত্র আছে?' আমরা বললাম, হ্যাঁ। তাই তারা জিনগ্রস্ত এক পাগলকে আনল। তিনদিন ধরে আমি প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তার উপরে *সূরা আল-ফাতিহা* তিলাওয়াত করলাম। প্রতিবার পড়া শেষে আমি আমার মুখে লালা জমা করে তাকে থু থু মারতাম। অবশেষে সে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন শক্তিশালী কোন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। তারপর বেদুইনরা পারিশ্রমিক হিসেবে একটি উপহার নিয়ে এলে আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত আমি এটি গ্রহণ করতে পারব না।' আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'ওটা গ্রহণ করো। আমার জীবনের শপথ, মিথ্যা

---

[১] মাতার ইবনু আর-রাহমান থেকে ***আহমাদ*** এবং আবু দাউদ আত-তাইলাসী কর্তৃক সংগৃহীত, (*উসুদ আল-গাবাহ্*)। উসমান আবানকে ইবনু হাজার বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আয় করবে, সে নিজেই তার গুনাহের জন্য দায়ী। কিন্তু তুমি পারিশ্রমিক অর্জন করেছ সত্য আয়াতের মাধ্যমে।[১]

ইসলামে যাদুমন্ত্রের বিধান

যাদুমন্ত্র চর্চা এবং এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকে ইসলামে যেহেতু কুফর (অবিশ্বাস) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাই যে ব্যক্তি যাদুমন্ত্র চর্চা করবে তার জন্য শারি'আতে (ইসলামী আইন) খুব কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। যাদুমন্ত্র চর্চাকারী ব্যক্তি আটক হওয়ার পর সে যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তা চর্চা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই তার জন্য একমাত্র শাস্তি। এ আইনটি মূলত যুনদুব ইবনু কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীছ। উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"তরবারির আঘাতে হত্যা করাই যাদুকরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি।"[২]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাতিকে পরিচালনাকারী খলিফাগণ ইসলামের এ বিধানকে খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন। বাজ্জালা ইবনু 'আবদাহ বর্ণনা করেন, 'মা, মেয়ে ও বোনদেরকে বিবাহকারী সকল জোরাষ্ট্রিয়ানদের বিবাহকে বাতিল করে দেয়ার আদেশসহ জায ইবনু মু'আবিয়া-এর নিকট প্রেরিত পত্রে খলীফা 'উমার ইবনু আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় নিযুক্ত মুসলিম বাহিনীর নিকটে এই বলে আদেশ করেন যে, জোরাস্ট্রিয়ানদেরকে *আহ্‌ল আল-কিতাব*দের[৩] অন্তর্ভুক্ত করতে মুসলিম বাহিনীরা যেন জোরাস্ট্রিয়ানদের দেয়া খাবার খায় এবং সমস্ত জ্যোতিষ ও যাদুকরদের খতম

---

[১] *সুনান আবি দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১০৯২ পৃ., হাদীছ নং ৩৮৮৭।

[২] ইমাম *বুখারী*, *আত-তারীখুল কাবীর*, ২/২২২; *দারাকুতনী; বায়হাক্বী*, ৮/১৩৬; ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, ৪/১৯/১,২; *তিরমিযি, 'দণ্ড' অধ্যায়, হা/১৩৮০*। তিনি হাদীছটিকে মারফূভাবে উল্লেখ করে মওকূফ হিসেবে বিশুদ্ধ বলেছেন। মূলত হাদীছটি যঈফ হলেও এ হাদীছের সমর্থনে আরও হাদীছ থাকার কারণে এর সনদ *হাসান* (ছহীহ হাদীছের কাছাকাছি) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন: ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ উছায়মিন প্রণীত *কিতাবুত-তাওহীদের তাখরীজ 'আদ-দুররুন নাযীদ'*, (দারু ইবনু খুযায়মাহ), পৃ. ৮৭) উঁচু পর্যায়ের চারজন আইনবিদের মধ্যে তিনজনই (আহমাদ, আবু হানীফা এবং মালিক) এ অনুসারেই আইন প্রণয়ন করেছেন। চতুর্থ আইনবিদ আশ-শাফী'-এর আইন অনুসারে, একজন যাদুকরকে শুধু তখনই হত্যা করতে হবে যদি তার যাদুমন্ত্র কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে। (*তাইসীর আল- 'আযীয আল-হামীদ*, ৩৯০-৩০১ পৃ. দেখুন)

[৩] ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো যারা অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করে। বর্ণনাটির এ অংশটুকু ***বুখারী***, *তিরমিযি* এবং *নাসাঈ* কর্তৃক সংগৃহীত।

করে দেয়। বাজ্জালা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, উক্ত আদেশের ভিত্তিতে তিনি নিজেই একদিনে তিনটি যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন।[১]

মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রাহমান বর্ণনা করেন, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে তাঁর কৃতদাসী যাদু করলে তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[২]

আজ অবধি তাওরাতে এ শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়, যা দ্বারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য যাদুমন্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছেঃ

"যে সব পুরুষ বা স্ত্রীলোক প্রেতাত্মার মাধ্যম বা যাদুকর হয়, তাদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পাথর ছুঁড়ে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। নিজেদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।"[৩]

অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী খলিফাদের পর আইন-কানুন শিথিল হয়ে পড়ে। জ্যোতিষ ও যাদুকরদেরকে উমাইয়া খলিফারা তাদের এ সব নিষিদ্ধ কর্মের অনুমতি প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাদেরকে রাজদরবারে সম্মানিত আসনে আসীন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ আইন প্রয়োগ স্থগিত করার ফলে সে সময় বেঁচে থাকা কতিপয় সাহাবী নিজেরাই এ আইন প্রয়োগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। আবু 'উছমান ইবনু 'আব্দুল মালিক আন-নাহ্‌দি বর্ণনা করেন, একটি লোককে খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আবদিল-মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫) তাঁর দরবারে নিয়োগ করেন যার কাজ ছিল যাদুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করা। একদিন এ যাদুকরটি এক লোকের মাথা কেটে শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তার এ কৃতিত্বে দর্শকরা হঠাৎ চমকিত হয়ে পড়লে সে আবার মাথাটি যথাস্থানে পুনঃসংযোগ করে সবাইকে আরও হতচকিত করে ফেলল। তারপর যে লোকটির মাথা কাটা হয়েছিল তাকে এমন দেখা গেল যেন তার মাথা কখনো কাটাই হয় নি। লোকজন বিস্মিত হয়ে বলল, 'সুবহ্‌নাল্লাহ (মহাপবিত্র আল্লাহ্)! সে মৃতদের জীবন দিতে সক্ষম।' আল-ওয়ালিদের দরবারে প্রচণ্ড হট্টগোল দেখে যুনদুব আল-আযদি নামে এক *সাহাবী* এগিয়ে এসে যাদুকরের কৃতিত্ব অবলোকন করলেন। তার পরদিন, আল-ওয়ালিদের দরবারে পিঠে তরবারি বেঁধে যুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবার প্রবেশ করলেন। যাদু প্রদর্শনের জন্য যাদুকরটি এগিয়ে আসলে যুনদুব

---

[১] *আহমাদ*, হা/১৫৬৯; *আবু দাউদ*, 'জমির কর' অধ্যায়, হা/২৬৪৬ এবং ***আল-বায়হাক্বী*** কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী এবং 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মেয়ে। *মাসায়েলে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ*, মাস'আলা নং ১৫৪৩; ***মুওয়াত্তা ইমাম মালিক***, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩৪৪-৩৪৫ পৃ., হাদীছ নং ১৫১১, ৮৭২; ***বায়হাক্বী***, ৮/১৩৬। আছারটি ছহীহ্। বিস্তারিত দ্রঃ *আদ-দুররুন নাযীদ*, পৃ. ৮৬।

[৩] লেবীয়: ৪: ২০: ২৭

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর তরবারি খুলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে যাদুকরের মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর বিস্ময়াহত দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, 'সে যদি সত্যিই মৃতব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তার নিজের প্রাণ ফেরৎ আনুক।' আল-ওয়ালিদ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[১]

একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীকে জ্যোতিষী বা যাদুকরের উপর আরোপ করার মাধ্যমে মানুষ যেন *তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*-এ শির্‌ক না করে, সে কারণেই জ্যোতিষী বা যাদুকরদের উপর ইসলামের আইন প্রয়োগে এ কঠোরতা। অধিকন্তু, কেবল ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেই নয়, বরং ডাকিনীবিদ্যা বা যাদুবিদ্যা চর্চাকারীরা অপরিসীম খ্যাতি অর্জন ও সমর্থকদেরকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তারা প্রায়ই নিজেদেরকে অলৌকিক শক্তি ও স্রষ্টার গুণাবলীর অধিকারী বলে দাবী করে থাকে।

---

[১] ইমাম বুখারী তাঁর *ইতিহাস*গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

স্রষ্টা জাগতিক সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এবং সীমা বহির্ভূত

আল্লাহ্ তা'আলা কে, তিনি কোথায়, তাঁর গুণাবলী কী কী -এতদসংক্রান্ত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অবগত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ যেন আল্লাহ্কে বিশুদ্ধ উপায়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, এ কারণে অতি মহান ও মহিমাময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহ এবং নাবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন। জ্ঞান এবং ধারণ ক্ষমতায় মানুষের ধীশক্তি যেহেতু অতি সীমিত, ফলে সসীম বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অসীম কোন কিছুকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষ যেন সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টার সুন্দরতম গুণাবলীকে গুলিয়ে না ফেলে, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গুণাবলী মানুষকে অবহিত করার দায়িত্ব অত্যন্ত করুণাবশত নিজেই গ্রহণ করেছেন। সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সঙ্গে আল্লাহ্র গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কার্যত সৃষ্টির উপরে স্রষ্টার গুণাবলী আরোপ করে থাকে। আর এ ধরণের গুণাবলী আরোপই সকল প্রকার পৌত্তলিকতার মূলে সক্রিয় রয়েছে। প্রতিটি পৌত্তলিক ধর্ম ও মতাদর্শে সাধারণত সৃষ্ট প্রাণী বা বস্তুর উপর মিথ্যাপূর্ণভাবে অলৌকিক গুণাবলী আরোপ করা হয়। ফলত সেগুলো পরিণত হয় উপাসনার কেন্দ্ররূপে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত বা আল্লাহ্র পাশাপাশি এদের উপাসনা করা হয়।

'আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু উপাসনার জন্য প্রত্যাখ্যাত এবং একমাত্র তিনিই সকল ইবাদাতের যোগ্য'- এটিই আল্লাহ্র অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ। গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মু'তাযিলা দর্শনের অনুসারীদের উদ্ভবের কারণে মুসলিমরা আল্লাহ্র এ বিশেষ গুণটি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছিল এবং বর্তমানেও অনেক মুসলিম এ বিভ্রান্তি ধারণ করে আছে।[১] এ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে *আল-'উলূ* যার অর্থ সর্বোচ্চ বা আল্লাহ্ জাগতিক

---

[১] নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *মুখ্তাছার আল-'উলূ,* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১), ২৩ পৃ.।

সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে এবং বাইরে। আল্লাহ্কে বর্ণনা করতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টির সীমা বহির্ভূত। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নন অথবা কোন সৃষ্টির অংশ বা অংশবিশেষ কোনক্রমেই তাঁর ঊর্ধ্বে নন। তিনি সৃষ্টিজগতের কোন অংশও নন অথবা সৃষ্টিজগতও তাঁর কোন অংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সত্তা সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও বিছিন্ন। তিনিই স্রষ্টা এবং সমগ্র মহাবিশ্ব ও এর মধ্যস্থিত সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির অংশবিশেষ মাত্র। যা হোক, আল্লাহ্র গুণাবলী কোনক্রমেই তাঁর সৃষ্টির মতো সসীম নয়, বরং তা অসীম। তিনি দেখেন, শ্রবণ করেন এবং সব কিছুই জানেন। সৃষ্টজগতে সংঘটিত সকল কিছুর মূল কারণ তিনিই। কিছুই ঘটে না একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত। অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম মূলত দ্বৈতবাদীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও ভিন্ন। আর এটিই পূর্ণ একত্ববাদ। এ দ্বৈতবাদীসুলভ ধারণায় স্রষ্টা তো স্রষ্টাই এবং সৃষ্টি তো সৃষ্টিই। দুটি পৃথক সত্তা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। অসীম ও সসীম। কোনক্রমেই একটি অন্যটির পরিপূরক নয় অথবা উভয়ই এক নয়। একই সময়ে ইসলাম দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র একত্বের ধারণা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে এক; তাঁর কোন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি বা অংশীদার নেই। তিনি শক্তি ও ক্ষমতায় এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই। একমাত্র তিনিই এ মহাবিশ্বের সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক ও উৎস।[১] সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। একইরূপ, সৃষ্টির সাথে

---

[১] কারো ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে অনুযায়ী যখন তিনি কোন দল বা গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসাবার ইচ্ছা করেন, তখন জনগণের অন্তরকে সে দলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট করে দেন। তাই তারা স্বেচ্ছায় অথবা কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও তাদেরকে ভোট দেয় এবং এ প্রক্রিয়ায়ই সে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে যেহেতু জনগণ কোন দলকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য ভোট দিতে পারে না, সেহেতু ক্ষমতার মূল মালিক হলেন তিনিই, জনগণ নয়। সে-জন্য কেউ যদি এ কথা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পিছনে আল্লাহর কোন হাত নেই এবং জনগণই এর সব কিছুর মালিক, তবে তার এ ধারণা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। এমন ধারণা না নিয়ে বললে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কথাটি আপত্তিকর হওয়ায় তা শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরণের কথা বলার বিষয়টি শর'য়ী দৃষ্টিতে গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম ধারার প্রথম প্যারাতে এ জাতীয় সিদ্ধান্তই গৃহীত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি হল: 'All powers in the Republic belong to the people and their exercise on behalf of the people shall be effective only under, and by the authority of this Constituion' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ৬) জনগণকে এ ধরণের ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: *'সকল ক্ষমতার মালিক কেবল আল্লাহ্।'* [সূরা বাক্বারা (২): ১৬৫] *'বল, হে আল্লাহ্!*

সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তিনি দৃঢ়ভাবে একক, কারণ এ মহাবিশ্বের সবকিছু এবং এর মধ্যস্থিত বস্তুনিচয়কে তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন। সকল প্রাণী এবং সত্তা সেই একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্টি।

তাৎপর্যঃ

'স্রষ্টা জাগতিক সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে ও আয়ত্ত বহির্ভূত' -একমাত্র স্রষ্টার ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ গুণটির বিশেষত্ব রয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে এ মহান গুণের তাৎপর্য থেকে মানুষ মারাত্মক পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা দাবী করত যে, রক্ত-মাংসের শরীরবিশিষ্ট মানুষের রূপে নাবী ঈসা (যিশু) ﷺ হিসেবে স্রষ্টা পৃথিবীতে আগমন করেছিল এবং যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তাদের পূর্বে ইহুদীরা দাবী করত যে, মানবীয়রূপে আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ইয়াকুব ﷺ-এর সঙ্গে কুস্তি প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন।[১] পারস্যবাসীরা তাদের রাজাদেরকে আল্লাহ্র গুণাবলীসম্পন্ন গণ্য করত। এর ফলে তারা সরাসরি রাজাদের পূজা করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করত যে, সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্মা সর্বত্র এবং সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান। তাই, ব্রহ্মার প্রকাশ হিসেবে তারা মানুষ, প্রাণীসহ অসংখ্য মূর্তির পূজা করে।[২] আসলে, এ বিশ্বাসটি হিন্দুদেরকে এমন এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে যে, পুরুষের উত্থিত লিঙ্গকে *'শিব'* নামে অভিহিত করা হয়েছে। এটার প্রতি মুগ্ধ হয়ে ভালবেসে *'লিঙ্গম'* বলা হয়। উপরন্তু একে মূর্তিতে রূপ দেয়া হয়েছে এবং এ মূর্তির পূজা করতে তাদের কথিত পবিত্র নগরী বেনারসে তীর্থযাত্রা করে থাকে।[৩]

হে ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আবার যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত কর, তোমার হাতেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি, তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' [সূরা আলি-ইমরান (৩): ২৬] (বিস্তারিত দেখুন: *'শির্ক কী ও কেন?'*, ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী, পৃ. ২৬৬-৩৫৭) -*অনুবাদক*

[১] জেনেসিস ৩২: ২৪-৩০

[২] John R. Hinnells, *Dictionary of Religions,* (England: Penguin Books, 1984), ৬৭-৬৮ পৃ.।

[৩] *Collier's Encyclopedia,* দ্বাদশ খণ্ড, ১৩০ পৃ.; শান্ত রামের নিবন্ধ দেখুন `Banarash: India's City of Light' *National Geographic,* ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ২৩৫ পৃ.। "দ্বৈত স্বভাবের দেবতা শিব, এ দেবতা ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় কাজ সম্পন্ন করে। সাধারণত 'লিঙ্গম' হচ্ছে পাথর থেকে আকৃতি দেয়া এমন এক লিঙ্গমূর্তি যা পুরুষের সমুত্তেজিত লিঙ্গের প্রতীক এবং একে উৎপাদন-শক্তির প্রতীকরূপে উপাসনা করা হয়। প্রকাণ্ড লিঙ্গম মূর্তির বিদ্যমানতা মন্দিরগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যোনি (নারীর যৌনাঙ্গ) নামক এক গোলাকার ভিতের উপর লিঙ্গমগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থাপিত যা শক্তি দেবতার অর্ধেক মহিলাংশ এবং অলৌকিক শক্তির উৎস হিসেবে উপস্থাপিত হয়। ব্যাপকার্থে লিঙ্গম সমগ্র হিন্দু বিশ্বের সম্পূর্ণতাকেই প্রতীকায়িত করে...। হিন্দুদের সাধারণ অনুষ্ঠানে তারা একটি লিঙ্গকে ফুল দিয়ে শোভিত করে, ঘি মাখায় এবং দুধ ও পানি দ্বারা ধৌত করে!"

'ব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান'- হিন্দুদের এ বিশ্বাসটি পরবর্তীতে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয়। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর বহু শতাব্দি পর শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনগণের মধ্যেও এ বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটে। ভারতবর্ষ, পারস্য ও গ্রীক দেশের দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থগুলো আব্বাসীয় স্বর্ণযুগে অনুবাদ করা হলে *'আল্লাহ্ সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান'*- এ মতাদর্শ দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডিতে প্রবেশ করে এবং সুফীতন্ত্রের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। অবশেষে, মু'তাযিলা (যুক্তিবাদী) নামে সুপরিচিত দর্শনভিত্তিক অনুসারীরা বিশেষ করে যারা আব্বাসীয় খলীফা মামুনের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে ছিল তারা এ তন্ত্রের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। খলিফার সহায়তায় তারা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে তাদের বিকৃত দর্শনকে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করে। সারা রাজ্য জুড়ে আদালত বসিয়ে মু'তাযিলা দর্শনের বিরোধিতা করার দায়ে সত্যপথের অনুসারী ও মূলধারার বহু ইসলামী বিদ্বানকে মৃত্যুদণ্ড, জেল ও অমানুষিক নির্যাতন করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (৭৭৮-৮৫৫ খ্রি.) সর্বপ্রথম নিজ অবস্থানে দৃঢ়তা অবলম্বন করে ইসলামের প্রথম যুগের বিদ্বান ও সাহাবীদের সমর্থন করেন। ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে সকল মু'তাযিলা দার্শনিকদেরকে সরকারী প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ নিশ্চিত করা হয় এবং তাদের বিকৃত মতাদর্শকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। মু'তাযিলাদের অধিকাংশ ভ্রান্ত মতবিশ্বাসের বিলুপ্তি ঘটলেও, *'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'*- এ মতাদর্শটি এখনও আশ'আরিদের[1] মধ্যে টিকে রয়েছে। মু'তাযিলা

[1] এ মতাদর্শের অনুসারী ধর্মতত্ত্বের দলটির নামের উৎপত্তি হয়েছে আবুল-হাসান আল-আশ'আরী (৮৭৩-৯৩৫ খ্রি.)-এর নামানুসারে। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ব'লে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মু'তাযিলা মতাদর্শের বিদগ্ধ পণ্ডিত আল-যুবাই-এর অন্যতম ঈর্ষণীয় ছাত্র ছিলেন। হাদীছ বিষয়ে অধ্যয়ন করে ইসলামী মূল দর্শন এবং মু'তাযিলা মতাদর্শের মধ্যে বিরাজমান অসঙ্গতিসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হলে এক নতুন দর্শনের (কালাম) গোড়াপত্তন করেন। মধ্যযুগীয় দর্শন নামক আশ'আরীয় মতাদর্শের জনক বলে তাকে অভিহিত করা হয়। তার সর্বাধিক খ্যাত কর্ম হচ্ছে *আল-ইবানাহ 'আন উসূল আদ-দিয়ানাহ* (অনুবাদ করেন W.C. Klein, New Haven, 1940) এবং *মাক্বালাত আল-ইসলামিইয়ীন* (কায়রোঃ মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিসরীয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯)। জীবনের শেষ ভাগে এসে আল-আশ'আরী তার মধ্যযুগীয় দর্শন পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে হাদীছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তবে, অন্য ধর্মতাত্ত্বিকগণ বিশেষকরে শাফেয়ী' মাযহাবের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁর পূর্ববর্তী মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে, ফলে আশ'আরী মতাদর্শ নবজীবন লাভ করে। আল-আশ'আরী কৃত ভুল যুক্তিসমূহকে খণ্ডন করে আল-বাক্বিলানি (মৃত্যু ১০১৩) *আশ'আরী* মতাদর্শের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি দাঁড় করান। তারপর বিতর্কিত বিষয়গুলোকে একত্রিত করেন। তার পরবর্তী *আশ'আরী* মতাদর্শের প্রধান বলে খ্যাত হয়েছেন ইমাম আল-হারামাইন (আল-জুওয়াইনি, মৃত্যু ১০৮৬), আল-গাযযালী (মৃত্যু ১১১২) এবং আর-রাযী (মৃত্যু ১২১০) *(Shorter Encyclopedia of Islam, ৪৬-৪৭ পৃ. ও ২১০-২১৫ পৃ.)*

মতাদর্শ ত্যাগ করে এর দার্শনিক ভিত্তিকে খণ্ডন করার উদ্যেগ গ্রহণকারীরা আশ'আরি মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন।

'সর্বব্যাপী' মতবিশ্বাসে নিহিত বিপদ

'স্রষ্টা সর্বব্যাপী' -এ মিথ্যা ও ভ্রান্ত গুণাবলীর ভিত্তিতে অনেকেই দাবী করে যে, অন্যান্য প্রাণী, গাছপালা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতির তুলনায় স্রষ্টা তাঁর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষের মধ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এ তত্ত্বকে ভিত্তি করে আবার কেউ কেউ এ রকম দাবী করেছিল যে, হুলূল (মানুষের মধ্যে স্রষ্টার বসবাস) অথবা ইত্তিহাদ (স্রষ্টার আত্মার সঙ্গে মানুষের আত্মার সম্পূর্ণ একাত্মতা)-এর কারণে অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্রষ্টা তাদের মাঝেই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশিই বিরাজমান। নবম শতাব্দির মুসলিমদের মধ্যে তথাকথিত মানসিক বিকারগ্রস্ত সাধক এবং দরবেশ আল-হাল্লাজ (৮৫৮-৯৯২ খ্রি.) প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সে-ই আল্লাহ্।[১] দশম শতাব্দীতে শি'আ মতাদর্শ হতে বিচ্যুত নুসাইরিয়্যাগণ দাবী করেছিল যে, রাসূলের জামাই 'আলী ইবনু আবী ত্বালিবের মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।[২] একাদশ শতাব্দীতে শিআ' দলত্যাগকারী দ্রুজ নামে অন্য আরেকটি দলের অনুসারীরা দাবী করেছিল মানুষরূপী স্রষ্টার শেষ আবির্ভাব ঘটে ফাতেমীয় শি'আ খলীফা আল-হাকিম বিন আমরিল্লাহ-এর মাধ্যমে।[৩] দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনু আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রি.) নামে তথাকথিত আরেক সুফী তার মতাদর্শের অনুসারীদেরকে তাঁর রচিত কবিতার মাধ্যমে নিজেদের ব্যতীত অন্য কারো নিকটে প্রার্থনা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল; কারণ সে বিশ্বাস করত যে, স্রষ্টা মানুষের মাঝেই বিদ্যমান।[৪] আমেরিকার ইলিজাহ মুহাম্মাদ (মৃত্যু ১৯৭৫ খ্রি.) কর্তৃক

---

[১] A.J. Arberry, *Muslim Saints and Mystics,* (London: Routledge and Kegan Paul, 1976, ২৬৬-২৭১ পৃ.।

[২] *Shorter Encyclopedia of Islam,* ৪৫৪-৪৫৫ পৃ.।

[৩] তদেব, ৯৪-৯৫ পৃ.।

[৪] আল্লাহ্ তা'আলাকে ইবনে 'আরাবী বর্ণনা করেন, 'মহিমা তাঁরই, যিনি সকল কিছুর সত্তা হওয়ার পর সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।' অন্য কথায়, 'সেই সত্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল কিছু সৃজন করেছেন এবং যিনি স্বয়ং এ সকল কিছুর মূল সত্তা।' (ইবনু 'আরাবী, *আল-ফুতূহাত আল-মাক্কিয়্যাহ,* ২য় খণ্ড, ৬০৪ পৃ. দেখুন।) এ কবিতায়ও তাঁর একই ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে, 'হে স্বীয় সত্তায় বস্তুসমূহের স্রষ্টা! তুমি তোমার সৃষ্টিসমূহকে একত্রকারী, তুমি এমন বস্তু সৃজন কর, যার অস্তিত্ব তোমাতে নিঃশেষ হয় না, তুমিই সসীম এবং তুমিই অসীম। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮) 'আব্দুর রাহমান আল-ওয়াকীল তাঁর *হাযিহী হিয়া আস-সূফীয়্যাহ* নামক গ্রন্থে ইবনু আরাবী সম্পর্কে এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন। (মাক্কাহ: দার আল-কুতুব আল-'ইলমীয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯) ৩৫ পৃ.।

উত্থাপিত দাবীতেও এই মতাদর্শের মূলকথার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সে দাবী করেছিল যে, প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যেই আল্লাহ্ বিদ্যমান রয়েছে এবং তাঁর গুরু ফার্দ মুহাম্মাদ স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্।[১] ১৯৭০ সালে গায়ানার রেভারেন্ড জিম জোন্স তার ৯০০ অনুসারীসহ নিজেকে হত্যা করেন- এ ঘটনাটি নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবী করা এবং তা মানুষ কর্তৃক গ্রহণ করা সম্পর্কে অতিসাম্প্রতিক উদাহরণসমূহের অন্যতম। বস্তুত, নিজেকে *'Father Divine'* (পবিত্র পরমপিতা) বলে অভিহিতকারী এক মার্কিনির নিকট থেকেই জিম জোন্স তার দর্শন ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ব করেছিল। নিরীহ মানুষগুলোকে ব্যবহার করে নিজের হীন উদ্দেশ্য পূরণ করাই তার মতাদর্শের মূলকথা ছিল। জর্জ বেইকার হল *'Father Divine'* (পবিত্র পরমপিতা)-এর আসল নাম। ১৯২০ সালের পূর্বের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে তার আবির্ভাব ঘটে এবং গরীব-দুঃখীদের জন্য সে ভোজনালয়ের ব্যবস্থা করে। এভাবে প্রথমে সে লোকজনের পেট জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। আর এ মহা সুবর্ণ সুযোগে সে নিজেকে মানবরূপী-স্রষ্টা বলে দাবী উত্থাপন করে। ইতোমধ্যে এক কানাডীয় নারীকে সে বিয়ে করে এবং তার নাম রাখে *'Mother Divine'* (পবিত্র পরম-মাতা)। ১৯২৫ সালের মধ্যেই তার এ মতাদর্শের অনুসারীর সংখ্যা দশ লক্ষ অতিক্রম করে এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, এমনকি ইউরোপেও তার অনুসারীদের দেখা মিলে।[২]

কোন সুনির্দিষ্ট স্থান বা ধর্মের মানুষের মধ্যে 'স্রষ্টা রূপে পরিগণিত হওয়া সম্পর্কিত'- এ ধরণের দাবীগুলো সীমাবদ্ধ থাকে নি। আদতে উর্বর ক্ষেত্র পাওয়া মাত্রই তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মানবরূপী স্রষ্টাকে গ্রহণ করতে কারো অন্তর যদি ইতোমধ্যেই 'সৃষ্টিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিদ্যমানতা' নামক ভ্রান্ত মতবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে স্রষ্টা হওয়ার দাবীদারদের খপ্পরে পড়ে খুব সহজেই সে তাদের অনুসারীতে পরিণত হয়।

অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, *'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'*- এ মতবিশ্বাসটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, এ ভ্রান্ত বিশ্বাসটি কেবল শির্ক করতে মানুষকে উৎসাহিত বা সমর্থনই করে না, বরং এ কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন অসার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। যদিও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ও জঘন্যতম পাপ শির্ক যার অর্থ *'আল্লাহ্ ব্যতীত বা আল্লাহ্র পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির ইবাদাত*

---

[১] Elijah Muhammad, *Our Saviour Has Arrived* (Chicago: Muhammad's Temple of Islam, 1974), ২য় খণ্ড, ২৫, ৫৬-৫৭, ৩৯-৪৬ পৃ.।

[২] E.U., Essien-Udom, *Black Nationalism,* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), ৩২ পৃ.।

করা'। তাছাড়া, এ দর্শনের দ্বারা যেহেতু স্রষ্টার ওপর এমন সব গুণাবলী আরোপ করা হয় যার সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তাই এটি *তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*-এ শির্কের অন্যতম এক রূপ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত হাদীছে উক্ত গুণাবলী সম্পর্কিত কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ এ মতের বিপরীত বিষয়সমূকেই নিশ্চিত করে।

সুস্পষ্ট প্রমাণাদি

আল্লাহ্ ব্যতীত অথবা তাঁর সঙ্গে অন্য কারও ইবাদাত করাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ও জঘন্যতম গুনাহ। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুই সৃষ্টি, তাই ইসলামের মূলনীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সৃষ্টির ইবাদাত বা উপাসনা করা নিষিদ্ধ। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোতে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যসমূহ খুবই স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। *আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট সৃষ্টিকুল হতে পুরোপুরি পৃথক এবং উর্ধ্বে*- এ আক্বীদা তথা বিশ্বাসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মূলধারার সত্যিকারের বিদ্বানগণ মূল ইসলামের বিভিন্ন প্রমাণাদির উপর নির্ভর করেছেন। নিম্নে সাতটি প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

১. প্রাকৃতিক প্রমাণ ঃ

ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষ কেবল তার পরিবেশের উৎপাদন বিশেষই নয়, বরং সে কিছু 'সহজাত প্রবৃত্তি' *(Instinct)* বা 'জন্মগত স্বভাব' *(Innate Character)* নিয়ে জন্মলাভ করে। এ বাস্তব সত্যটির ভিত্তি কুরআনের সেই আয়াতসমূহ যেখানে আল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আদমকে সৃষ্টি করার পর তিনি আদমের সকল বংশধরদেরকে আদম হতেই বের করে তাঁর (আল্লাহ্‌র) একত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।[১] এ বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর হাদীছ দ্বারা আরো অধিকতর জোরালো হয়,

'প্রতিটি নতুন শিশু একমাত্র আল্লাহ্‌কে ইবাদাত করার সহজাত প্রবৃত্তি (ফিতরাত) নিয়েই জন্মলাভ করে, কিন্তু শিশুটির বাবা-মা তাকে ইহুদী, চন্দ্র-সূর্য বা অগ্নি উপাসক[২] বা খ্রিস্টান হতে সাহায্য করে এবং অবশেষে সে তা-ই হয়।'[১]

---

[১] সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৭২

[২] এ হাদীছে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে 'মাগূছ' যার অর্থ যদিও 'যাদুকর' বা 'ভেল্কিবাজ', তথাপি হাদীছ তথা ইসলামী পরিভাষায় 'মাগূছ' বলতে মূলত চন্দ্র-সূর্য বা অগ্নি উপাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যদিও তা যাদুকরদেকেও অন্তর্ভূক্ত রাখে। (দেখুন, মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা, আরবী-ইংরেজি, পৃ. ৩৪৮, ৫৯৭।)

উপরোক্ত হাদীছকে ব্যবহার করে অনেকেই *'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'*-এ মতাদর্শের সত্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান থাকে, তবে এর ফলস্বরূপ এ কথা বলা যায় যে, তাঁর অস্তিত্ব ময়লা-আবর্জনা এবং নোংরা স্থানেও থাকবে। এ রকম ভাবতে অধিকাংশ মানুষের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তারা কোনক্রমেই এমন কোন বর্ণনাকে গ্রহণ করবে না যা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মলমুত্র বা এ ধরণের কোন বস্তু অথবা তাঁর মর্যাদার জন্য অনুপযুক্ত এমন স্থানে বিরাজমান। ফলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, *'আল্লাহ্ সর্বত্র* বিরাজমান'-এ দাবীটি আল্লাহ্ কর্তৃক স্থাপিত মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা নামক গুণটির মাধ্যমেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। সুতরাং এ ধরণের ভ্রান্ত দাবী সত্য হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। উক্ত ত্রুটিপূর্ণ মতবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী লোকেরা তর্কে লিপ্ত হতে পারে যে, এ দর্শনের প্রতি মানুষের বিকর্ষণ মূলত সহজাত প্রবণতা নামক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির স্বাভাবিক ফল নয়, বরং এর পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে শৈশব-কৈশোরকালীন শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কারণ, ব্যক্তির মানস গড়ে ওঠে তাঁর পরিবার, শৈশব, প্রতিবেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে। অথচ *'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'*-এ মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা অনেক পূর্ব থেকেই লাভ করা সত্ত্বেও সর্বাধিক সংখ্যক অল্পবয়স্ক কচি ছেলেমেয়েরা কোন দ্বিধা-সংকোচ বা এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা ব্যতিরেকে আপনা হতেই এ ভ্রান্ত দর্শনটিকে প্রত্যাখ্যান করে।

২. প্রার্থনা থেকে প্রমাণ

ইবাদাত করার ইসলামী বিধান অনুসারে সলাত আদায়ের স্থানসমূহকে মূর্তি, স্রষ্টা বা তাঁর সৃষ্টির চিত্র হতে মুক্ত রাখতে হবে। সলাতে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন রুকূ', সিজদা ইত্যাদি একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সকল স্থান ও বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের মাঝে স্রষ্টা বিরাজমান থাকলে, *'লোকজন একে অপরকে উদ্দেশ্য করে এমনকি মানুষ স্বয়ং নিজেকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করবে'* বলে যে তথাকথিত দাবী অখ্যাত সুফী ও দার্শনিক ইবনে 'আরাবী কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণীয় হতো। মূর্তি, গাছ বা কোন প্রাণী পূজারী ব্যক্তিকে যুক্তিসম্মতভাবে

---

[১] আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। ***বুখারী*** (আরবী-ইংরেজি), ৮ম খণ্ড, ৩৬৯-৩৭০, হাদীছ নং ৫৯৭ এবং ***মুসলিম*** (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১৩৯৯ পৃ., হাদীছ নং ৬৪২৯।

বুঝানোর জন্য যদি বলা হয় যে, উপাসনা করার জন্য গৃহীত এ পদ্ধতিটি ভুল বিধায় এটি প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র উপাসনা করা উচিত সেই অদৃশ্য স্রষ্টা আল্লাহ্‌র, যিনি কোন শরীকবিহীন এক ও অদ্বিতীয়। জবাবে সে অবশ্যই বলবে, 'আমি এই মূর্তিকে নয় বরং এ মূর্তির মধ্যস্থিত স্রষ্টার অংশবিশেষকে অথবা প্রাণী বা মানুষরূপে আবির্ভূত স্রষ্টাকে পূজা করছি।' এ মতাদর্শের পক্ষে হাজারো যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম কাফির বলে আখ্যা দিয়েছে। বস্তুত এ ধরণের মানুষ স্রষ্টার নগণ্য সৃষ্টির সামনে সিজদাবনত হয়। মানুষসহ অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনা বন্ধ করে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের প্রতি ফিরে আনতেই ইসলামের আগমন ঘটেছে। এ কারণে ইবাদাত সম্পর্কে ইসলামের বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান নন; সৃষ্টি হতে স্রষ্টা আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে পৃথক। *'স্রষ্টা অথবা প্রাণী জগতের জীবন্ত কোন কিছুর চিত্র অংকণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ'*- এ বিধানের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে ইসলামের অবস্থান আরও দৃঢ়তর হয়।

৩. মিরাজ দ্বারা প্রমাণ

মদীনায় হিজরতের দু'বছর পূর্বে রাসূল ﷺ মক্কার মসজিদে হারাম (মক্কা মুকার্‌রমা) থেকে জেরুজালেমের মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত অলৌকিকভাবে রাতের বেলা ভ্রমণ (ইসরা) করে সেখান থেকে তিনি সাত আসমানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির শীর্ষে গমন (মি'রাজ)[১] করেন। রাসূল ﷺ-এর জন্য এ অলৌকিক ভ্রমণের বন্দোবস্ত করার পিছনে মূল উদ্দেশ্যে ছিল তিনি যেন আল্লাহ্‌র সম্মুখে সরাসরি উপস্থিত হতে সক্ষম হন। রাসূল ﷺ সাত আসমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর উম্মতের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (আনুষ্ঠানিক ইবাদাত) বাধ্যতামূলক (ফরয) করার বিধান জারি করেন, তাঁর ﷺ সঙ্গে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁর ﷺ ওপর *সূরা আল-বাকারার* (কুরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।[২] আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান থাকলে রাসূল

---

[১] *মি'রাজ* নামক এ শব্দ (বিশেষ্য) দ্বারা মূলত সেই বাহন বুঝায় যা রাসূল ﷺ-কে আসমানের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করিয়েছিল। তবে, এ ঊর্ধ্বারোহণকে সাধারণত *মি'রাজ* নামে অভিহিত করা হয়। (Lan's, *Arabic-English Lexicon,* ২য় খণ্ড, ১৯৬৬-৬৭ পৃ. দেখুন)

[২] রাসূল ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন: ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৪৪৯-৪৫০ পৃ., হাদীছ নং ৬০৮ এবং ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১০৩-১০৪ পৃ., হাদীছ নং ৩১৩।

ﷺ-এর আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। বরং তিনি ﷺ এ পৃথিবীতে তাঁর নিজের বাড়িতে অবস্থান করেই সরাসরি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হতে পারতেন। সুতরাং সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-এর অলৌকিক এ সফরের ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সুগভীরতম ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং কোনক্রমেই তাঁর সৃষ্টির অংশবিশেষ নন।

৪. কুরআন দ্বারা প্রমাণ

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে'- এ সম্পর্কে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে এ আয়াতসমূহ সম্পূর্ণ কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই রয়েছে। *'আল্লাহ্‌র দিকে কোন কিছু উত্তোলিত হয় অথবা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়'*- এমন বর্ণনা যে সব আয়াতে রয়েছে, সেগুলোকেই মূলত প্রচ্ছন্ন আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সূরা ইখলাছের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়, এ সূরাটিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে *আস-সমাদ*[1] নামে ঘোষণা দিয়েছেন। *আস-সমাদ* হচ্ছে তিনি যাঁর নিকট অবলম্বন বা আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।[2] কিছু ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন ফিরিশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾﴾

(سورة المعارج: ٤)

"মালাক এবং রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" [সূরা আল-মা'আরিজ (৭০): ৪]

কিছু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক, যেমন সলাত, দু'আ ও যিকর সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿...إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ... ﴿١٠﴾﴾ (سورة فاطر: ١٠)

"...তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কথাগুলো আর সৎকাজ সেগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে...।" [সূরা আল-ফাত্বির (৩৫): ১০]

---

[1] সূরা ইখলাছ (১১২): ২

[2] The Hans Wher Dictionary of Modern Written Arabic, *Edited by J.M. Cowan*, পৃ. ৫২ এবং Arabic English Dictionary by *Wortebet Porter*, পৃ. ১৭৭।

এমনকি নিচের আয়াতেও একইরূপ বলা হয়েছে:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴿٣٧﴾﴾ (سورة غافر: ٣٦-٣٧)

"ফির'আউন বলল— হে হামান! তুমি আমার জন্য এক সুউচ্চ ইমারত তৈরি কর যাতে আমি উপায় পেয়ে যাই, আকাশে উঠার উপায়, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই; আমি মূসাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী মনে করি।"
[সূরা গাফির (মু'মিন) (৪০): ৩৬-৩৭]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট হতে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ (سورة النحل: ١٠٢)

"বল, 'এ কুরআন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রূহুল কুদুস (জিবরীল) ঠিক ঠিকভাবে নাযিল করেছেন ঈমানদারদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং মুসলিমদের হিদায়াত ও সুসংবাদ দানের জন্য।' "

[সূরা আন্-নাহল (১৬): ১০২]

আল্লাহ্র সুন্দরতম নামগুলোতে এবং তাঁর পরিষ্কার বাণীসমূহতে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে العلي *'আল-'আলী'* এবং الأعلى *'আল-'আলা'* বলে অভিহিত করেছেন। এ দুটি শব্দের অর্থ *সর্বোচ্চ,* যার উর্ধ্বে কিছুই নেই। যেমন, *"আল-'আলিউল 'আযীম"*[1], *"রাব্বিকাল-আ'লা"*[2]। তাছাড়া, তিনি নিজেকে তাঁর বান্দাদের ঊর্ধ্বে বলেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ... ﴿١٨﴾﴾ (سورة الأنعام: ١٨)

---

[1] সূরা আল-বাক্বারা (২): ২২৫

[2] কুরআন ৮৭: ১ এ সম্পর্কে আরও আয়াত হল: নিসা (৪): ৩৪; রা'দ (১৩): ৯; বানী ইসরাঈল (১৭): ২১; ত্ব-হা (২০): ১১৪; হাজ্জ (২২): ৬২; নূর (২০): ৪৫; রূম (৩০): ২৭; লুক্বমান (৩১): ২৭; সাবা (৩৪): ২৩; মু'মিন (৪০): ১২, ১৫; শূরা (৪২): ৪।

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল... ।" [সূরা আল-আন'আম (৬): ১৮ এবং ৬১]

তিনি তাঁর ইবাদাতকারীদের সম্পর্কে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ... ﴿٥٠﴾﴾ (سورة النحل: ٥٠)

"তারা সেই আল্লাহকে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে রয়েছেন... ।"
[সূরা আন্-নাহল (১৬): ৫০]

একাগ্রচিত্তে মনোযোগ সহকারে কুরআনকে পর্যবেক্ষণকারী যে কোন ব্যক্তির নিকটে কুরআন নিজেই সুস্পষ্টভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপস্থাপন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিস্তর উর্ধ্বে এবং তাঁর কোন সৃষ্টিই তাঁকে পরিবেষ্টিত করে নি বা তিনিও কোন সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান নন।[১]

৫. হাদীছ দ্বারা প্রমাণঃ

রাসূল ﷺ-এর অসংখ্য হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে বা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান নন। কুরআনের আয়াতসমূহের মতো হাদীছেও কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বর্ণনা রয়েছে। *'ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বারোহণ করেন'* বলে যে সব হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকেই মূলত পরোক্ষ বর্ণনা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বণিত হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন,

'রাতে এবং দিনে তোমার সঙ্গে একদল ফিরিশতা অবস্থান করে। তারপর রাতের ও দিনের ফিরিশতারা ফজর ও আছরের ছলাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফিরিশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এলে? -যদিও তিনি সবকিছু অবগত।...'[২]

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে 'আরশে 'আযীমে উন্নীত'- এ সম্পর্কিত হাদীছও পরোক্ষ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের বর্ণনার একটি উদাহরণ আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীছে পাওয়া যায়।

---

[১] *আল- 'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যাহ,* ২৮৫-৬ পৃ.।

[২] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৩৮৬-৭ পৃ., হাদীছ নং ৫২৫; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনু.), ১ম খণ্ড, ৩০৬-৭ পৃ., হাদীছ নং ১৩২০; নাসাঈ, মিশকাত, হাদীছ নং ৬২৪, ৬২৫-৬।

উক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন,

'সকল সৃষ্টি সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'আরশে 'আযীমে উন্নীত হয়ে একটি পুস্তকে লিখেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্রোধের অগ্রে থাকবে।'[১]

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিতে এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকটে যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) গর্ব করে বলতেন যে, তাঁদের পরিবার তাঁদেরকে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সাত আসমানের উর্ধ্ব হতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিয়ে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দিয়েছেন।'[২]

এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বর্ণনার উল্লেখ একটি দু'আয় (প্রার্থনা) রয়েছে, যে দু'আর মাধ্যমে নিজেদের সুস্থতা লাভ করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করতে অসুস্থ লোকদেরকে রাসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন,

رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ...

'রব্বানাল্লাহ্ আল্লাজী ফিস্ সামা-ই তাক্বাদ্দাস আসমুকা...'

'হে আসমানের উপরে উন্নীত আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, তোমার নাম পবিত্র হোক...'[৩]

প্রত্যক্ষ তথ্যসূত্রসমূহের মধ্যে নিম্নের হাদীছটিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। মু'আবিয়া ইবনু আল-হাকাম বলেন,

'আমার একটি দাসী ছিল। উহুদ পাহাড় এলাকায় আল-জাওয়ারিয়্যা নামক এক জায়গার সন্নিকটে সে ভেড়া চরাত। একদিন আমি এসে দেখতে পেলাম যে, নেকড়ে বাঘ তার ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়াকে নিয়ে গেছে। আদমের অন্যান্য সন্তানের মতো আমিও কষ্টদায়ক কর্মপ্রবণ ছিলাম বলে দাসীটির মুখে সজোরে থাপ্পড় মারলাম। তারপর রাসূল ﷺ-এর নিকটে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি এ কাজটিকে আমার জন্য খুব গুরুতর বলে গণ্য করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ, তাকে কি আমি মুক্ত করে দিতে পারি না? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'আমার নিকটে তাকে নিয়ে এসো? তাই আমি তাকে

---

[১] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৩৮২-৩ পৃ., হাদীছ নং ৫১৮ এবং *মুসলিম* (ইংরেজি), ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩৭ পৃ., হাদীছ নং ৬৬২৮।

[২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৩৮২ পৃ., হাদীছ নং ৫১৮।

[৩] আবূ দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। *সুনান আবূ দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১০৯ পৃ., হাদীছ নং ৩৮৮৩। *(তাহকীক আলবানী আবূদাউদ ৩৮৯২ যঈফ—অনুবাদক)*

নিয়ে এলাম। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ্ কোথায়?' সে উত্তর দিল, 'আসমানের উপরে।' এরপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কে?' সে উত্তর দিল, 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল।' সুতরাং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, নিশ্চয়ই সে বিশ্বাসী (মু'মিনা)।'[১]

'তুমি কি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করো?'- এ যৌক্তিক প্রশ্নটিই হওয়া উচিত কারো বিশ্বাস (ঈমান) পরীক্ষা করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হবে এবং এ জিজ্ঞাসার জবাবে প্রাপ্ত তথ্যের নিরীখে নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে যে, আলোচ্য ব্যক্তিটি বিশ্বাসী (ঈমানদার) কি না। অথচ রাসূল ﷺ এ প্রশ্নটির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। কারণ, তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত।[২] এ সম্পর্কে কুরআনে প্রায়শ উল্লেখিত হয়েছে:

---

[১] *বুখারী, মুসলিম* ও আবূ দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত একটি হাদীছে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, 'কাউকে আঘাত করলে তার মুখমণ্ডলকে এড়িয়ে করো।' (দেখুন, *মুসলিম* (ইংরেজি), ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭৮ পৃ., হাদীছ নং ৬৩২১-৬ এবং *সুনান আবূ দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১২৫৬ পৃ., হাদীছ নং ৪৪৭৮)। রাসূল ﷺ থেকে আরও বর্ণনা রয়েছে যেখানে তিনি বলেন, 'কোন দাসকে থাপ্পড় বা প্রহার করার কাফ্ফারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া'। (*মুসলিম* (ইংরেজি), ৩য় খণ্ড, ৮৮২-৩ পৃ., হাদীছ নং ৪০৭৮)।

[২] মূলত তারা আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রুযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি তথা 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করত। কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ যুগে যুগে আল্লাহ্কে 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করে এসেছে। মুশরিক আরবরাও এ বিশ্বাস রাখত। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাঁর কুরআনে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন: *"তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?' তারা বলে উঠবে, "আল্লাহ্"।"* [কুরআন ১০: ৩১] *"বল : এ পৃথিবী আর তার ভিতরে যা আছে তা কার? (বল) যদি তোমরা জান। তারা বলবে— আল্লাহ্র।"* [কুরআন ২৩: ৮৪-৫] *"বল : সাত আসমান আর মহান আরশের মালিক কে? তারা বলবে : (এগুলোর মালিকানা) আল্লাহ্র।"* [কুরআন ২৩: ৮৬-৭] *"বল : সব কিছুর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার হাতে? তিনি (সবলকে) আশ্রয় দেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয় দাতা নেই, (বল) তোমরা যদি জান। তারা বলবে (সকল কিছুর কর্তৃত্ব) আল্লাহ্র।"* [কুরআন ২৩: ৮৮-৯] *"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— আকাশ হতে কে পানি বর্ষণ ক'রে যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্।"* [কুরআন ২৯: ৬৩] *"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর- আকাশমণ্ডলী ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্।"* [কুরআন ৩১: ২৫] *"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে কে? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।"* [কুরআন ৩৯: ৩৮] *"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— আকাশ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে- ওগুলো প্রবল পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন।"* [কুরআন ৪৩: ৯] *"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।"* [কুরআন ৪৩: ৮৭]

এমনকি তারা তাদের সন্তানদের নাম *'আব্দুল্লাহ, 'আব্দুল মুত্তালিব* ইত্যাদি রাখত। ফলে এ ক্ষেত্রে *সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, কেবল তাওহীদে রবূবিয়াতের উপরে ঈমান আনলেই কেউ মু'মিন হতে* পারে না এবং আখিরাতে মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ না তাওহীদে ইবাদাতের উপরে খালেছ ঈমান পোষণ করে। (আহমাদ ইবনু হাজার, *'তাৎহীরুল জানান'*, ১৬ পৃ.; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, *'মাজমূউল ফাতাওয়া'*, ১ম খণ্ড, ২৩ পৃ.।) -*অনুবাদক*

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...﴾ (٦١)

(سورة العنكبوت: ٦١)

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে- আল্লাহ্...।" [সূরা আল-'আনকাবূত (২৯): ৬১]

তৎকালীন পৌত্তলিক (মুশরিক) মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করত যে, মূর্তিগুলোর মধ্যে কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহ্ বিদ্যমান রয়েছে এবং এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির অংশরূপে পরিগণিত। রাসূল ﷺ নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, উক্ত দাসীটির বিশ্বাস অন্য সকল মক্কাবাসীদের মতো ভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং পৌত্তলিক ধ্যান ধারণার ছিল; নাকি আসমানী বিধানের শিক্ষানুযায়ী সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র একত্বের (তাওহীদ) অনুকূলে ছিল। অতএব রাসূল ﷺ তাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যাতে এ বিষয়টি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয় যে, *'আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কোন অংশবিশেষ নন'*- এ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত; নাকি সে বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যায়। *'আল্লাহ্ কোথায়?'*- এ প্রশ্নের জবাবে চাকরানী প্রদত্ত *'আল্লাহ্ আসমানের উপরে'*- এ তথ্যটিই একমাত্র বৈধ উত্তর হিসেবে সত্যিকারের মুসলিমগণ কর্তৃক অবশ্যই গৃহীত হতে হবে। কারণ, এ উত্তরটিকে ভিত্তি করেই উক্ত দাসীটির প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ নিশ্চিত হয়ে বিধান জারি করেছিলেন। এখনো কিছু মুসলিম যেরূপে অর্থহীন বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, সে অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা যদি সর্বত্র বিরাজমান থাকত, তাহলে *'আসমানের উপরে'*- এ উত্তরে নিহিত ভুল অবশ্যই রাসূল ﷺ সংশোধন করতেন। কারণ, রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে কোন কিছু বলা হলে তা যদি তিনি প্রত্যাখ্যান না করতেন, তাহলে ইসলামী বিধানানুযায়ী সে বিষয়টি অনুমোদিত সুন্নাহ ও বৈধ গণ্য করা হতো। অধিকন্তু মেয়েটির বর্ণনাকে রাসূল ﷺ কেবল গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তাকে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী (মু'মিন) হিসেবে মেনে নিতে ভিত্তিমূল রূপে গণ্য করেছেন।

৬. *যৌক্তিক প্রমাণ*

যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কোন দুটি জিনিস বিদ্যমান থাকলে তাদের একটি অন্যটির একাংশে পরিণত হয়ে এর উপর নিজস্ব গুণাবলীর মতো নির্ভরশীল হয় অথবা অন্যটি হতে গুণগতভাবে ভিন্ন

হয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল হয়। ফলে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যখন এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তখন হয় তিনি এটিকে তাঁর আপন সত্তার মধ্যে নতুবা বাইরে সৃষ্টি করেছেন। প্রথম সম্ভাবনাটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এর অর্থ হয় এ রকম যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম সত্তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতার মতো সসীম গুণাবলী ধারণ করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল অথচ পুরোপুরি সতন্ত্র সত্তারূপে এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আপন সত্তার বাইরে এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন বলে জানা গেল বিধায় বলা যায়, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সত্তার উপরে বা নীচে এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার নিকটে মানুষ প্রার্থনা করতে কখনো নিচের দিকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা সম্পন্ন করে না বরং মানুষের সকল প্রার্থনাই অন্তরের দিক দিয়ে আসমান তথা উর্দ্ধমুখী। তা ছাড়া, সৃষ্টির নিচে স্রষ্টার অবস্থান বুঝানো মানে স্রষ্টার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সত্যতা অস্বীকার করা। কেননা, সৃষ্টির অবস্থান তো অবশ্যই স্রষ্টার নীচে। সুতরাং স্রষ্টা নিশ্চয়ই তাঁর সকল সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং এর উর্ধ্বে।

স্রষ্টা এ বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত নয় অথবা এর থেকে স্বতন্ত্রও নয়, আবার তাঁর অস্তিত্ব এ বিশ্ব চরাচরের মধ্যে নয় অথবা এর বাইরেও নয়[১]- এ ধরণের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য কেবল অযৌক্তিকই নয় বরং স্রষ্টার অস্তিত্বকে আদতে অস্বীকার করার নামান্তর।[২] এ ধরণের দাবি স্রষ্টাকে মানবীয় চিন্তাচেতনার পরাবস্তুবাদী[৩] জগতে অবগাহন করায় যেখানে বিপরীতধর্মী দুটি বস্তুর সহাবস্থান ঘটতে পারে এবং অসম্ভব কোন কিছু বিরাজমান থাকবে (যেমন, একের ভিতর তিন স্রষ্টা)।

৭. *সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী বিদ্বানদের ঐক্যমত্য*

স্রষ্টা জাগতিক সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে 'আরশে 'আযীমে সমুন্নত- এ সম্পর্কিত এত অধিক সংখ্যক দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য প্রকৃত ইসলামের বিদ্বানদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। স্রষ্টা জাগতিক সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এবং সীমা বহির্ভূত- এ বিষয়টিকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণের উদ্দেশ্যে ঈসায়ী পঞ্চদশ শতকের হাদীছের বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী

---

[১] দেখুন *হাসিয়া আল-বিজুরি 'আলা আল-জওহারাহ*, ৫৮ পৃ.।

[২] *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাবীয়্যা, ২৯০-১ পৃ.;* আরও দেখুন, আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর *আর-রাদ 'আলা আল-জাহিমিইয়্যাহ।*

[৩] পরাবস্তুবাদ হচ্ছে এমন এক বিশেষ শিল্প ও সাহিত্যরীতি যা মানুষের অবচেতন মনকে আপাত-বিশৃঙ্খল শিল্পে তথা মগ্নচৈতন্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে, অনেক চিত্রপটে ও লেখনিতে দেখা যায় স্বপ্নের মতো বানানো খাপছাড়া বস্তুর একত্র সমাবেশ। যেমন, পরাবস্তুবাদী লেখক, চিত্রকর ইত্যাদি।

দু'শতেরও অধিক প্রধান হক্বপন্থী বিদ্বান তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিদ্বানদের বক্তব্যের সংগ্রহশালা *'মুখ্‌তাছার আল-'উলূ লিল-'আলি আল-'আযীম'* শীর্ষক একটি বই লিখেছিলেন।[১]

এ বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আমরা মুত্বী' আল-বালাখির বর্ণনায় পেতে পারি। তিনি বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আবূ হানীফা (রাহি.)-এর নিকটে জানতে চান যে জানে না তার সৃষ্টিকর্তা আসমানে না যমিনে। আবূ হানীফা (রাহি.) উত্তরে বললেন, "সে অবিশ্বাস (কুফর) করেছে, কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, দয়াময় 'আরশে সমুন্নত আছেন।[২] এবং তাঁর 'আরশ সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে।" তারপর তিনি (আল-বালাখি) বললেন, সে যদি বলে, "আল্লাহ্ 'আরশের উপরে কিন্তু আমি জানি না 'আরশ আসমানের উপরে না যমিনের উপরে, তাহলে কি হবে? এ কথা শুনে আবূ হানীফা (রাহি.) উত্তর দিলেন, সে অবিশ্বাস (কুফর) করেছে, কারণ আল্লাহ্‌র আসমানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়াকে সে অস্বীকার করেছে; এবং আল্লাহ্‌র আসমানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়াকে অস্বীকারকারী অবিশ্বাসী (কাফির) বলে গণ্য।"[৩] ***'আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'*** বলে হানাফী মাযহাবের অনেক অনুসারী বর্তমানে দাবী করলেও পূর্ববর্তী অনুসারীগণ এ ধরণের মতের পক্ষে ঐক্যমত্য পোষণ করেন নি। আবূ হানীফা (রাহি.)-এর সময়ে এবং তৎপরবর্তীকালে লিখিত অনেক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'আরশের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন- এ বিষয়টি বিশর আল-মারীসি[৪]

---

[১] 'আল্লাহ্ 'আরশে সমুন্নত' এ বিষয়ে সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ মু'আত্বিলাগণের কেউ করেছেন 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা' করা ইত্যাদি। এভাবে এঁরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম (রাহি.) এ সকল ভ্রান্তি তার প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি-প্রমান পেশ করেছেন। (ইবনুল কাইয়িম, *মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬-১৫২) হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলে সুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৭টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। [যাহাবী, *মুখতাছার আল- 'উলূ*, (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০১/১৯৮১), ৫ পৃ.]

[২] কুরআন (২০): ৫; এছাড়া আরও অনেক আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে, যেমন- বাক্বারাহ (২): ২৫৫; আ'রাফ (৭): ৫৪; তাওবাহ (৯): ১২৯; ইউনূস (১০): ৩; হূদ (১১): ৭; রা'দ (১৩): ২; বানী ইসরাঈল (১৭): ৪২; ত্ব-হা (২০): ৫; আম্বিয়া (২১): ২২; মু'মিনূন (২৩): ৮৬, ১১৬; ফুরক্বান (২৫): ৫৯; নামাল (২৭): ২৬; সাজদাহ (৩২): ৪; যুমার (৩৯): ৭৫; মু'মিন (৪০): ৭, ১৫; যুখরুফ (৪৩): ৮২; হাদীদ (৪৪): ৪; মুলক (৬৭): ১৬-১৭; হাক্কাহ (৬৯): ১৭; তাকভীর (৮১): ২০; বুরূজ (৮৫): ১৫।

[৩] আবূ ইসমা'ঈল আল-আনসারী তার লিখিত *আল-ফারূক্ব* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যা*, ২৮৮ পৃ. থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৪] বাগদাদের বিশর (মৃত্যু ৮৩৩ খ্রি.) *মু'তাযিলা* আইন ও আক্বীদার বিদ্বান ছিলেন। (দেখুন, খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলি কর্তৃক লিখিত *আল-আ'লাম*, বৈরুত: আল-'ঈলম লিল-মালাইয়ইন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৪, ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃ.।)

অস্বীকার করলে আবূ হানীফার প্রধান ছাত্র আবূ ইউসূফ তাকে তওবা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১]

সার-সংক্ষেপিত

অতএব, ইসলাম এবং এর মূল ভিত্তি তাওহীদ অনুযায়ী এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়,

১. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।
২. সৃষ্টি কোনক্রমেই আল্লাহ্কে পরিবেষ্টন করে না বা তাঁর উর্ধ্বে বিরাজমান নয়।
৩. আল্লাহ্ সবকিছুর উর্ধ্বে।

ইসলামের মূল উৎস অনুসারে আল্লাহ্ সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা। এ আক্বীদাটি এত দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলিক বিশ্বাস যে এতে এমন কোন ভ্রান্তি তার লেশমাত্র নেই যা মানুষকে সৃষ্টির ইবাদাত (উপাসনা) করার দিকে ধাবিত করতে পারে।

তবে, এ আক্বীদাটি অস্বীকার করে না যে, আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর সৃষ্টির পুরো অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির সীমা, জ্ঞান এবং ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে পারে না। আমাদের ঘরের আরামদায়ক কেদারায় উপবেশন করে পৃথিবীর অপর প্রান্তে সংঘটিত ঘটনার দৃশ্যাবলী অবলোকন করাকে প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান অগ্রগতি বলে বিবেচনা করা হয়- এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে বিরাজমান না থেকেও তিনি এর মধ্যের সকল কিছু দেখেন, শুনেন ও জানেন। 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

'আল্লাহ্র হাতে সাত আসমান, সাত জমিন এবং এগুলোর অভ্যন্তরস্থ সকল বস্তু ঠিক তেমনি, যেমন তোমাদের হাতের সরিষার একটি ক্ষুদ্র দানা।'[২]

---

[১] 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতীম এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। (দেখুন, *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যাহ,* ২৮৮ পৃ.)। আবূ হানীফা (রাহি.) তাঁর *'ওসীয়াত'* নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ 'আরশে সমুন্নত। (ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (মুহাম্মাদ খামীসের শারহ সহ), পৃ. ২১-৩৭) আল্লাহ্র 'আরশে উন্নীত হওয়া সম্বন্ধে ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহি.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত, এর স্বরূপ অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত। (ইমাম লালকাঈ, *উছূলু ই'তিকাদ,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭, টীকা-২; শাহরস্তানী, *আল-মিলাল,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; মোল্লা আলী কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার,* পৃ. ৭০)

[২] *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যা,* ২৮১ পৃ.।

আবার, *'Remote-Control'* (রিমৌট কন্ট্রোল)-এর কারণে টেলিভিশনকে যদি প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায় হিসেবে মনে করা হয়, তাহলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র উপস্থিত না থেকে অর্থাৎ সৃষ্টির বাইরে থেকেও তাঁর সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। মূলত, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান- এ ভ্রান্ত দর্শনটির মাধ্যমে মানবীয় দুর্বলতাকে আল্লাহ্‌র উপর আরোপ করা হয় বিধায় *তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*-এর ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত শির্কের একটি বিশেষ রূপ। কারণ, মানুষ যদি কোন ঘটনা দেখতে, শুনতে, জানতে এবং প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্থানে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হয়।

আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতার কোন সীমা নেই। আল্লাহ্‌র নিকটে মানুষের সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশমান, এমনটি মানুষের অন্তরের আবেগপূর্ণ ক্রিয়াকলাপও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। এর সত্যতায় আল্লাহ্‌র নিকটবর্তিতার ইঙ্গিতকারী কিছু আয়াত রয়েছে যা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾﴾ (سورة ق: ١٦)

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার প্রবৃত্তি তাকে (নিত্য নতুন) কী কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী।"
[সূরা ক্বা-ফ (৫০): ১৬]

তিনি আরও বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٦﴾﴾ (سورة الأنفال: ١٦)

"ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে, আর জেনে রেখ যে আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন আর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।"

[সূরা আল-আনফাল (৮): ১৬]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ কথা মনে করা বৈধ নয় যে, মস্তিষ্ক থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্তবহনকারী গ্রীবাদেশীয় বৃহৎ শিরাসমূহ অপেক্ষা আল্লাহ্ তা'আলা সত্তাগতভাবে অধিকতর নিকটবর্তী অথবা মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরে থেকে এর অবস্থার পরিবর্তন করছেন। মূলত, সত্যপন্থী পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ কর্তৃক প্রদত্ত এ আয়াতগুলোর বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই, এমনকি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের গভীর থেকে উৎসারিত ভাবনাও নয়। তাঁর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কিছুই নেই, এমনকি মানুষের হৃদয়ের আবেগপূর্ণ ভাবাবেগও নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝٧٧﴾ (سورة البقرة: ٧٧)

"তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ্ তা জানেন?" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ৭৭]

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۝١٠٣﴾ (سورة آل عمران: ١٠٣)

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'মাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।" [সূরা আল-'ইমরান (৩): ১০৩]

তা ছাড়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই নিম্নোক্ত দু'আ দ্বারা প্রার্থনা করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

"ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবী ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিক"

(হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর একাগ্র ও অনঢ় রাখ।)[১] একইরকম আয়াত হচ্ছে,

﴿...مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا... ۝٧﴾ (سورة المجادلة: ٧)

[১] তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। শায়খ আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ্ বলেছেন। *ছহীহ সুনান **তিরমিযী**,* ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃ., হাদীছ নং ২৭৯২।

"...তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন আল্লাহ্ হন না, আর পাঁচজনেও হয় না, যষ্ঠজন তিনি ছাড়া, এর কম সংখ্যকেও হয় না, আর বেশি সংখ্যকেও হয় না, তিনি তাদের সঙ্গে থাকা ব্যতীত, তারা যেখানেই থাকুক না কেন... ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ (৫৮): ৭]

এ আয়াতটিকে এর পূর্বাপর প্রসঙ্গক্রমকে বুঝতে হবে। একই আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে রয়েছে:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ﴿٧﴾﴾

(سورة المجادلة:)

"তুমি কি জান না যে, যা আকাশে আছে আর যা যমীনে আছে আল্লাহ্ সব জানেন?" [সূরা আল-মুজাদালাহ (৫৮): ৭]

এবং আয়াতটির শেষ অংশ হচ্ছে:

﴿...ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾

(سورة المجادلة:)

"...অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তিনি জানিয়ে দেবেন যা তারা 'আমাল করেছিল। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে পূর্ণভাবে অবগত।"

[সূরা আল-মুজাদালাহ (৫৮): ৭]

সুতরাং এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তা মানুষের মধ্যে বিরাজমান নয়, বরং তাঁর অসীম জ্ঞানই সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ এবং তাঁর সৃষ্টির সীমা বহির্ভূত।[1]

নিচের বর্ণনাটির প্রতি লক্ষ্য করা যাক,

"আসমান ও জমিন আল্লাহ্কে ধারণ করতে সক্ষম নয়, বরং সত্যিকার মু'মিনের অন্তর আল্লাহ্কে ধারণ করতে পারে।"[2]

---

[1] আহমাদ ইবনু আল-হুসাইন আল-বায়হাক্বী, *কিতাব আল-আসমা ওয়াস-সিফাত,* (বৈরুতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪), ৫৪১-২ পৃ.।

-এ হাদীছটি রাসূলের নামে তৈরি করা হয়েছে। তবে, হাদীছটি মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও যদি এর বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ বিরাজমান। কারণ, কোন মু'মিনের (বিশ্বাসীর) হৃদয় যদি আল্লাহ্কে ধারণ করে এবং উক্ত মু'মিন যদি আসমান ও জমিনের মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে এর মাধ্যমে আসমান এবং জমিনও আল্লাহ্কে ধারণ করে। কারণ, 'A' যদি 'B'-এর মধ্যে থাকে, এবং 'B' যদি 'C'-এর মধ্যে থাকে, তাহলে 'A' অবশ্যই 'C'-এর মধ্যেও থাকবে।

অতএব, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ নির্ভর ইসলামের চিরন্তন আক্বীদা তথা বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, এ মহাবিশ্ব, এর অভ্যন্তরস্থ সকল কিছু এবং সপ্তম আসমানের উর্ধ্বে 'আরশে সত্তাগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহিমা তথা আযমত ও জালালতের সাথে শোভনীয় ও সামঞ্জস্যশীল উপায়ে সমুন্নত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর কোন সৃষ্টি কোনক্রমেই ধারণ করতে পারে না অথবা তাঁর মধ্যেও কোন সৃষ্টি বিরাজমান নেই। বরং সমগ্র মহাবিশ্ব তথা প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার উপর আল্লাহ্র অসীম জ্ঞান, ক্ষমাশীলতা এবং ক্ষমতার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] এ সম্পর্কে আরেকটি বাক্যও লোকমুখে প্রসিদ্ধঃ **'কলব আল্লাহ তা'আলার ঘর।'**- এগুলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস নয়। ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) উভয় বাক্যটিকেই জাল বলেছেন। *(যাইলুল লাআলী, ২০৩; আল-মাসনূ, ১৬৪)* আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইবনু আররাক এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ইবনু তাইমিয়া বক্তব্যে একমত পোষণ করেছেন। *(তাযকিরাতুল মাওযূআত, ৩০; তানযীহুশ শরীয়া, ১/৪৮; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন, ৭/২৩৪; আল-মাকাসিদুল হাসানা, ৩৬৫, ৪৩৮; কাশফুল খাফা, ২/৯৯, ১৯৫; আদ্দুরারুল মুনতাসিরা, ১৫০; আল লুউলুউল মারসূ, ৫৭; আত তাযকিরা, ১৩৫, ১৩৬)* **'মুমিনের হৃদয় আল্লাহ তা'আলার আরশ'**- উপরোক্ত উক্তিদ্বয়ের ন্যায় এটিও জাল, যা লোকমুখে রাসূল ﷺ-এর হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর হাদীস নয়। এটি মূলত পূর্বোক্ত জাল হাদীসের আরেকটি রূপ। আল্লামা সাগানী (রাহি.) একে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। *(রিসালাতুল মাওযূআত, ৭)* আল্লামা আজলূনী (রাহি.)ও সাগানীর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। *(কাশফুল খাফা, ২/১০০)* বিস্তারিত দেখুনঃ ***হাদীসের নামে জালিয়াতি,*** ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ২২৩, ২২০-২২৫।

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্‌র দর্শন

আল্লাহ্‌র প্রতিকৃতি

অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান, উপলব্ধি ও বিচার-বিবেচনা শক্তি সম্পন্ন মানবের পক্ষে অসীম কোন কিছু বুঝার আশা মরীচিকা বৈকি। অসীম আল্লাহ্ যতটুকু চান ততটুকু ছাড়া মানুষ আল্লাহ্‌র কোন গুণাবলী উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না। তাই মানুষের উপলব্ধির সামর্থ্য হতে স্রষ্টা আল্লাহ্ ভিন্ন বিধায় জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে সে যদি আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করতে চায় তবে তার বিপথে ধাবিত হওয়া ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। কারণ, মানুষ তার কল্পনায় স্রষ্টা আল্লাহ্‌র যে প্রতিচ্ছবি রূপায়িত করে তা সৃষ্টির কিছু অংশ হতে তৈরি বা তার দেখা বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর যৌগিক রূপ মাত্র। অতএব, সে যদি তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতিকৃতি কল্পনা করতে উদ্যত হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র উপর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা ব্যতীত এ কর্মে সফল হবে না। মানুষ যেন তার অপার ও অসীম মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সাথে কোন সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সংমিশ্রণ না ঘটাতে পারে, একমাত্র সে কারণেই অসীম দয়ালু স্রষ্টা তাঁর গুণাবলীর সামান্য কিছু আমাদের নিকটে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগময় অন্তর দ্বারা আল্লাহ্‌র কিছু কিছু গুণাবলী উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব বিধায় আল্লাহ্ তাঁর গুণাবলীর কিছু কিছু মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন, যেমন, আল-ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান), যার অর্থ এমন কোন কিছুই নেই যা আল্লাহ্ করতে সক্ষম নন। একইভাবে, আর-রাহ্মান (অসীম দয়ালু), যার অর্থ সৃষ্ট জগতের সবকিছুর প্রতিই তিনি করুণা প্রদর্শন করেছেন। এ ধরণের উপলব্ধির জন্য চিত্র দ্বারা প্রকাশিত কোন প্রতিকৃতির প্রয়োজন মানুষের অন্তরে অনুভূত হয় না। মানুষ যেন আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলাকে অধিকতর ভালভাবে ও প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারে, সে কারণে সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহ

এবং নাবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা প্রদান করেছেন। মোটকথা, কেবল এরূপেই মানুষের অন্তর আল্লাহ্‌কে বিশুদ্ধ উপায়ে বুঝতে পারে। নাবী ঈসা (যিশু) ﷺ কর্তৃক প্রচারিত সরল পথের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে গ্রীস ও রোমের খ্রিস্টানরা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, এর পশ্চাতে নানাবিধ কারণ সক্রিয় থাকলেও সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মানুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করা। ইউরোপীয়দের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণকারীরা তাদের গির্জা ও তীর্থস্থানে সাদা দাড়িবিশিষ্ট বৃদ্ধ ইউরোপীয় বিশপের আকৃতিতে স্রষ্টার প্রতিকৃতি ও মূর্তি স্থাপন করত। ফিলিস্তিনের প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানেরা মূলত ইহুদী শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে আগমন করেছিল বিধায় ছবি, মূর্তি বা অন্য যে কোন মাধ্যমে স্রষ্টাকে উপস্থাপন করাকে তারা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিল। স্রষ্টাকে মানুষের রূপে উপস্থাপনের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় পথনির্দেশনা লাভের ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভরতার ফলে ইউরোপীয়রা অবশ্য বিপথগামী হয়েছিল। তাওরাতের প্রথম গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় ইহুদীরা নিম্নরূপে লিখেছিল।

> **"তারপর স্রষ্টা বললেন, 'আমরা আমাদের মতো করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি।' তাই, স্রষ্টা তাঁর মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন।"[১]**

উপরোক্ত পঙ্ক্তিগুলো ছাড়াও অন্যান্য বর্ণনার দ্বারা প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানেরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী স্রষ্টাকে দেখতে ঠিক মানুষের অনুরূপ, সুতরাং তারাও স্রষ্টার রূপ মানুষের মতো মনে করে কাল্পনিকভাবে মানবাকৃতিতে স্রষ্টার প্রতিকৃতি উপস্থাপন করত। ফলে, স্রষ্টাকে মানবীয়রূপে রূপায়িত করে মূর্তি নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কণে তারা অঢেল ধন-সম্পদ, সময় এবং শক্তি খরচ করে করেছিল।

স্রষ্টাকে মানবীয়রূপে রূপায়িত করার চর্চা পূর্বকালেও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল এবং বর্তমানেও একই পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। স্রষ্টা কোনক্রমেই তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ নয়- এ আসমানী বাণী ভুলে যাওয়ার কারণেই মানুষ সৃষ্টির প্রতি উপাসনা নিবন্ধ করা শুরু করেছে। মানুষই যেহেতু এ মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই মানবীয় রূপকেই সে বেছে নিল স্রষ্টাকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এবং

---

[1] তাওরাত ১: ২৬-২৭। [কিতাবুল মোকাদ্দস, (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি), পৃ.২।]

প্রকারান্তরে সৃষ্টির উপসনায় রত হল। এ বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চৌ বংশের সময়কাল (১০২৭ খি.পূ.-৪০২ খ্রি.) হতে চীনের রাষ্ট্রীয় বা সরকারী ধর্মের সকল ক্রিয়াকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হয়েছিল প্রধান দেবতা 'তি'য়েন' (স্বর্গ)-এর উদ্দেশ্যে, যাকে 'ইউ হুয়াং' নামক এক ক্লান্ত সম্রাট, সর্বোচ্চ, ও স্বর্গীয় বিচারালয়ের শাসকের মতো আকৃতিতে রূপায়িত করা হয়েছিল।[১]

কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা খুবই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, আমরা তাঁকে কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে পারি না। আল্লাহ্ বলেন:

﴿...لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١١﴾ (سورة الشورى: ١١)

"...কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"
[সূরা আশ্-শূরা (৪২): ১১]

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ (سورة الإخلاص: ٤)

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।" [সূরা আল-ইখলাস (১১২): ৪]

নাবী মূসা عليه السلام আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করতে চেয়েছিলেন

আল্লাহ্ তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন, এ বিষয়টি নিশ্চিত করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানান যে, আমাদের চোখ তাঁকে অবলোকন করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ বলেন:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَٰرَ... ۝١٠٣﴾ (سورة الأنعام: ١٠٣)

"দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন...।"
[সূরা আল-আন'আম (৬): ১০৩]

এ আসমানী আয়াতটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে দৃষ্টির অধিগত করতে সক্ষম নয়।[২]

এ মহা সত্যটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে প্রসঙ্গক্রমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মূসা عليه السلام-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

---

[১] *Dictionary of Religion*, ৮৫ পৃ.।

[২] আল্লাহ্‌কে দৃষ্টির অধিগত করা এবং আল্লাহ্‌কে দর্শন বা অবলোকন করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। (*শারহে তাহাওয়িয়্যাহ ফিল আক্বীদাতিছ্ ছালাফিয়্যাহ লিল 'আল্লাম মুহাম্মদ ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী*, পৃ. ৮৮)

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾

(سورة الأعراف: ١٤٣)

"মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসল, আর তার রব্ব তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে নিজ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা চৈতন্য হারিয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে পেল, তখন সে বলল, 'পবিত্র তোমার সত্তা, আমি অনুশোচনা ভরে তোমার পানেই ফিরে এলাম, আর আমি প্রথম ঈমান আনছি।'" [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৪৩]

নাবী মূসা ﷺ-কে যেহেতু তৎকালীন মানবজাতি থেকে বাছাই করা হয়েছিল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী প্রচারের নিমিত্তে, তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি হয়তো আল্লাহ্র দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।[১] কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করেন যে, মূসা বা অন্য কেউই এ দুনিয়াতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। কেননা, মানুষের বাহ্যিক তথা মানবীয় চোখ আল্লাহ্র জ্যোতির ঝলকানিই সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না[২], তাঁর অসীম সত্তার দর্শন লাভ তো দূরের কথা।[৩] পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে অসম্ভব বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।[৪]

---

[১] আল্লাহ ﷻ বললেন, 'হে মূসা! আমি আমার রিসালাত (যা তোমাকে দিয়েছি) ও আমার বাক্য (যা তোমার সঙ্গে বলেছিলাম তার) দ্বারা সকল লোকের মধ্য থেকে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। কাজেই যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ কর আর শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।' [কুরআন (৭): ১৪৪]

[২] দেখুন, *শারহুত ত্বহাভিয়্যাহ ফিল আক্বীদাতিছ ছালাফিয়্যাহ,* পৃ. ৯১।

[৩] *আল-'আক্বীদা আত্-ত্বহাভীয়্যাহ,* ১৯১ পৃষ্ঠ।

[৪] দেখুন, *শারহুত ত্বহাভিয়্যাহ ফিল আক্বীদাতিছ ছালাফিয়্যাহ,* পৃ. ৮৭, ৮৮, ৯১।

রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ কি আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেছিলেন?

কিছু মুসলমান এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমান ভ্রমণ করিয়ে এমন একটি সীমারেখা অতিক্রম করান যেখানে পৌঁছানোর ব্যাপারে ফিরিশতারাও অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, ফলে অন্য সকল নাবী ও রাসূলগণের মধ্যে একমাত্র শেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করার সুযোগ দান করেন। অথচ, রাসূল ﷺ তাঁর রবের দর্শন লাভ করেছিলেন কি না- এ সম্পর্কে রাসূলের স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে মাসরূক্ব নামে এক তাবেঈ[১] জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন,

"তোমার কথা শুনে আমার শরীরের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে! যে এ কথা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে!"[২]

"আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?' উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন, 'তিনি (আল্লাহ্) নূর, তা আমি কী রূপে দেখব?'[৩]

অন্য একটি ঘটনায় রাসূল ﷺ উক্ত নূরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বলেন যে, তাঁর দেখা নূর আল্লাহ্‌র সত্তা নয়। তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা কখনো নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা তাঁর জন্য শোভাও পায় না, তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারেই তুলাদণ্ড নামান ও উত্তোলন করেন, তাঁর নিকট রাতের পূর্বেই দিনের সকল 'আমল উত্থিত হয় এবং দিনের পূর্বেই রাতের 'আমল উত্থিত হয়। **তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত**।"[৪]

অতএব, এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পূর্ববর্তী নাবী ও রাসূলগণের মতোই ইহলৌকিক এ জীবনে আল্লাহ্‌কে দর্শন করার সুযোগ লাভ করেন নি। এ মহান সত্যের ভিত্তিতে ইহজীবনে আল্লাহ্‌কে দেখতে সক্ষম হওয়ার দাবীদারদের বক্তব্যের অসারতা ও মিথ্যাচারিতা সুস্পষ্টভাবেই

---

[১] *তাবেঈ* মানে 'অনুসারী'। তবে, ইসলামী পরিভাষায় তাবেঈ বলতে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের ছাত্রদেরকে বুঝানো হয়।

[২] *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১১-২৩ পৃ., হাদীছ নং ৩৩৭ এবং ৩৩৯।

[৩] *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃ., হাদীছ নং ৩৪১।

[৪] আবূ মূসা আল-আশ'আরী কর্তৃক বর্ণিত। *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃ., হাদীছ নং ৩৪৩।

প্রমাণিত হয়। সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে বাছাই করা মানুষ, যাঁদেরকে নাবী বা রাসূল হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, তাঁরাই যদি আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করতে না সক্ষম হন, তাহলে সে-ক্ষেত্রে একজন মানুষ যতই ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিকই হোক না কেন, সে কিভাবে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করতে পারে? আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করেছে বলে যদি কেউ দাবী করে, তবে সেটা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী ও অবিশ্বাসমূলক ঘোষণা বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ধরণের দাবীর দ্বারা এ কথাই প্রকাশ পায় যে, সে নাবী ও রাসূলগণ অপেক্ষা বড় মর্যাদাবান।

নিজেকে আল্লাহ্ বলে প্রকাশের ভানকারী শয়তান

এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করার দাবীদার সুফীরা কিছু না কিছু একটা দেখেছিল। তারা সাধারণত এগুলোকে বিস্ময়কর আলোর জ্যোতি এবং সম্ভবত অলৌকিক বলে বর্ণনা করে থাকে। তবে, এ ধরণের কিছু একটা অবলোকনের অভিজ্ঞতা লাভের পর অধিকাংশ সুফী সাধকেরা ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো চর্চা করা পরিত্যাগ করে। ফলে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, তারা অবশ্যই কোন শয়ত্বানী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত এবং এরা সুপথ প্রাপ্ত নয় অথবা এদের সাথে আসমানী বিধান ইসলামের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করার দাবীদার ব্যক্তিরা সাধারণত নিয়মিতভাবে সলাত আদায় বা সিয়াম পালন করে না, কারণ, তারা নাকি আধ্যাত্মিকভাবে সাধারণ জনগণের পর্যায় থেকে অনেক উঁচু মর্যাদা লাভ করেছে। তথাকথিত ক্বাদিরীন সুফী ত্বরীকা যাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে সেই শায়খ 'আব্দুল ক্বাদির আল-জীলানি (১০৭৭-১১৬৬ খ্রি.) এ ধরণের একটি ঘটনায় অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। বিস্ময়কর আলোর জ্যোতি অবলোকন করে যারা আল্লাহ্‌কে দেখেছে বলে দাবী করে এবং এ জ্যোতির দর্শনের পরে কেন তারা ইসলামের মৌলিক চর্চাসমূহকে পরিত্যাগ করে, শায়খের ঘটনায় তার ব্যাখ্যা মিলে। তিনি বলেন, 'একদিন গভীরভাবে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকাবস্থায় হঠাৎ আমার সামনে একটি জমকালো সিংহাসন দেখতে পেলাম। এ সিংহাসনের চারিদিকে ঝলমলে আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এমন সময় একটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ আমার কানে এসে আঘাত করল, 'হে 'আব্দুল ক্বাদির, আমি তোমার রব! অন্যের জন্য আমি যা হারাম করেছি তা তোমার জন্য হালাল করে দিলাম। 'আব্দুল ক্বাদির জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সেই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।' এ প্রশ্নের

কোনই উত্তর না এলে তিনি বললেন, 'দূর হয়ে যা, হে আল্লাহ্‌র শত্রু।' তৎক্ষণাৎ আলোটি নিষ্প্রভ হয়ে গেল এবং তাকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করল। তারপর কণ্ঠটি বলল, 'হে 'আব্দুল ক্বাদির, ধর্ম সম্পর্কে তোমার বোধশক্তি এবং জ্ঞানের শক্তিতেই তুমি আমার দুরভিসন্ধিকে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছ। এ একই কৌশলের সাহায্যে আমি সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক অত্যন্ত ধার্মিক (দরবেশ) ইবাদাতকারীকে বিপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছি।' সেই কণ্ঠটি যে শয়ত্বান ছিল তা 'আব্দুল ক্বাদির কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি যেহেতু জানতাম যে, রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে কোনক্রমেই বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না, ফলে অন্যের জন্য হারামকৃত বিষয়সমূহকে আমার জন্য বিশেষভাবে হালাল করে দেয়ার কথা বলার পর আমি তাকে শয়ত্বান বলে গণ্য করেছিলাম। তা ছাড়া, শয়ত্বান স্বয়ং আমার রব বলে দাবী করেছিল, কিন্তু শরীকবিহীন আল্লাহ্ বলে সে নিজেকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় আমি তার শয়ত্বান হওয়ার ব্যাপারে আরও দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়েছিলাম।[১]

একইরূপে, বিগত সময়ে কিছু লোক দাবী করত যে, তারা আচ্ছন্ন অবস্থায় কা'বা দেখেছিল এবং এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেছিল। অন্যরা বলত, তাদের সম্মুখে বিশাল আকারের একটি সিংহাসন প্রসারিত করা হয়েছিল এবং এর উপর অপূর্ব রূপের অধিকারী একজন উপবিষ্ট ছিল। অগণিত লোক তার চারদিকে আরোহণ ও অবতরণ করছিল। এ দৃশ্য অবলোকন করে তারা সিংহাসনের চতুর্দিকের লোকগুলোকে ফিরিশতা এবং সিংহাসনে আসীনকে আল্লাহ্ হিসেবে গণ্য করেছিল। অথচ, এরা সবাই ছিল শয়ত্বান ও তার অনুসারী।[২]

সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত যে, স্বপ্নে অথবা স্পষ্ট দিনের আলোয় আল্লাহ্‌কে দর্শন করার দাবী মূলত মানসিক ও অতি-আবেগপ্রবণ অবস্থা হতেই উৎসারিত। এ পর্যায়ে শয়ত্বান ঝলমলে আলোর মতো জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে এবং যারা আচ্ছন্নগ্রস্ত হয়েছে তাদের নিকটে সে নিজেকে রব বলে দাবী পেশ করে। বিশুদ্ধ তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত তারা এ ধরণের দাবী গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।

---

[১] ইবনু তাইমিয়া, *আত-তাওয়াস্‌সুল ওয়াল-ওয়াসীলাহ,* (রিয়াদঃ দার আল-ইফতা, ১৯৮৪), ২৮ পৃ.।
[২] পূর্বোক্ত

সূরা আন-নাজম-এর অর্থ

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রব আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেছিলেন, এ বিষয়টি প্রমাণের উদ্দেশ্যে কিছু লোক[১] সূরা আন্ নাজম-এর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তাদের দাবীর স্বপক্ষে ব্যবহার করে থাকে:

﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ۞﴾

(سورة النجم: ٧-١٤)

"আর সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর সে নিকটবর্তী হল, অতঃপর আসলো আরো নিকটে, ফলে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো কম। তখন তাঁর বান্দাহ্‌র প্রতি ওয়াহী করলেন যা ওয়াহী করার ছিল। অন্তঃকরণ মিথ্যে মনে করে নি যা সে দেখে ছিল। সে যা দেখেছে সে বিষয়ে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? অবশ্যই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।"

[সূরা আন্-নাজ্‌ম (৫৩): ৭-১৪]

তাদের দাবীনুযায়ী এ আয়াতগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ সম্পর্কিত। অথচ, রাসূলের স্ত্রী 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ আয়াতগুলো সম্পর্কে মাসরূক্ব জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, 'আমিই এ উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি বলেছেন,

'তিনি তো ছিলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)। কেবলমাত্র এ দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান সবটুকু।'

'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আরও বলেন, 'তুমি কি শোন নি? সর্বোচ্চে সম্মুন্নত আল্লাহ্ বলেছেন:

---

[১] এঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন আন-নববী। এ বিষয়ে তিনি *মুসলিম, ৩য় খণ্ড, ১২ পৃ.য়* মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, 'আব্দুল্লাহ আল ঘুনাইমান কর্তৃক লিখিত *শারহ্ কিতাব আত-তাওহীদ মিন ছহীহ বুখারী,* (মাদীনা: মাকতাবা আদ-দার, ১৯৮৫), ১১৫-৬ পৃ.।

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾

(سورة الأنعام: ١٠٣)

"দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" [সূরা আল-আন'আম (৬): ১০৩]

এরূপে তুমি কি শোন নি? আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴿٥١﴾﴾

(سورة الشورى: ٥١)

"কোন মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল বা কোন দূত প্রেরণ ছাড়া।" [সূরা আশ্-শূরা (৪২): ৫১][১]

রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার আলোকে বিবেচনা করলে কোনক্রমেই এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমর্থন পাওয়া যায় না যে, রাসূল ﷺ তাঁর রব আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেছিলেন।[২]

আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ না করার পিছনে বিচক্ষণতা

আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করা এ জীবনে সম্ভব হলে মানুষের জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো নিরর্থক হতো। আল্লাহ্‌র প্রকৃত অস্তিত্ব বাস্তবে প্রত্যক্ষ না করে নীতিগতভাবে তাঁকে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই এ জীবন সত্যিকারের পরীক্ষায় পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলে সকলেই তাঁকে এবং নাবী-রাসূলগণের শিক্ষাকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করত। এর ফলে, মানুষ প্রকৃতই ফিরিশতাদের মতো আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী হতো। কোনপ্রকার বাছাই ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরিশতাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু ফিরিশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর করে সৃষ্টি করেছেন, ফলে অবিশ্বাস (কুফর) পরিত্যাগ করে বিশ্বাসকে (ঈমান) দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার

[১] ***মুসলিম***, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১১-২ পৃ., হাদীছ নং ৩৩৭।

[২] এ হাদীছটি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়। ইবনু খুযাইমাহ কর্তৃক *কিতাব আত-তাওহীদ*-এ সংগৃহীত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে রাসূল ﷺ দেখতে পেয়েছিলেন। অথচ, এ বর্ণনাটি য'ঈফ। দেখুন, *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভীয়্যা*, ১৯৭ পৃ., ১৬৯ নং পাদটীকা।

বিষয়টি এমন এক পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হওয়া উচিত যেখানে আল্লাহ্র প্রকৃত অস্তিত্ব বিদ্যমানতার ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে মানুষের দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত করে রেখেছেন এবং কিয়ামাত অবধি তিনি এভাবেই বিরাজমান থাকবেন।

পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র দর্শন

কুরআনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পরকালীন জীবনে মানুষ আল্লাহ্র দর্শন লাভে ধন্য হবে।[1] পুনরুত্থান দিবসের কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣﴾ (سورة القيامة: ٢٢-٢٣)

"কতিপয় মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা আল-ক্বিয়ামাহ (৭৫): ২২-২৩]

এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে রাসূল ﷺ আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করল, 'পুনরুত্থান দিবসে কি আমরা আল্লাহ্র দর্শন লাভ করব? এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন, 'মেঘমুক্ত আলোকোজ্জ্বল আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা উত্তর দিলেন, 'না'। তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'নিশ্চয় তোমরা অনুরূপভাবে আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করবে।'[২]

অন্য একটি ঘটনায় তিনি ﷺ বলেন,

'নিশ্চয় তোমরা যেদিন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন আল্লাহ্কে অবশ্যই দেখতে পাবে। আল্লাহ্ এবং তোমাদের মধ্যে কোন পর্দা বা ভাষান্তরকারী থাকবে না।[৩]

---

[১] পরকালীন জীবনে মানুষ আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে- এ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসটিকে অতীতের মুসলিমদের কয়েকটি প্রধান দল অস্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, *জাহিমিয়্যা, মু'তাযিলা* এবং এদেরকে যে সব *খারিজি* অনুসরণ করেছিল। বর্তমানে কেবল শি'আদের বারোটি দল এ আক্বীদাটিকে অস্বীকার করছে। (দেখুন, *আল- আক্বীদা আত্-ত্বহাভীয়া,* ১৮৯ পৃ.।)

[২] আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৩৯০-১ পৃ., হাদীছ নং ৫৩২; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃ., হাদীছ নং ৩৪৯; মিশকাত, (বৈরুত), হাদীছ নং ৫৬৫৫, 'আল্লাহ্র দর্শন' বিষয়ক অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ১৫৭৪ পৃ.।

[3] 'আদি ইবনু আবি হাতিম কর্তৃক বর্ণিত। ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৪০৩ পৃ., হাদীছ নং ৫৩৫।

তা ছাড়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বর্ণনা করেন,

'পুনরুত্থান দিবসই সর্বপ্রথম দিন, যেদিন কোন চোখ সর্বোচ্চ ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখতে পাবে।'[১]

আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করা জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি বিশেষ অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ্‌র দর্শনই হবে মু'মিনগণের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত।[২] জান্নাতের বাগানসমূহের সৎকর্মশীল উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত অন্য সকল পুরস্কারের তুলনায় এ বিশেষ (অতিরিক্ত) অনুগ্রহ অধিকতর মূল্যবান। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশেষ (অতিরিক্ত) সুখানুভব সম্পর্কে বলেন:

﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝٣٥﴾ (سورة ق: ٣٥)

"সেখানে তাদের জন্য তা-ই আছে যা তারা ইচ্ছে করবে, আর আমার কাছে (তাছাড়াও) আরো বেশি আছে।" [সূরা ক্বা-ফ (৫০): ৩৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন বিশেষ সাহাবী 'আলী ইবনু আবি ত্বালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যে 'বিশেষ (অতিরিক্ত)' অনুগ্রহের কথা বলেছেন, তা হচ্ছে, তাঁর দর্শন লাভ করা।[৩] রাসূল ﷺ-এর আরেক সাহাবী শুয়াইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবৃত্তি করেছিলেন (এ আয়াতটি):

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ... ۝٢٦﴾ (سورة يونس: ٢٦)

"যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অতিরিক্ত (পুরস্কার)।" [সূরা ইউনুস (১০): ২৬]

এবং বলেছিলেন,

'জান্নাত প্রাপ্তির জন্য উপযোগী মানুষেরা জান্নাতে এবং জাহান্নাম প্রাপ্তির জন্য উপযোগী মানুষেরা জাহান্নামে প্রবেশের পর একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, 'হে জান্নাতবাসীরা, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পূর্ণ করবেন।' তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'সে প্রতিশ্রুতি কী? তিনি কি আমাদের

---

[১] আদ-দার কুতনী কর্তৃক সংগৃহীত। আদ-দারিমীও তাঁর লিখিত *আর-রাদ 'আলা আল-জাহিমিয়্যা (জাহিমিয়্যাদের যুক্তি খণ্ডন)* নামক বইতে বর্ণনা করেছেন, (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামি, সংস্করণবিহীন), ৫৭ পৃ.। এ হাদীছটি ছহীহ।

[২] আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌র দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো বহু-সংখ্যক বা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের।

[৩] আত্ব-ত্ববারী কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন, *আল-আক্বীদা আত্ব-ত্বহাভীয়্যা,* ১৯০ পৃ.।

সৎকর্মের দাঁড়িপাল্লাকে ভারী করেন নি, আমাদের মর্যাদাকে উন্নত করেন নি এবং আমাদের (কয়েকজনকে) জাহান্নাম থেকে রেহাই দেন নি?' তখন পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন তদপেক্ষা তাঁর দর্শন লাভই সবচেয়ে প্রিয় হবে। আর এটাই হচ্ছে সেই '*আরো অতিরিক্ত (পুরস্কার)*'।[১]

"*দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন।*'- পূর্বে উল্লিখিত এ আয়াটির মাধ্যমেই ইহজীবনে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের দাবী বাতিল হয়ে যায়। তা ছাড়া, পরকালীন জীবনে সকল মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের সম্ভাবনাও উক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না। সৎকর্মশীল মানুষদের দৃষ্টিশক্তি সসীম সৃষ্টির মতোই হওয়া সত্ত্বেও কেবল তারাই আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদাই অসীম ও অসৃষ্ট প্রতিপালক যাঁকে কোন দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরিবেষ্টন করতে পারে না।[২] অবিশ্বাসীরা (কাফির) পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে না, তাই এটি হবে তাদের জন্য বঞ্চনা ও হতাশার কারণ। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ (سورة المطففين:١٥)

"*তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।*"[৩]

[সূরা আল-মুতাফফিফীন (৮৩): ১৫]

রাসূল ﷺ-এর দর্শন

এ দর্শনক্ষেত্রটিও মুসলিমদের জন্য বিভ্রান্তি ও পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ এবং তাঁর নিকট থেকে বিশেষ পথনির্দেশ প্রাপ্তির দাবী করে থাকে। স্বপ্নযোগে অথবা জাগ্রতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ করার দাবীও অনেকের নিকট থেকে উত্থাপিত হয়। সাধারণত এ ধরণের দাবীকারী ব্যক্তিগণ জনগণের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। তারা প্রায়ই বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন বিদ'আতের প্রচলন করে এবং সেগুলোকে

---

[১] *মুসলিম*, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ এবং আহ্‌মাদ কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] *আল-'আক্বীদাহ আত্ব-ত্বহাভিয়্যা,* ১৮৮, ১৯৩, ১৯৮ পৃ.। আরও দেখুন, *সূরা ত্বহা* (২০)-এর ১১০ আয়াতে মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "*তারা (মানুষ) জ্ঞান দিয়ে তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) আয়ত্ত করতে পারে না।*"

[৩] অন্যান্য আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন। এ প্রেক্ষিতে কোন কোন সালাফগণ বলেছেন যে, তাদের সাথে আল্লাহ্‌র কথাবার্তা যে-পর্যায়ে এবং যেভাবে হবে, ক্বিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে তাদের সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ঐ পর্যায়ে এবং ওভাবেই হতে পারে। (দেখুন, শারহুত্ব ত্বহাভিয়্যাহ ফিল 'আক্বীদাতিছ ছালাফিয়্যাহ, পৃ. ৮৭. ৯০।)

রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে থাকে। আবূ হুরায়রা, আবূ ক্বাতাদাহ এবং জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিই এ সব দাবীর ভিত্তিমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

'আমাকে যে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যিই আমাকে দেখল; কারণ শয়ত্বান আমার আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম।'[১]

এ হাদীছটি ছহীহ্ ও বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই এটিকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এ হাদীছটির অর্থের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবেঃ

১. এ হাদীছটি প্রমাণ বহন করছে যে, স্বপ্নের মধ্যে শয়ত্বান বিভিন্ন আকৃতিতে আগমন করতে পারে এবং মানুষকে বিপথগামী করতে পারে।

২. এ হাদীছটি এটিও প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর আসল আকৃতি শয়ত্বান ধারণ করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ সে রাসূল (ﷺ)-এর প্রকৃত রূপে আবির্ভূত হতে পারে না।

৩. এ হাদীছটির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বপ্নের মধ্যে রাসূলের আকৃতি দর্শন সম্ভব।

এ কথাটি রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের নিকটে বলেছিলেন এবং তাঁদের নিকটে তাঁর শারীরিক গঠন-প্রকৃতি[২] খুব ভালভাবে পরিচিত ছিল। অতএব, এ

---

[১] *বুখারী*, (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ১০৪ পৃ., হাদীছ নং ১২৩; *মুসলিম*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১২২৫, ১২২৬ পৃ., হাদীছ নং ৫৬৩৫, ৫৬৩৯।

[২] রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শারীরিক গঠন মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর অবয়ব হ্রস্বকায়ও (বেঁটে) ছিল না, আবার বেমানান দীর্ঘকায়ও (লম্বা) ছিল না। শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা, সুন্দর। ছিল কিছুটা লালচে মিশ্রিত সাদা অর্থাৎ গোলাপী ও বাদামীর সংমিশ্রণ। মাথা বড়, প্রশস্ত ললাট ও নাক সমুন্নত। নয়ন দু'টি ছিল দৃষ্টিনন্দন, গভীর কালো ও লালিমায় মিশ্রিত, ভাসা-ভাসা, টানা-টানা ও আকর্ষণীয়ভাবে বড়। চোখে সুরমা ব্যবহার না করলেও মনে হতো সুরমা লাগানো হয়েছে, কারণ প্রাকৃতিকভাবে তাঁর চোখে সুরমার ব্যবস্থা ছিল। তবুও তিনি চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। চোখের পাতা ছিল লম্বাটে গড়নের। চিকন ভ্রূযুগল দেখতে বিজড়িত মনে হলেও একটি হতে অন্যটি ছিল পৃথক। যখন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তখন তাঁর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হতেন। মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকার বা লম্বাটে ছিল না, বরং ডিম্বাকার ছিল। চেহারা মুবারক ছিল পূর্ণ চাঁদের চাইতেও সুশ্রী, মাধুর্যমণ্ডিত, মনোমুগ্ধকর ও মার্জিত। চাঁদনী রাতে তাঁর মুখের উপর লালিম আভা ছড়ানো থাকত। প্রফুল্ল হলে মুখমণ্ডল এরূপ চমকিত হতো যে তা চন্দ্রেরই এক অংশ বলে মনে হতো। মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতার দিকে লক্ষ্য করলে ঘনঘটার মধ্য থেকে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো আলোকিত দেখা যেত। সাধারণত মৃদু হাসতেন। রাগান্বিত হলে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করত; মনে হতো যেন গালদ্বয়ের উপর ডালিমের রস সিঞ্চিত হয়েছে। কেউ তাঁকে একবার দেখলে দেখতেই থাকত। অপূর্ব লাবণ্যময় চেহারা মুবারক দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই অন্তর জুড়িয়ে যেত। মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। অতি সুন্দর উজ্জ্বল দন্তরাজি ছিল সরু, তবে খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল না। মনে হতো, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সরু রেখা টানা

হাদীছটির অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত রাসূলের আকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকে এবং একইরূপের আকৃতি বিশিষ্ট কাউকে যদি সে তার স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায়, তাহলে সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে, রাসূল ﷺ-কে দর্শনের সুযোগ দান করে আল্লাহ্ তাকে করুণা করেছেন।[১]

রয়েছে। যখন কথা বলতেন তখন দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়ে আলোর আভাষ পাওয়া যেত। গ্রীবা ছিল সুউচ্চ। দাড়ি মুবারক ছিল ঘন সন্নিবেশিত। মাথা ভরা ঘন কালো চুল ছিল। চুলগুলো বেশী কোঁকড়ানোও ছিল না, একেবারে সোজা খাড়াও ছিল না; বরং এ দুয়ের সমন্বয়ে ছিল এক চমৎকার রূপভঙ্গী বিশিষ্ট। অধিকাংশ সময় চুলে তেল ব্যবহার করতেন, চিরুনি করতেন, সিঁথি করতেন। সুবিন্যস্ত চুল কখনো কান পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত, কখনো বা তারও নীচ পর্যন্ত লম্বা হতো। ইন্তেকালের পূর্বেও তাঁর চুল ও দাড়ি কালো ছিল। সামান্য কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। গণ্ডদেশে মাংস বাহুল্য ছিল না। চিবুক ক্ষুদ্রাকার এবং কপাল নীচু ছিল না। সন্ধিসমূহ (জোড়ের হাড্ডিগুলো) এবং কাঁধের হাড্ডিগুলো ছিল মজবুত ও সুঠাম। বুকের উপরিভাগ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছিল কেশমুক্ত। তবে দু'বাহু এবং কাঁধের উপর হালকা পশম ছিল। পেট ও বুকের সম্মুখভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বক্ষ সমতল ও প্রশস্ত প্রতীয়মান হতো। কাঁধ-যুগল ছিল প্রশস্ত ও মাংসল। পৃষ্ঠদেশে ডান কাঁধের নরম হাড়ের সন্নিকট কবুতরের ডিমের আকৃতির উঁচু লাল মাংসপিণ্ড ছিল, এর উপর ছিল সবুজ রেখার ন্যায় তিলের ও লোমের সমাহার, এটিই হল মোহরে নবুওয়াত। এ মোহর ছিল পবিত্র শরীরের বর্ণের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় হাতের বাহু ও পাদ্বয় ছিল চওড়া ও মাংসল। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল পৌরষ প্রকাশক ও শক্ত। হাতের আঙ্গুলগুলো কিছুটা বড় আকারের ছিল। হাতের তালুদ্বয় ছিল প্রশস্ত, রং ছিল সাদা এবং বাদামীর মাঝামাঝি উজ্জ্বল। রাসূল ﷺ-এর হাত ছিল রেশম কিংবা মখমল অপেক্ষা অধিকতর কোমল এবং মোলায়েম। হস্তদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল এবং মিশক আম্বর হতে অধিক সুগন্ধিময় ছিল। সুগঠিত পদযুগলের গুচ্ছদেশ তথা গোড়ালি ছিল হালকা। পায়ের পাতার মধ্যভাগ ছিল কিছুটা মাংস শূন্য। তিনি যখন দৃঢ় পায়ে বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটতেন, তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি ঢালু যমিনের উঁচু থেকে নীচুতে নামছেন এবং পদক্ষেপের সাথে সাথে সামনে ঝুঁকে পড়ছেন। শরীরের চামড়া ছিল নরম, মসৃন। তাঁর ঘর্মবিন্দু দেখতে মণিমুক্তার মতো মনে হতো এবং এ ঘাম থেকে উত্তম সুগন্ধি প্রকাশ পেত। এমনকি তিনি কোন পথ ধরে চলার পর সেই পথে অন্য কেউ চললে সে তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত সুগন্ধি থেকে বুঝতে সক্ষম হতো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পথে গমন করেছেন। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক গঠন, চারিত্রিক গুণাবলী ও আচরণ সম্পর্কে তথ্যসমূহের জন্য বিস্তারিত দেখুন: ইমাম তিরমিযী, *আশ শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া,* নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ,* শফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতুম* সহ অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ) -অনুবাদক

[১] আমাদেরকে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, দেখার দাবী করা এবং প্রকৃত অর্থে দেখা দু'টি এক জিনিস নয়। কেউ আদৌ না দেখেও দেখার দাবী করতে পারে অথবা অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে দেখে জেনে শুনে এর বিপরীত দাবী তথা রাসূল ﷺ-কে দেখার দাবী করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি প্রকৃত অর্থেই রাসূল ﷺ-কে সপ্নে দেখেছে বলে মনে করে এবং সে যদি তার স্বপ্নের ব্যাপারে নিজে নিজের মনে প্রাণে নিশ্চিত হতে পারে যে সে রাসূল ﷺ-কেই দেখেছে, এ নিশ্চিত হওয়াটা যে কোন ভাবে হতে পারে, যেমন, সে রাসূল ﷺ-এর আকার আকৃতি ও চেহারা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকে পূর্ব ধারণা লাভ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী দেখে থাকে, অথবা যে কোন হেতুর ভিত্তিতে তার অন্তর যদি সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে, সে রাসূল ﷺ-কেই দেখেছে তাহলে এটাকে এই হাদীছ অনুযায়ী রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ হিসাবেই গণ্য করতে হবে। কেননা, রাসূল ﷺ-এর রূপ বা আকৃতি নিয়ে যে কোন

কারণ, শয়ত্বানকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেন নি। তবে, এ কথার অর্থ এ রকমও হয় যে, রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অজ্ঞাত এমন কোন ব্যক্তির স্বপ্নের মধ্যে শয়ত্বান আবির্ভূত হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করতে পারে। তারপর শয়ত্বান সেই স্বপ্নদর্শীকে ইসলাম ধর্মে বিদ'আত প্রবর্তনের পরামর্শ দেয় অথবা তাকে জানায় যে, তুমিই *আল-মাহদী* (প্রতীক্ষিত সংস্কারক), অথবা এ কথাও বলে, তুমিই নাবী *ঈসা* ﷺ (যিশু), যিনি শেষ যুগে ফিরে আসবেন। স্বপ্নের উপর নির্ভর করে ইসলাম ধর্মে নতুন নতুন বিদ'আতের প্রবর্তন বা এ ধরণের দাবীদারের সংখ্যা অসংখ্য। উপরে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা ভুলভাবে বুঝার কারণে মানুষ এ ধরণের দাবী গ্রহণ করার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শারি'আহ (ইসলামী আইন) যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই রাসূল ﷺ নতুন সংযোজন নিয়ে স্বপ্নে আগমন করেছেন- এ দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ধরণের দাবী প্রকারান্তরে নিম্নোক্ত দুটি ব্যাখ্যার একটিকেই সূচিত করে:

১. হয়তো রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় ইসলাম ধর্মের প্রচারকে পরিপূর্ণ করেন নি, নতুবা

২. উম্মাতের ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই জানতেন না, তাই রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম হন নি।

এ দুটি ব্যাখ্যার উভয়ই ইসলামের মূলনীতির বিরোধী।

জাগ্রতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধায় তা অসম্ভব। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি এ ধরণের যা কিছুই দেখুক এবং এর ফলাফল যাই হোক না কেন, তা নিঃসন্দেহে শয়ত্বানের ছায়ামূর্তি। মাসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত এবং আসমানের মধ্যদিয়ে রাসূল ﷺ-এর অলৌকিক রাত্রিকালীন ভ্রমণাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিগতযুগের কয়েকজন নাবী ও রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত করান এবং রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁদের সাথে আলাপ-

---

ধরণের ধর্মীয় বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হওয়া থেকে মুসলমান জাতিকে নিরাপদ রাখার জন্যই আল্লাহ্ তাঁর নিজ দয়াগুণে শয়তানের জন্য রাছুলের আকৃতি বা রূপ ধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, যে বা যারা রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার দাবী করে ধর্মে কোন রূপ নব্যতা প্রবর্তন করে বা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের এই নব্যতা প্রবর্তন বা প্রবর্তনের ইচ্ছা কিংবা এরূপ কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারাই নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে সে বা তারা প্রকৃতপক্ষে আদৌ রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ করে নি বরং স্বপ্নে দর্শন লাভ সংক্রান্ত তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ রূপে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট। এটা যে মানুষের সাথে একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এর প্রধান স্বাক্ষী হচ্ছে তার বা তাদের অন্তর। -*অনুবাদক*

আলোচনা করেন। সুতরাং জাগ্রতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ করার দাবীদার লোকেরা মূলত নিজেদেরকে রাসূল ﷺ-এর মতো মর্যাদায় উন্নীত করতে প্রয়াস চালায়। স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ-এর দর্শন অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমের উপর ভিত্তি করেই হোক না ইসলামে কোনপ্রকার বিদ'আত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিদ'আতের নিষিদ্ধতায় রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ হতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল ﷺ হতে 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

'যে কেউ ইসলামে নতুন কিছুর (বিদ'আত) প্রবর্তন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।'[১]

---

[১] *বুখারী*, (আরবী-ইংরেজি), ৩য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃ., হাদীছ নং ৮৬১; *মুসলিম*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ৯৩১ পৃ., হাদীছ নং ৪২৬৬ এবং আবূ দাউদ, *সুনান আবী দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১২৯৪ পৃ., হাদীছ নং ৪৫৮৯।

দশম অধ্যায়

ওলী-আওলিয়া বা সন্ত পূজা

আল্লাহ্র অনুগ্রহ

কতিপয় ব্যক্তিকে অন্যদের চেয়ে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সে শুধু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পছন্দ করে থাকে। এটি মূলত আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের ফলাফল যা তিনি কিছু মানুষের প্রতি অন্যদের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী পরিমাণে দান করেছেন। পুরুষকে সামাজিকভাবে নারীর চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿٣٤﴾﴾

(سورة النساء: ٣٤)

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন" [সূরা আন্-নিসা (৪): ৩৪]

﴿...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ... ﴿٢٢٨﴾﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

"নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ২২৮]

আবার আর্থিকভাবে কিছু মানুষকে অন্যদের চাইতে উপরে স্থান করে দেয়া হয়েছে:

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ... ﴿٧١﴾﴾ (سورة النحل: ٧١)

"রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন...।" [সূরা আন্-নাহল (১৬): ৭১]

আসমানী পথনির্দেশের মাধ্যমে মানবজাতির অবশিষ্ট অন্যান্য সকল মানুষ হতে বনী-ইসরাইলদের প্রতি বেশী অনুগ্রহ করা হয়েছিল:

﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾﴾ (سورة البقرة: ٤٧)

"হে বানী ইসরাঈল। আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং পৃথিবীতে সকলের উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ৪৭]

তাছাড়া, ওহী দ্বারা শুধু নাবীগণকে মানবজাতির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানই করা হয় নি বরং কিছু নাবীকে অন্যদের তুলনায় বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... ﴿٢٥٣﴾﴾ (سورة البقرة: ٢٥٣)

"ঐ রসূলগণ এরূপ যে, তাদের মধ্যে কাউকে অন্য কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" [সূরা আল-বাক্বারা (২): ২৫৩]

তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঐসকল বস্তু বা বিষয়ের কামনা করতে নিষেধ করেছেন, যা দ্বারা তিনি মানবজাতির মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ... ﴿٤٧﴾﴾ (سورة النساء: ٣٤)

"তোমরা তা কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন।" [সূরা আন-নিসা (৪): ৩২]

কারণ, এ সকল অনুগ্রহ মূলত বড় ধরণের দায়িত্ব ও পরীক্ষা বৈ কিছুই নয়। তাছাড়া এ অনুগ্রহগুলো যেহেতু মানুষের চেষ্টা দ্বারা অর্জনের অযোগ্য তাই এটাকে অহংকার বা গর্বের উৎসমূল হিসেবে গণ্য করা কোনক্রমেই উচিত নয়। এ সকল অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কোন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা না রাখলেও, এসবের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। আর এ ব্যাপারে রাসূল আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের তুলনায় যারা উপরে তাঁদের দিকে না লক্ষ্য করে নিম্ন পদস্থদের প্রতি তাকাও।

এটা এজন্য অধিকতর কল্যাণময় যাতে তোমাদের উপরে প্রদানকৃত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার না কর।"[১]

কোন না কোনভাবে একজনকে অন্যের উপরে মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি ব্যক্তিরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, 'তোমরা সবাই দায়িত্বপ্রাপ্ত, আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।'[২]

এ জীবনের নানারকম পরীক্ষার মৌলিক উপাদান হিসেবে উক্ত দায়িত্বগুলোকে গণ্য করা হয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য আমরা যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই এবং প্রদত্ত অনুগ্রহগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব; কিন্তু এর বিপরীতধর্মী পথ অবলম্বন করলে আমাদের জীবনে অকৃতকার্যতার আগমন সুনিশ্চিত। সকল সৃষ্টির উপরে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত করাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। আর এ মহা অনুগ্রহের স্বীকৃতি মূলত আল্লাহ্‌র সেই নির্দেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, যেখানে তিনি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন আদমকে সিজদা করতে। এ দায়িত্ব প্রধানত দু'প্রকার ঃ

১. ইসলাম গ্রহণ করতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব হল আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

২. সমগ্র পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করার সমষ্টিগত দায়িত্ব।

দায়িত্ব গ্রহণ করা বা না করার জন্যই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অবিশ্বাসীদের তুলনায় বিশ্বাসীরা (ঈমানদার) অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

---

[১] ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন: ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৮, পৃ. ৩২৮, হাদীছ নং ৪৯৭; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৩০, হাদীছ নং ৭০৭০। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, এখানে উল্লেখিত হাদীছটি পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কিত, এবং ঐ সকল শ্রেষ্টত্ব বা মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে-গুলো অর্জন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে তথা যে-গুলো মানুষের এখতিয়ার বহির্ভুত। পক্ষান্তরে সৎকর্ম, আল্লাহ্‌র রহমত, মাগফিরাত, তাঁর নৈকট্য ও জান্নাতের অফুরন্ত নি'য়ামত লাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা এবং এ সকল বিষয়ে অন্যজন থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ও মনোভাব পোষণ করা শরী'আত সম্মত, যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, *"সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর।"* [কুরআন (৫): ৩] তাছাড়া বেশকটি সহীহ হাদীছ দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত।

[২] ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন- ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৮, হাদীছ নং ৭৩০; মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৭, হাদীছ নং ৪৪৯৬।

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴿١١٠﴾﴾ (سورة آل عمران: ١١٠)

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সার্বিক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।" [আল-'ইমরান (৩): ১১০]

তাক্বওয়া

ঈমানদারগণের মধ্যে কিছু ব্যক্তি অবশ্য অন্যদের তুলনায় পদমর্যাদায় উঁচু স্থানে রয়েছে। তাদের নিজস্ব কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মূলত এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে। উৎকর্ষতার এ পর্যায়টি বিশ্বাসের গভীরতা ও মূল শক্তি ঈমানের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে এমন কোন কিছু থেকে একটি জীবন্ত বিশ্বাস তার ধারককে (ঈমানদারকে) সর্বদা দূরে রাখতে ঢালের ভূমিকা পালন করে। আরবীতে এ ঢাল 'তাক্বওয়া' নামেই পরিচিত। শব্দটি বিভিন্নভাবে ভাষান্তর করা হয়, যেমন, 'আল্লাহ্ ভীতি', 'ধর্মভীরুতা' ও 'আল্লাহ্ সচেতনতা'। এছাড়াও আরো অনেক অর্থ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে *'তাক্বওয়া'র* উৎকর্ষতা সম্পর্কে প্রকাশ করেন:

﴿...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ... ﴿١٣﴾﴾ (سورة الحجرات: ١٣)

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী।" [সূরা আল-হুজরাত (৪৯):১৩]

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলছেন, তাক্বওয়াই হচ্ছে কোন ঈমানদার নারী বা পুরুষ অন্য কারও তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার একমাত্র প্রধান নির্ণায়ক। আর এ ধর্মভীরুতা বা আল্লাহ্ ভীতি মানুষকে 'চিন্তাশীল প্রাণী' থেকে পৃথিবীর প্রশাসকের মর্যাদায় (খলিফার পর্যায়ে) উন্নীত করে। একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহ্ ভীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 'তাক্বওয়া' এবং এ শব্দটি থেকে উৎপন্ন অন্যান্য শব্দ প্রায় ২৬ বার উল্লেখ করে তাক্বওয়া যে জীবন্ত ঈমানের মূল চালিকা শক্তি তা আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বসহকারে বুঝাতে চেয়েছেন। তাক্বওয়া ব্যতীত

ঈমান (বিশ্বাস) কেবল মুখস্থ করা কতগুলো গদবাঁধা অর্থহীন শব্দসমষ্টি ছাড়া কিছুই না। অনুরূপভাবে, তাক্বওয়া ব্যতীত সৎ 'আমল কেবল ভণ্ডামি ও প্রতারণা মাত্র। তাই জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের তুলনায় আল্লাহ্ ভীতিই অগ্রগণ্য। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেন,

'চারটি কারণে কোন একজন নারীকে বিয়ে করা যেতে পারে, তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা। ধার্মিক নারীকেই পছন্দ করে নাও, তাহলে সফলকাম হবে।[১]

তুলনামূলকভাবে কোন নারী অধিকতর সুন্দরী, ধন-সম্পদের অধিকারী বা উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন হলেও, ধার্মিক না হওয়ার দরুন সে মর্যাদাহীন বংশের এক গরীব, কুৎসিত ও ধার্মিক নারী অপেক্ষা হীনতর । রাসূলের ﷺ অন্য একটি হাদীছ অনুযায়ী, তিনি ﷺ বলেন,

"কোন লোকের ধর্মপরায়ণতা অবলোকন করে তুমি যদি সন্তুষ্ট হও এবং তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে সে যদি প্রস্তাব পেশ করে, তবে তোমার উচিত এ বিয়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা; অন্যথায় এ পৃথিবীতে নৈতিক অধঃপতন ঘটবে।"[২]

উপহাস করে বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে একদিন 'কালো নারীর ছেলে' বলে আহ্বান করায় আবূ জর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূল ﷺ কঠোরভাবে তিরস্কার করে বলেন,

"মনে রেখ! আল্লাহ্ ভীতি ব্যতীত তুমি বাদামী বা কালো রংয়ের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও।"[৩]

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাঁর চেষ্টা দৃঢ়ভাবে অব্যাহত রেখেছেন এই প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বটি মানুষের মাথায় প্রবেশ করানোর জন্য। এমনকি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে তিনি জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের অর্থহীনতা এবং তাক্বওয়ার সর্বাধিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়েছিলেন।

যেহেতু অন্তরই হল তাক্বওয়ার স্থান, তাই সর্বাধিক ধার্মিক ব্যক্তিগুলো সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। বাহ্যিকভাবে সম্পাদিত 'আমল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ কেবল একে অন্যের দোষ-গুণ বিচার বিবেচনা করে মন্তব্য করতে পারে, যা ঠিকও হতে পারে আবার ভ্রান্তও হওয়া সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন:

---

[১] আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত; *বুখারী* ও *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত। *বুখারী* (আরবী-ইংরেজি), খণ্ড ৭, পৃ. ১৮-১৯, হাদীছ নং ২৭ এবং *মুসলিম* (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ২, পৃ. ৭৪৯, হাদীছ নং ৩৪৫ ৭।

[২] আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত; *তিরমিযী* কর্তৃক সংগৃহীত।

[৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর কর্তৃক বর্ণিত এবং *আহমাদ* কর্তৃক সংগৃহীত।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾﴾

(سورة البقرة: ٢٠٤)

"মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে ব্যক্তি তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে অথচ সে ব্যক্তি খুবই ঝগড়াটে।" [সূরা আল বাক্বারা (২): ২০৪]

এ কারণে কোন ধর্মভীরু ও মুত্তাক্বী ব্যক্তির প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করার অনুমতি ইসলামে নেই, যার ফলে ব্যক্তিটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ বিশেষভাবে প্রদান করেন।[১] তবে এ ধরণের ঘোষণা সাহাবীদের অন্তরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ প্রদান করেন নি বরং এর ভিত্তিমূল দাঁড়িয়েছিল মূলত ওহীর উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *'বাই'আহ আর-রিদওয়ান'* নামে খ্যাত বায়'আত-এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিকারীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন,

'বৃক্ষের নীচে আনুগত্যের শপথকারীরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না।'[২]

উক্ত শপথকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের আয়াতের প্রতি তাঁর সমর্থন মূলত নিশ্চিত হয়েছে এ কথার মাধ্যমে:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ... ﴿١٨﴾﴾

(سورة الفتح: ١٨)

"মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে।" [সূরা আল-ফাত্হ (৪৮): ১৮]

একইভাবে, জান্নাতের অধিবাসী বলে সবাই যাদেরকে ধারণা করত, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে রাসূল ﷺ জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেন। এ ধরণের সকল

[১] এদের মধ্যে দশজন বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁরা হলেন, আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, ত্বালহা, আয্-যুবাইর, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যায়িদ, 'আব্দুর রাহমান ইবনে 'আওফ, আবূ 'উবাইদা ইবনে আল-যাররাহ্। দেখুন, *আল-আক্বীদা আত্ব-ত্বহাভীয়া,* পৃ. ৪৮৫-৪৮৭।

[২] যাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ছহীহ *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩৪, হাদীছ নং ৪৫৭৬।

সিদ্ধান্ত ওহী নির্ভর ছিল। ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'উমার ইবনে আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন তাকে বলেন যে,

"খাইবারের যুদ্ধের দিনে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকজন সাহাবী এসে বলল, 'অমুক অমুক শহীদ এবং অমুক অমুক শহীদ', কিন্তু তারা যখন এক লোক সম্পর্কে বলল, 'অমুক শহীদ', তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করলেন, 'কোনক্রমেই নয়! আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি লুটের মাল থেকে অসৎভাবে নেয়া জোব্বা পরা অবস্থায়।' তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'ইবনে আল-খাত্তাব! বাইরে বেরিয়ে যাও এবং লোকজনের মধ্যে ঘোষণা করে জানিয়ে দাও যে, কেবল ঈমানদারেরাই জান্নাতী হবে।'"[১]

কথিত আধ্যাত্মিকতা অর্জনের দাবীদার হিসেবে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে খ্রিস্টানী ঐতিহ্য মতে যুগের পর যুগ ধরে প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে রাখা হয়েছিল। নানা রকম অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব'লে তাদেরকে গণ্য করা হতো এবং 'সন্ত ' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল। প্রাক খ্রিস্টানী যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে কিছু কিছু শিক্ষক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সিঁড়ি বেয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বলে ভাবা হতো এবং এদের মাধ্যমে বিভিন্ন অলৌকিক কৃতিত্ব সম্পন্ন হতো বলে এ সব ব্যক্তি বিশেষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের নিমিত্তে তাদেরকে *'গুরু', 'অবতার'* ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হতো। এ সব উপাধিগুলোই সাধারণ মানুষকে আহ্বান করেছে উক্ত ব্যক্তি বিশেষকে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিতে। ফলস্বরূপ, এ ধরণের ধর্মীয় ঐতিহ্যে অনেক সাধু বা সন্ত রয়েছে যাদের প্রতি সাধারণ জনগণ আকুলতার সাথে প্রার্থনা করে। অন্যদিকে, ইসলাম কোন ব্যক্তি বিশেষের এমনকি রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করার বিরোধিতা করে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

'ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে যেভাবে খ্রিস্টানরা মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসার পাত্রে পরিণত করেছে, আমার ব্যাপারে তেমন করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখিও। বস্তুত আমি আল্লাহ্‌র নগণ্য এক দাস ব্যতীত কিছুই না। অতএব আমাকে বরং আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসূল বলেই ডাকা শ্রেয়।'[২]

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ১, পৃ. ৬৫, হাদীছ নং ২০৯।

[২] 'উমার ইবনে আল-খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত। *বুখারী* ও *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন, *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৫, হাদীছ নং ৬৫৪।

ওলী: সাধু বা সন্ত

আল্লাহ্ তা'আলা আরবী 'ওলী' (বহুবচন 'আওলিয়া') শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিকটবর্তী কাউকে বোঝাতে, যার অনুবাদ হিসেবে 'সাধু বা সন্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ শব্দটির প্রতিশব্দ নির্বাচনে আরও বেশি উপযুক্ত শব্দ হচ্ছে 'নিকটবর্তী', 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বা অভিভাবক; কারণ শাব্দিক অর্থে 'ওলী' শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বন্ধু'। এমনকি বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে উল্লেখ করতে এ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... ﴿٢٥٧﴾﴾

(سورة البقرة: ٢٥٧)

"আল্লাহ্ মু'মিনদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।" [সূরা আল-বাকারা (২): ২৫৭]

﴿...وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾﴾ (سورة آل عمران: ٦٨)

"...বস্তুতঃ আল্লাহ্ মু'মিনদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" [সূরা আল-'ইমরান (৩): ৬৮]

﴿...فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ... ﴿٩﴾﴾ (سورة الشورى: ٩)

"...আল্লাহই তো একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু..." [সূরা আশ্-শূরা (৪২): ৯]

﴿...وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾﴾ (سورة الجاثية: ١٩)

"...আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" [সূরা আল-জাসিয়া (৪৫): ১৯]

এ ছাড়া শয়ত্বানকে উদ্দেশ্য করেও *'ওলী'* শব্দটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যবহার করেছেন কিছু আয়াতে:

﴿وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا... ﴿١١٩﴾﴾

(سورة النساء: ١١٩)

"...আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কেউ শয়ত্বানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, সে সুস্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা আন্-নিসা (৪): ১১৯]

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾ (سورة الأعراف: ٢٧)

"...আমি শায়ত্বনকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি..."[সূরা আল-আ'রাফ (৭): ২৭]

﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ۝٣٠﴾ (سورة الأعراف: ٣٠)

"...তারা শায়ত্বনদেরকে তাদের অভিভাবক করে নিয়েছে..."

[আল-আ'রাফ (৭): ৩০]

নিচের আয়াত অনুসারে 'ওলী' শব্দটি *'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়'* অর্থেও ব্যবহৃত হয়:

﴿...فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ...﴾ (سورة الإسراء:)

"...কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (কিসাস দাবী করার বা ক্ষমা করে দেয়ার) কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে..." [সূরা বানী-ইসরাঈল (১৭): ৩৩]

তাছাড়া মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও কুরআনে *'ওলী'* শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন,

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... ۝٢٨﴾

(سورة آل عمران: ٢٨)

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ছাড়া কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে।"

[সূরা আল-'ইমরান (৩): ২৮]

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ... ۝١٣٩﴾ (سورة النساء: ١٣٩)

"যারা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে..."

[সূরা আন্-নিসা (৪): ১৩৯]

﴿...لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ... ۝١٤٤﴾ (سورة النساء: ١٤٤)

"...কাফিরদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না..."

[সূরা আন্-নিসা (৪): ১৪৪]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... ۝٥١﴾

(سورة المائدة: ٥١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু..." [সূরা আল-মায়িদা (৫): ৫১]

তবে 'ওলী' শব্দটির 'আওলিয়া-আল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা' হিসেবে ব্যবহার আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন করে। মানবজাতির মধ্যে কিছু বিশেষ সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত ও খুব ঘনিষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। আল্লাহ্র ওলীদের সম্পর্কে বর্ণনা সূরা আল-আনফালে পাওয়া যায় যেখানে আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿...إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾

(سورة الأنفال: ٣٤)

"...মুত্তাকীরা ছাড়া কেউ তার মুতাওয়াল্লী হতে পারে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়।" [সূরা আল-আনফাল (৮): ৩৪]

এবং সূরা ইউনূসেঃ

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

(سورة يونس: ٦٢-٦٣)

"জেনে রেখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান আনে আর তাক্বওয়া অবলম্বন করে।" [সূরা ইউনুস (১০): ৬২-৬৩]

আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, 'ওয়ালাইয়াতুল্লাহ' (আল্লাহ্র বন্ধুত্ব) নির্ণয়ের প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান (দৃঢ় বিশ্বাস) ও তাক্বওয়া (আল্লাহ্ ভীতি), এ দু'টি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। আর সকল সত্যিকার ঈমানদারগণ এ গুণাবলীর অধিকারী।[1] এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহ্র তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। এ মৌলিক নীতিটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহ্র ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহ্র আনুগত তথা ঈমান ও তাক্বওয়ার গুণ যাঁর মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি আল্লাহ্র নিকটে তত বেশি মর্যাদাবান ওলী। সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে 'ওয়ালাইয়াহ'

[1] আল-'আক্বীদা আত্ব-ত্বহাভিয়্যা, পৃ. ৩৫৮।

(আল্লাহ্‌র বন্ধত্ব) নির্ণয়ের প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে অলৌকিক কৃতিত্ব সম্পাদন করা[১], আর এ অলৌকিক কৃতিত্বকে নবী-রাসূলদের মু'যিযা থেকে পৃথক করতে সাধারণত 'কারামত' বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরণের বিশ্বাস বা ধারণা পোষণকারীদের অধিকাংশের নিকটে কারামত চর্চাকারীদের ঈমান ও 'আমলের কোন গুরুত্ব নেই। ফলে, 'ওলী' উপাধিতে ভূষিত কয়েকজনকে দেখা যায় যে, তারা খারেজি মতবাদে বিশ্বাস করার পাশাপাশি এর চর্চায় লিপ্ত। আবার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগকারী হিসেবেও কাউকে দেখা যায়। তাছাড়া তথাকথিত অনেক 'ওলী' এমনও রয়েছে যারা অসচ্চরিত্রের অধিকারী এবং অশ্লীল ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য কোথাও এ কথা বলেন নি যে তাঁর ওলী হতে হলে বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে। অতএব, পূর্বোল্লিখিত বর্ণনানুসারে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ঈমান ও তাক্বওয়াধারী প্রতিটি ঈমানদারই আল্লাহ্‌র ওলী (বন্ধু)। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ (٢٥٧) (سورة البقرة: ٢٥٧)

"আল্লাহ্ মু'মিনদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু..." [সূরা আল-বাক্বারা (২): ২৫৭]

সুতরাং কিছু বিশেষ ঈমানদারকে 'ওলী' বা 'আওলিয়া' উপাধিতে ভূষিত করে সম্বোধন করার অনুমতি ইসলামে নেই।[২] এ রকম সুস্পষ্ট ইসলামী নির্দেশ থাকা

---

[১] সাধারণ মুসলিমগণ এ বিষয়ে অনেকটা হিন্দু ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের মতো হয়ে গিয়েছেন। অলৌকিক বা অস্বাভাবিক সবকিছুকে ভক্তি করা ও পূজা করা পৌত্তলিকদের ধর্ম। পানিতে ধোঁয়া, মাটি থেকে আগুন, পাথরে পানি ইত্যাদি যা কিছু তারা অস্বাভাবিক দেখেন তাকেই ঠাকুর বলে ভক্তি করেন। এমনকি কোন গরু যদি অস্বাভাবিক দুধ বা বাছুর দেয় তাঁরা সেই গরুকেও ঠাকুর বলে ভক্তি ও পূজা করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকতা দেখলে তাকে স্রষ্টার শক্তি মনে না করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর শক্তি মনে করে তাকে পূজা করেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থাও একইরূপ। যেখানে তাওহীদের মাধ্যমে মানুষকে সকল প্রকার কুসংস্কার, অমঙ্গলধারণ ও সৃষ্টির উপাসনা থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসক অকুতোভয় দৃঢ়হৃদয় মানুষ তৈরি করেছে ইসলাম, সেই ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞতা, অতিভক্তি ও কুসংস্কারের কারণে মূর্তির চোখের পানি, মাছের গায়ের ময়লা, পুকুরের কাদা, পীর নামধারীর পায়ের ধুলা ময়লা, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যের ভাক্তর মাধ্যমে মঙ্গললাভ ইত্যাদি কুসংস্কার ও শির্কের মধ্যে লিপ্ত। (*এহ্ইয়াউস সুনান*, পৃ. ৫০৮)

[২] একটি বিষয় আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কার ইবাদাত আল্লাহ্ কতটুকু কবুল করেছেন বা কে আল্লাহ্‌র কতটুকু নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলী তথা বন্ধু তা একমাত্র তিনিই জানেন। কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছে যাঁদের ঈমান ও তাক্বওয়া কবুল হওয়ার এবং জান্নাতী হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্‌র প্রিয় বা ওলী বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ এভাবে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌র প্রিয় বা ওলী-আওলিয়া বা জান্নাতী বলে

সত্ত্বেও, তথাকথিত মুসলিম ওলী-আওলীয়া, সাধু বা সাধকদের মর্যাদার প্রাধান্য প্রদান সুফি সমাজ ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হয়েছে। কৃতিত্বের উৎকর্ষতার উর্ধ্ব ক্রমানুসারে সে সব ওলী হচ্ছে ঃ ***আখিয়্যার*** (মনোনীত), যাদের সংখ্যা ৫০০ থেকে ৭০০ জন; ***আবদাল*** (স্থলাভিষিক্ত)[১] এর সংখ্যা ৪০ জন; ৭ জন ***আবরার*** (ধর্মপরায়ণ); ৪ জন ***আওতাদ*** (কীলক বা খুঁটি); ৩০০ জন ***নুক্বাবা*** (প্রহরী); ***কুতুব*** (শক্ত অবলম্বন), যে সমকালীন শ্রেষ্ঠ ওলী হিসেবে পরিগণিত হয়। ওলী সংক্রান্ত এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে ***গাউছ*** (ত্রাণকর্তা)। ঈমানদারদের গুনাহের কিয়দাংশ ***গাউছ*** নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেন বলে অনেকেই বিশ্বাস করে। মরমীবাদীদের বিশ্বাস অনুসারে, সালাতের সময় মক্কায় উঁচু স্তরের তিন শ্রেণীর ওলী অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হন।[২] প্রত্যেক শ্রেণীর ওলী একটি বিশেষ পদে অবস্থান করেন এবং বিশিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। কোন ***গাউছ*** মৃত্যুবরণ করলে, ***কুতুব*** তার স্থলাভিষিক্ত হয় অর্থাৎ যখন কোন শ্রেণীতে কোন স্থান খালি হয়, তখন পরবর্তী নিম্ন শ্রেণীর একজনকে উন্নীত করে সেই স্থান পূর্ণ করা হয়। এভাবে প্রত্যেকেই উপরের স্তরে আগমন করতে থাকে অর্থাৎ প্রতিটি পুণ্যাত্মা তার স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হয়। প্রয়োজনমত পানি

কাউকে বিশ্বাস করা ইসলামী বিশ্বাস ও আক্বীদার পরিপন্থী। এমনকি আমরা এটুকুও বলতে পারি না যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনই। কোন 'আমলই জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয় না। কোন কারামত বা অলৌকিকত্বও এ বিষয়ে কোন রকম প্রমাণ পেশ করে না। কারামতের কারণে কেউ উম্মতের 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইল্‌মে গায়বের আধিকারী হতে পারেন না। জীবিত বা মৃতাবস্থায় তাঁর প্রতি তা'যীমী সিজ্‌দা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর ওসীলায় প্রার্থনা নিবেদন করা স্পষ্ট শির্ক বলে গণ্য হবে। কারণ আমরা যাকে কারামত মনে করছি তা শয়ত্বানী অলৌকিকত্ব বা ইস্তিদরাজ কি না তা কেউ বলতে পারবে না। কুরআন থেকে জানা যায় যে, অনেক সময় কারামতের অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। তবে সাহাবীগণকে আমরা নিশ্চিন্তে ওলী ও জান্নাতী বলতে পারি, কারণ কুরআনে তাঁদের সকলের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ও পরবর্তী মুবারক দুই যুগে সাধারণত কাউকে ওলী বলা হতো না। অতএব নির্দিষ্টভাবে কাউকে 'ওলী' উপাধি প্রদান করা সুন্নাতের খেলাফ। [সূরা আ'রাফ (৭): ১৭৫-১৭৭; তাবারী, তাফসীর ৯/১১৯-৩০; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/২৬৫-৬৮] -*অনুবাদক*

[১] *'আবদাল'* শব্দটি আরবী *'বদল'* শব্দের বহুবচন। সূফীগণের বিশ্বাস, এঁরা সাধারণের দৃষ্টিগোচর থাকেন এবং বিশ্বের যথাযথ ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। হুজবীরীর মতে এঁদের সংখ্যা ৩০০ জন। (কাশফুল-মাহজুব, পৃ. ২৬৯; নিকলসন কর্তৃক অনূদিত কাশফুল-মাহজুব, পৃ. ২১৪) *আবদালকেই* কখনো কখনো *আবরার* বলা হয়।-*অনুবাদক*

[২] এ ধরণের কথা মরমিবাদী অথবা সূফী মুসলমান সমাজে যারা স্পষ্টতই ভণ্ড বা লাল শালুর দল হিসেবে সুপরিচিতদের দাবী বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে, যে-সব সূফী বাহ্যত কুরআন ও ছুন্নাহ্‌র অনুসারী ও বিশ্বাসী, এটা তাদের দাবী নয়।

বর্ষণ, শত্রু প্রতিরোধ, বিপদ মুক্তি ইত্যাদি কাজ তাঁদের মাধ্যমে বা তাঁদের সুপারিশের কল্যাণে হয় বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন।[১] তসবীহ দানা (গুটিকার মালা) ও মিলাদ যেভাবে নেয়া হয়েছে জপমালা ও বড়দিন হতে, তেমনিভাবে এ সকল পৌরাণিক কাহিনীমালারও উৎপত্তি খ্রিস্টান ধর্ম থেকে।

ফানা ঃ স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আত্মার একীভূতকরণ

তথাকথিত খ্যাতিমান ওলীগণের তালিকার প্রতি একটু ভালভাবে দৃষ্টিপাত করলে **'আল-হাল্লাজ'**[২] এর মতো নাম লক্ষ্য করা যায়, যাকে "আনাল-হাক্ব" অর্থাৎ

---

[১] Encyclopedia of Islam, পৃ. ৬২৯। দেখুনঃ আলী ইবনু উছমান আত-হুজবীরী, কাশফুল মাহজুব (নিকলসন কর্তৃক অনূদিত, মুদ্রণ ১৯৭৬), পৃ. ২১৪।

[২] আবুল মগীছ আল-হুসাইন ইবনু মানসূর ইবনু মাহাম্মা আল-বায়দাবী আল-হাল্লাজ ছিলেন একজন পারস্যবাসী তর্কশাস্ত্রবিদ এবং ভাবপ্রবণ সূফী। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি আরবীতে পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করতেন। তিনি আনুমানিক ২৪৪ হি. (৮৫৮ খ্রি.) সালে বায়দা (ফারস)-এর নিকটবর্তী আত তুর-এ জন্মগ্রহণ করেন। ২৬০ হি. (৮৭৩ খ্রি.) হতে ২৮৪ হি. (৮৯৭ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি তুসতারী, 'আমর মাক্কী, জুনায়দ প্রমুখ সূফী শিক্ষকদের সাথে নির্জনবাস (খালওয়া) অবলম্বন করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে বৈরাগ্য সাধন ও আধ্যাত্মবাদ প্রচারের নিমিত্তে বের হন। এ উদ্দেশ্যে একজন দাঈর ন্যায় খুরাসান, আহওয়ায, ফারস, ভারত (গুজরাট) এবং তুর্কিস্তান পরিভ্রমণ করেন। ২৯৬ হি. (৯০৮ খ্রি.) সনে তিনি মক্কা হতে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর ভক্তগণ সমবেত হয়। তাঁর প্রচারিত বিভ্রান্ত আক্বীদা হল 'আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব (তানযীহ) সৃষ্টি সীমার উর্ধ্বে হওয়া, অসৃষ্ট ইলাহী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার যা সাধকের সৃষ্ট রূহের (আত্মার) সঙ্গে মিলন ঘটে, সাধক তখন আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হয়ে যায় এবং বাকস্ফূর্ত হয় আনাল হাক্ব (আমিই আল্লাহ্)' এবং তাসাউফ হল, 'দুঃখ-দুর্দশা বরণ এবং তাতে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হওয়া।' ফলে তিনি মুতাযিলীগণ কর্তৃক একজন বাকচতুর এবং ইমামিয়া ও জাহিরিয়্যাগণকর্তৃক একজন সমাজচ্যুত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হন। আব্বাসী খলিফা কর্তৃক তিনি দু'বার ধৃতও হন। তিনি উযীর ইবনু ঈসার নিকটে গেলে তাকে (আল হাল্লাজ-কে) ৩০১ হি. (৯১৩ খ্রি.) সনে বিশেষ ধরণের শাস্তি প্রদান করা হয়। তিনি বাগদাদের কারাগারে আট বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। আল-মুকতাদিরের মা শাগাব এবং হাজিব নাসরের অভিভাবকত্বের ফলে উযীর হামিদ তার প্রতি রুষ্ট হন এবং মালিকী ফিকহের বিচারক আবূ উমার কর্তৃক সমর্থিত একটি ফাতওয়া অনুসারে সাত মাস মামলা পরিচালনার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। মঙ্গলবার ২৪ যুলকাদ ৩০৯ হি. মোতাবেক ২৬ মার্চ ৯২২ সালে বাগদাতের নতুন কারাগারের মুক্ত প্রাঙ্গনে (নদীর ডানতীরে) 'বাবুত তাক'-এর বিপরীত দিকে *আল হাল্লাজ*-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। হাল্লাজের দণ্ডবিধান সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলী একমত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। তথাকথিত কামিল দরবেশ বলে তিনি বিশেষ জনপ্রীয় এবং ভক্তির পাত্র ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। A. Muller এবং D'Herbelot তাঁকে একজন ছদ্মবেশী খ্রিস্টান বলে মনে করেন। Reiske তাঁকে আল্লাহ্‌র নিন্দুক বলে অভিযোগ করেন। Tholuck তাকে দুর্বোধ্য ও আপত বিরোধী; Kremer তাঁকে অদ্বৈতবাদী, Kazanski তাঁকে স্নায়ুরোগী এবং Browne তাঁকে বিপজ্জনক ও সুপটু ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়েছেন। তবে তথাকথিত সূফীগণ তাঁকে

'আমিই সত্য' (আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই) নামক কুখ্যাত ঘোষণা দ্বারা স্রষ্টাত্বের দাবী করার দুঃসাহস দেখানোর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের জন্য প্রকাশ্যে ফাঁসি প্রদান করা হয়েছিল। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ... ﴿٦﴾﴾ (سورة الحج: ٦)

"এ রকম হয় এজন্য যে, আল্লাহ্ হলেন সত্য সঠিক, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করেন..." [সূরা আল-হাজ্জ (২২): ৬]

বিকৃতমস্তিষ্ক আল-হাল্লাজকে এ ধরণের ঘোষণা দিতে মূলত উদ্বুদ্ধ করেছিল এক মূলনীতির উপরে বিশ্বাস, যা 'নির্বাণ' বা বৌদ্ধ ধর্মে চরম অবস্থা প্রাপ্তির এক দশা বলে পরিচিত।[১] বৌদ্ধ ধর্মের এক শাখার শিক্ষা অনুযায়ী, অহংবোধ বা অহমিকার অন্তর্ধান ঘটে এবং মানুষের আত্মা এবং চেতনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[২]

তাছাড়া 'মরমিবাদ'[৩] নামক এক দর্শনের মূলরূপেও ক্রিয়া করে এ তত্ত্ব। 'মরমিবাদ'[৪] হচ্ছে স্রষ্টার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের তত্ত্ব। স্রষ্টার সাথে মিলনের মাধ্যমে একাত্মতা অন্বেষণই মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলে এ তত্ত্বানুসারীগণ মনে করে।

অবশ্য শহীদের মর্যাদা প্রদান করেছেন। তাঁর নিগৃহীত শাগরিদগণ আল-আহওয়াযে আবূ উমারা আল হাশিমী এবং খুরাসানে ফারিস আদ-দীনাওয়ারীর পাশে সমবেত হয়েছিলেন। এই শেষের দলভূক্ত আবূ সাঈদ কর্তৃক পারস্যে এবং আহমাদ ইয়েসেবী এবং নেসীমী কর্তৃক তুরস্কে মরমী কবিতার পুনর্জাগরণ সংঘটিত হয়েছিল। (*Encyclopedia of Islam, পৃ. ৪৯৫-৯৬*)

[১] 'নির্বাণ' হল সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে 'নিবিয়ে দেওয়া'। মূলত পার্থিব সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি ঘটানো বা পাপ ও তার পরিণামের কবল থেকে উদ্ধার তথা নাজাত লাভ করে স্বর্গবাসের ব্যবস্থাকে বুঝায়। এ শব্দটির উৎপত্তি বেদ শাস্ত্র (ভগবত গীতা এবং বেদ) থেকে হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটি বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। ***হিনাইয়ানা*** বৌদ্ধ ধর্মে এ শব্দটিকে যেখানে বিলুপ্তি বা ধ্বংস অর্থে বোঝানো হয়, সেখানে ***মহায়না*** বৌদ্ধ ধর্মে স্বর্গসুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (W.L. Resse, *Dictionary of Philosophy and Religion,* New Jersey: Humanities Press, 1980, p. 393)

[২] *Dictionary of Philosophy and Religion,* p. 72

[৩] মুসলিম সমাজে 'সূফীবাদ' ও 'মরমীবাদ' প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত, অর্থাৎ মরমীবাদ ও সূফীবাদ দু'টি এক বিষয় নয়। বরং এগুলোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

[৪] গ্রীক শব্দ "Mystes" -এর অর্থ হচ্ছে "যে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত"। গ্রীক মরমিয়া ধর্ম থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে, যা "Mystes" নামক শব্দটির বাহন হিসেবে কাজ করে। (*Dictionary of Philosophy and Religion,* p. 374)

মরমীবাদের উৎসমূলের সন্ধান বিভিন্ন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের লেখায়, যেমন 'প্লেটোর রচনাসংগ্রহ'-তে পাওয়া যায়, যেখানে ক্রমোন্নতির একাধিক দুর্গম, খাড়া ও শক্ত সিঁড়ির উল্লেখ রয়েছে, যার মাধ্যমে সফল আরোহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন আত্মা স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।[১] অনুরূপ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মে, যেখানে ব্রহ্মার (মানবীয় বৈশিষ্টহীন চূড়ান্ত সত্তা) সঙ্গে আত্মার (মানবাত্মা) সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে; যা অর্জন করাই চূড়ান্ত লক্ষ্য, জীবিত অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে পুনর্জন্ম লাভের একমাত্র উপায়।[২] গ্রীক মরমীবাদ চিন্তাধারা বিকশিত হয় আধ্যাত্মিক খ্রিস্টান আন্দোলনের মাধ্যমে, যা ভ্যালেন্টিনাস (১৪০ খ্রি.)-এর মতবাদস্বরূপ দ্বিতীয় শতাব্দি পর্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। 'নিও-প্যাটোনিজম' নামক এক ধর্মীয় দর্শন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দিতে মিশরীয়-রোমান দার্শনিক পোটিনাস (২০৫-২৭০ খি.) কর্তৃক এ সব আধ্যাত্মিক দর্শন একত্রিতকরণ সম্পন্ন হয়। এ শতাব্দির যে সব খ্রিস্টান বৈরাগী ও সাধকগণ মিশরের মরুভূমিতে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সন্ন্যাস প্রথার প্রবর্তন ঘটায়, তারা সমসাময়িক 'নিওপ্যাটোনিক' তত্ত্বে প্রস্তাবিত কঠোর তপস্যা ও ধ্যানের মাধ্যমে নিজ সত্তাকে অস্বীকারের মাধ্যেমে আধ্যাত্মিকভাবে স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হওয়ার ধারণার বাহকে পরিণত হয়। যদিও 'সেন্ট প্যাকোমিয়াস' (২৯০-৩৪৬ খ্রি.) নামক এক ব্যক্তি খ্রিস্টান সাধক সর্বপ্রথম সন্ন্যাসব্রতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং মিশরের মরুভূমিতে নয়টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু, বাস্তবে নারসিয়ার বেনেডিক্টকে (৪৮০-৫৪৭ খ্রি.) পাশ্চাত্য সন্ন্যাসব্রতের প্রকৃত প্রবর্তক হিসেবে গণ্য করা হয় যে ইটালির মন্টে ক্যাসিনো আশ্রমের জন্য বেনেডিকটাইন নীতি প্রণয়ন করে।[৩] ইসলামী রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়ে মিশর, সিরিয়া এবং এ রাষ্ট্রদ্বয়ের সন্ন্যাসবাদ চর্চার প্রধান কেন্দ্রসমূহকে ইসলামী রাষ্ট্রসীমার অন্তর্ভুক্ত করার এক শতাব্দি পরে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সন্ন্যাস পন্থী খ্রিস্টানদের অনুসৃত আধ্যাত্মিক রীতির অনুশীলন মুসলমানদের মধ্যেও বিকশিত হতে শুরু করে।[৪] শারী'আহর (ইসলামী আইন) প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে

---

[১] *Colliers Encyclopedia,* খণ্ড ১৭, পৃ. ১১৪।

[২] *Dictionary of Religions,* পৃ. ৬৮।

[৩] *Dictionary of Philosophy and Religion,* পৃ. ৩৬৫-৩৬৬, ৩৭৪।

[৪] মুসলিমদের মরমীবাদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থের খ্রিস্টান লেখকগণ সূফীবাদের *'ফানা'*-কে বৌদ্ধ ধর্মের *'নির্বাণ'*-এর সঙ্গে তুলনীয় মনে করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো কারো মতে মতে, এ ধরণের তুলনা সম্পূর্ণরূপে অনুপোযোগী, কারণ বৌদ্ধ ধর্মের *'নির্বাণ'* তত্ত্ব আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় তথা স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা পুরোপুরি স্বতন্ত্র; বরং নির্বাণের সাথে আত্মার দেহান্তরবাদ অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরবাদের সংশ্রব আছে। আর এ দেহান্তরপ্রাপ্তি তথা পুনর্জন্মের মাধ্যমেই 'নির্বাণ' তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'ত্বরীক্বা' নামে শারী'আহর সমান্তরাল অন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থাটি হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মে বিদ্যমান স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতির অনুরূপ। এ ধরণের অনুশীলনের চূড়ান্ত পর্যায়কে ***ফানা*** (সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি) ও ***উসূল*** (ইহকালে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে ***মাক্বামাত*** (অবস্থান) এবং ***হালাত*** (অবস্থা) নামক কিছু প্রাথমিক ও ধারাবাহিক স্তর অতিক্রম করতে হয়। এ পন্থায় স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভের জন্য এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে। ***যিকর*** -এর এ অনুশীলন সাধারণত মাথা ও শরীর নির্দিষ্ট মাত্রায় ঝাঁকিয়ে এবং কোন কোন সময় নৃত্যের মাধ্যমে (তথাকথিত পীর-মাশাইখদের মাথা ঝাঁকানো যিকর) সম্পন্ন করা হয়। এ সব চর্চার বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরস্পর সংযুক্ত সূত্রের মাধ্যমে রাসূলের (ﷺ)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যদিও কোন সহীহ্ হাদীছের সমর্থন এর পেছনে নেই। কালক্রমে এ ধরণের অনেক ত্বারীক্বার আবির্ভাব ঘটেছে এবং খ্রিস্টান মরমীতত্ত্বের মতই প্রতিষ্ঠাতাদের নামে ত্বারীক্বাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, যেমন- ক্বাদীরিয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্বশাবন্দী, তীজানী ইত্যাদি। তাছাড়া তথাকথিত ত্বারীক্বাগুলো সম্পর্কে নানা রূপকথা ও গল্পগাঁথা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। খ্রিস্টান ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের ন্যায় তারা সাধনার জন্য জনবিচ্ছিন্ন আশ্রমে অবস্থান করাকে পছন্দ করে থাকে। সুফিদের এ আশ্রমকে ***খানক্বাহ*** বলা হয়।

অন্যপক্ষে মুসলিম মরমীবাদের ব্যাপারটি ভিন্ন, এ ক্ষেত্রে আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি মতাদর্শ বিদ্যমান থাকার কোন প্রশ্নই জড়িত নেই, বরং তাতে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান একটি স্রষ্টার সত্তার অস্তিত্বের ধারণা প্রবলরূপে প্রতীয়মান। *'ফানা'* শব্দের মুসলিম সূফীদের ধারণার সদৃশ ধারণা খ্রিস্ট ধর্মেও পাওয়া যায়। কতিপয় খ্রিস্টান লেখকদের মতে এ ধারণার উৎসমূল খুঁজতে হবে। এ ক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্ম থেকে এটির উৎপত্তি হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। *'ফানা'* শব্দের অর্থ হল, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে বিলুপ্তকরণ। আর এ ধারণাই হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের মরমীবাদের মূল কথা। তবে *'ফানা'* শব্দটি সূফীতন্ত্রের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ বিলোপপ্রাপ্তি বা ধ্বংসপ্রাপ্তি। যিনি পরিপূর্ণ সূফী হতে পেরেছেন তিনি অবশ্যই নিজের সত্তার বিলোপ সাধনরূপ অবস্থায় উপনীত হন। সূফী সমস্ত সৃষ্ট বস্তু হতে দৃষ্টি পরিহার করে তাঁর লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখবেন। এভাবে সাকুল্যে আত্মবিলোপ সাধনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করে তিনি অনন্ত জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হন। মরমিয়াবাদ অনুসারে, মানবের আমিত্ববোধ যতগুলি মানবীয় গুণ (সিফাত) সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেই সিফাতগুলোর বিলোপ সাধন করা, যাতে সূফী একমাত্র আল্লাহ্‌র মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌তে পরমধন্য হতে পারেন। প্রকৃত সূফী বলতে তাকেই বুঝায় যার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই এবং তিনি নিজেও কারো মালিকানাধীন নন। এটিই আত্মবিলুপ্তির (ফানা) সারমর্ম। এ ধরণের অনুভূতি চরম পরিপূর্ণতা লাভ করলে তাকে ফান-ই-কুল্লী অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি বলে। (*Shorter Encyclopedia of Islam*, পৃ. ৯৮; নিকলসন কর্তৃক অনূদিত *'কাশফুল-মাহজুব'*, পৃ. ২০, ২৩)

কালক্রমে আধ্যাত্মিকভাবে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বিশ্বাস নির্ভর কিছু নতুন তত্ত্ব বিকশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথাকথিত ত্বরীক্বায় জোরালোভাবে দাবী করা হয়, উসূল স্তরে উন্নীত হলে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করা যায়। রাসূল ﷺ মিরাজের সময় আল্লাহ্কে দেখতে পেরেছিলেন কি না- এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে 'আয়িশা رضي الله عنها জিজ্ঞাসা করলে তিনি ﷺ উত্তর দেন যে, তিনি আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেন নি বলে জানান।[১] পাহাড়ের উপরে মূসা عليه السلام-এর প্রতি ওহী অবতরণকালীন সময়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্তার খুব সামান্যতম অংশবিশেষ পাহাড়ের ওপর প্রকাশ করলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনার মাধ্যমে মূসা عليه السلام-এর নিকটে প্রমাণ করে দেখান যে, ইহকালে কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্কে দর্শন করতে পারবে না; কারণ তা মানব অস্তিত্বের সহ্যসীমা বহির্ভূত বিষয়।[২] কিছু সুফী জোরালোভাবে এ রকম দাবী করে যে, কেউ উসূল স্তরে উপনীত হলে শরী'আতের বিধানুযায়ী অবশ্য পালনীয় (ফরয) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের বিষয়টি আর বাধ্যতামূলক থাকে না। তাদের অধিকাংশই এমন সব উপায়ের কথা বলে যে, শুধু রাসূল ﷺ নয় বরং তথাকথিত ওলী-আওলিয়াদের মাধ্যমেও আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা প্রেরণ করা সম্ভব। সুফী তত্ত্বের অনুসারী অনেকেই আবার ঐ সব ওলী-আওলিয়াদের খানক্বাহ বা ইবাদাত করার স্থান ও ক্ববরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ[৩], কুরবানী এবং অন্যান্য ইবাদাত করা শুরু করে থাকে। মিশরে অবস্থিত যায়নাব ও সায়্যিদ আল বাদাই-এর ক্ববর, সুদানে অবস্থিত মুহাম্মদ আহমেদের (মাহ্দী) ক্ববর এবং ভারত ও পাকিস্তানের অসংখ্য সাধক ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের দরগাহকে ঘিরে তাওয়াফ করতে দেখা যায়।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে শরী'আতকে বাহ্যিক উপায় হিসেবে অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হওয়া শুরু হল। অন্যদিকে ত্বরীক্বা নির্ধারিত হল কতিপয় বিজ্ঞজনের জন্য প্রযোজ্য অন্তর্নিহিত পথ হিসেবে। এ সুফী তন্ত্রকে সমর্থনের নিমিত্তে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করে অপব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হল। ভিত্তিহীন জাল হাদীছের সাথে গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কিছু ভ্রান্ত গ্রন্থ রচিত হল। এ গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে বিগত সময়ের চিরন্তর ইসলামী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করা হল। আর

---

[১] ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১১-১১২ পৃ., হাদীছ নং ৩৩৩৭, ৩৩৩৯ এবং পৃ. ১১৩, হাদীছ নং ৩৪১।

[২] [কুরআন (৭): ১৪৩]

[৩] ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে কোন কিছুর চতুর্দিকে হাঁটতে থাকা।

ক্রমান্বয়ে এ নব্য ভ্রান্ত ও মিথ্যাপূর্ণ গ্রন্থগুলোকে সাধারণ জনগণের নাগালে পৌঁছাতে সকল প্রচেষ্টা চালানো হল। বেশিরভাগ আধ্যাত্মিক পরিবেশে গান-বাদ্যের প্রয়োগ দেখা গেল। গাঁজার মত মাদকদ্রব্য সেবন সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণের মাধ্যমে মিথ্যা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায় বলে স্বীকৃতি পেল। এরই ধারাবাহিকতায় সুফীদের নতুন প্রজন্মে 'মানবাত্মার সঙ্গে আল্লাহ্‌র একাত্মতা সম্ভব' নামক এক ভ্রান্ত বিশ্বাসের সূচনা করল। আব্দুল ক্বাদীর জিলানীসহ আরো কয়েকজন ধার্মিক ব্যক্তিদের উপরে কিছু বিশেষ গুণ আরোপ করা হয়। তবে, তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। এ দু'টির একাত্ম হওয়ার কোন উপায় নেই, কারণ একটা পক্ষ হচ্ছে স্রষ্টা যিনি আসমানী ও অসীম এবং অন্যপক্ষ হচ্ছে মানুষ নামক সসীম এক সৃষ্টি।

স্রষ্টার সঙ্গে মানবের একাত্মতা

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অগোচরে কোন কিছুই নেই। অতএব, যারা এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণের মাধ্যমে সকল কর্ম সম্পাদন করে তারাই জ্ঞানী। ফলে তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র উপস্থিতি অনুভব করে। সতর্কতার সঙ্গে তারা সকল বাধ্যতামূলক (ফরয) দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করে থাকে। এরপর সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহকে পূরণের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সৎকর্ম (সুন্নাত ও নফল) সম্পাদনের চেষ্টা করে। এ সব স্বেচ্ছামূলক (নফল) কার্যাবলী তাদের উপর আরোপিত বাধ্যতামূলক (ফরয) দায়িত্বের পূর্ণাঙ্গতা নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা শৈথিল্য আসতে পারে; কিন্তু যারা সর্বদা স্বেচ্ছামূলক (সুন্নাত ও নফল) কার্যাবলী সম্পাদনে অভ্যস্ত, তারা এ মূহূর্তে অনেক সুন্নাত ও নফল কার্যাদি আদায়ে সক্ষম না হলেও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় (ফরয) দায়িত্বগুলোর পূর্ণাঙ্গতা অটুট রাখতে সক্ষম হতে পারে। অন্যদিকে রক্ষামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ কারো আয়ত্বে কিছু যদি নফল কাজ না রক্ষিত থাকে এবং এ অবস্থায় বাধ্যতামূলক (ফরয) দায়িত্ব পালনে শারীরিক অলসতার শিকার হয়, তাহলে ফরয দায়িত্বগুলো বর্জন করা বা অবহেলা করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কেউ যত বেশী নফল কাজের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক (ফরয) দায়িত্বগুলো বলিষ্ঠ করে, ততই তার জীবন শরী'আর সঙ্গে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এ রীতিটিই আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে একটি হাদীছে অবহিত করেছেন:

'আমার নৈকট্য অর্জন এবং বন্ধু (ওলী) হওয়ার জন্য বান্দা যত 'আমল করে তার মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি (ফরয পালনই

আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রিয়তম কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার দর্শনেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার নিকটে আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।’[১]

আল্লাহ্‌র ওলী কেবল তাই শ্রবণ, দর্শন ও ধারণ করবে এবং সে অনুপাতে জীবন অতিবাহিত করবে যা হালাল (আইন সম্মত)। পক্ষান্তরে জোরালোভাবে সে যাবতীয় হারাম বিষয় বা হারামের দিকে ধাবিত করে এমন বিষয়সমূহ এড়িয়ে চলে। এ লক্ষ্য অর্জনই প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়ার উপযুক্ত। এ বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে দ্বৈত ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে তা অনুসরণ করা ব্যতীত এ সফলতা অর্জন কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। প্রথমতঃ বাধ্যতামূলক (ফরয) দায়িত্বগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তারপর শারী‘আতে ইসলামিয়াহর নির্দিষ্ট করে দেয়া সুন্নাত ও নফল কার্যাবলী প্রকৃত সুন্নাহ অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে হবে। এ সকল বিষয়ে যে যতটুকু অগ্রসর হবেন, তিনি ততটুকু আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করবেন। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দিতে বলেছেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ... ﴿٣١﴾﴾ (سورة آل عمران: ٣١)

“বলে দাও, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।” [সূরা আল-‘ইমরান (৩): ৩১]

সুতরাং দৃঢ়ভাবে একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশাবলীর (কুরআন ও সুন্নাহ) অনুসরণ ও সতর্কতার সাথে এ সত্য ধর্মে প্রবর্তিত যাবতীয়

---

[১] আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এবং *বুখারী* কর্তৃক সংগৃহীত, (আরবী-ইংরেজি), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৩৬, হাদীছ নং ৫০৯।

নতুন বিষয়াবলীকে (বিদ'আত) বর্জনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ বলেছেন:

"তোমরা দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত (পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি ও রীতিনীতি) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত (কর্মপদ্ধতি ও জীবনধারা) আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার! নব-উদ্ভাবিত কার্যাদি থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে। কারণ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল নব-উদ্ভাবিত বিষয়। আর প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই 'বিদ'আত' এবং সকল "বিদ'আত"-ই বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।[১]

এ বিধানের একনিষ্ঠ অনুসারী তাই শ্রবণ করে যা আল্লাহ্ তাকে শ্রবণ করান। সত্যপথের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾﴾

(سورة الفرقان: ٦٣)

"রহমানের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলাফেরা করে আর অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করলে তারা বলে— 'শান্তি', (অর্থাৎ তারা বিতর্কে লিপ্ত হতে চায় না)।" [সূরা আল-ফুরক্বান (২৫): ৬৩]

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ... ﴿١٤٠﴾﴾

(سورة النساء: ١٤٠)

"কিতাবে তোমাদের নিকট তিনি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরী হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে...।" [সূরা আন্-নিসা (৪): ১৪০]

এভাবে যখন কেউ শুধু তাই শ্রবণ করে যা আল্লাহ্ তাকে শ্রবণ করাতে ইচ্ছা করেন, তখন রূপকার্থে আল্লাহ্ তার শ্রবণেন্দ্রিয়তে পরিণত হন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির দৃষ্টি, হাত ও পদযুগলে পরিণত হন।

---

[১] আবূ দাউদ, নাসাঈ। *সুনান আবী দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯৪, হাদীছ নং ৪৫৯০ এবং তিরিমিযি। মূল হাদীছটি সহীহ মুসলিমেও রয়েছে, ২/৫৯২-৯৩।

পূর্বোল্লিখিত বুখারীর হাদীছের এটাই ব্যাখ্যা যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি মানুষের দৃষ্টির মাধ্যম, হাত ও পদযুগল হয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশত তথাকথিত সুফীরা ও তাদের অনুসারীরা এ হাদীছটির অপব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে একাত্মতার সমর্থনে ব্যবহার করেছে।

রুহুল্লাহ : আল্লাহ্র আত্মা

মানুষের আত্মার সঙ্গে আল্লাহ্র একাত্ম হওয়া সম্ভব-এ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে কুরআনের কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ... ﴿٩﴾﴾ (سورة السجدة: ٩)

"আর তার ভিতরে স্বীয় রূহ হতে ফুঁক দিয়েছেন...।"

[সূরা আস্-সাজদাহ (৩২): ৯]

এবং

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي... ﴿٢٩﴾﴾ (سورة الحجر: ٢٩)

"আর তাতে আমার পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দেব...।" [সূরা আল-হিজ্র (১৫): ২৯]

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي... ﴿٧٢﴾﴾ (سورة ص: ٧٢)

"আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব...।" [সূরা স-দ (৩৮): ৭২]

এ আয়াতগুলোকে এমন বিশ্বাসের সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের দেহে আল্লাহ্র অংশবিশেষ ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্তার যে অংশবিশেষ তিনি আদম (ﷺ)-এর মধ্যে সঞ্চারিত করেন। স্বাভাবিকভাবেই বংশ পরস্পরায় তার উত্তরসূরীগণও এর ধারক ও বাহক হয়ে গেছে বলে দাবী করা হয়। নাবী ঈসা ﷺ-এর উদাহরণও এ প্রসঙ্গে প্রদান করা হয় যার মাতা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا...﴾ (سورة الأنبياء:)

"সে তার সতীত্বকে সংরক্ষণ করেছিল। অতঃপর আমি তার ভিতর আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম...।"

[সূরা আল-আম্বিয়া (২১): ৯১ এবং সূরা আত্-তাহরীম (৬৬): ১২]

এভাবে তথাকথিত সুফি মতাদর্শের অনুসারীরা এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, মানুষের মধ্যস্থিত এ আসমানী চিরন্তন আত্মা যেখান থেকে উৎসারিত হয়েছিল সেই মূল উৎসের সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে থাকে। তবে এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়। বাংলা ভাষার মতো আরবী ভাষার সম্বন্ধবাচক সর্বনামগুলো (আমার, আমাদের, তোমার, তোমাদের, তার) বাক্যের ভাব অনুযায়ী সাধারণত দুটি অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমত এগুলোর দ্বারা কারো বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়। দ্বিতীয়ত মূল উৎসের অংশ বিশেষ রূপে পরিগণিত হতেও পারে আবার নাও পারে এমন অধিকৃত স্বত্বের বর্ণনা বিধৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ মূসা (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত আদেশটি উল্লেখ্যঃ

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ... ﴿٢٢﴾﴾

(سورة طه: ٢٢)

"আর তোমার হাত বগলে দিয়ে টান, তা ক্ষতিকর নয় এমন শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে...।" [সূরা ত্ব-হা (২০): ২২]

'জামা' এবং 'হাত' উভয়ই মূসা (আঃ)-এর একান্ত নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতটি তাঁর দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিধানের বস্ত্রটি অধিকার ভুক্ত হলেও তাঁর শরীরের অংশ বিশেষ নয়। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে সমমর্যাদা প্রদান করা যাবে না।[1]

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্‌র অনুপম দয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই বলেনঃ

﴿...وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ... ﴿١٠٥﴾﴾ (سورة البقرة: ١٠٥)

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে স্বীয় দয়ায় নির্দিষ্ট করে নেন...।"[সূরা বাক্বারা (২): ১০৫]

আল্লাহ্‌র অন্যতম একটি গুণ হচ্ছে তাঁর দয়া। এটি কোনক্রমেই সৃষ্টি জীবের অংশবিশেষ নয়। একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টির উপর পূর্ণ অধিকার, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতে- এ কথা বুঝানোর জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুকে তাঁর বলে উল্লেখ করেন।

আবার সকল সৃষ্টির মধ্যে যাদেরকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা প্রদান করেন, তাদের প্রসঙ্গে তিনি 'তাঁর' বলে উল্লেখ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, নাবী সালেহ

[1] *তাইসীর আযীয আল-হামীদ*, ৮৪-৮৫ পৃ.।

ﷺ-এর উম্মাত সামূদ সম্প্রদায়ের নিকটে প্রেরিত উষ্ট্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে নাবী সালেহ ﷺ যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করতে আল্লাহ্ বলেন:

﴿...هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ... ﴿٧٣﴾﴾

(سورة الأعراف: ٧٣)

"এটি হল আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য নিদর্শন, তাকে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও... ।" [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ৭৩]

সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি নিদর্শন হিসেবে অলৌকিকভাবে উষ্ট্রীটিকে প্রেরণ করা হয়। সমগ্র পৃথিবী যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্র যমিন তাই সেটিকে তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করা থেকে বিরত রাখার কোন অধিকার তাদের ছিল না। একইভাবে ইবরাহীম (আব্রাহাম) ﷺ এবং ইসমাঈল ﷺ-এর সঙ্গে কা'বা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেন:

﴿...أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾

(سورة البقرة: ١٢٥)

"আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।" [সূরা বাক্বারা (২): ১২৫]

কেবল সত্যপথের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিচার দিবসে জান্নাত সম্পর্কে বলবেন, *"আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"*[১]

অতএব, আল্লাহ্র অন্যান্য সৃষ্টির মত আত্মাও (রূহ্) তাঁর একটি সৃষ্টি। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٧﴾﴾

(سورة الكهف: ٨٥)

"তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, 'রূহ্ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)। এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" [সূরা আল-কাহফ (১৭): ৮৫]

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

---

[১] ফাজর (৮৯): ৩০

﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾﴾ (سورة آل عمران: ٤٧)

"... আল্লাহ্ যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, "হয়ে যাও" সুতরাং তা হয়ে যায়।" [সূরা আল-'ইমরান (৩): ৪৭]

তিনি আরও বলেন:

﴿...خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾﴾ (سورة آل عمران: ٥٩)

"মাটি দ্বারা আদমকে গঠন করে আল্লাহ্ বললেন, 'হয়ে যাও'। ফলে সে হয়ে গেল।" [সূরা আল-'ইমরান (৩): ৫৯]

'হও' নামক আদেশটি সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব আত্মাও আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামে আল্লাহ্‌কে নিরাকার সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির মতো শারীরিক সত্তা বা নিরাকার আত্মার অধিকারী নন। আল্লাহ্ তা'আলা সে রূপের অধিকারী যা তাঁর মহিমার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে রূপ মানুষ কোন দিন দেখে নি বা কল্পনাও করে নি এবং তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য একমাত্র জান্নাতবাসীরাই (মানুষের সীমাবদ্ধতার মাত্রানুপাতে) অর্জন করবে।[1] সুতরাং সমগ্র মানবজাতির তুলনায় আদম ﷺ-এর বিশিষ্ট অবস্থান বুঝাতে এবং কুমারী মরিয়ামের গর্ভে ঈসা ﷺ-এর জন্ম সম্পর্কে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীভূত করতেই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আদম ﷺ ও ঈসা ﷺ-এর মধ্যে তাঁর স্ব-আত্মা উৎসারিত ফুৎকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ কর্তৃক ফুৎকারের মাধ্যমে রূহ প্রবিষ্ট করার মতো বিষয়টি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটি ব্যাখ্যা। কারণ, ফিরিশতারাই সাধারণত মানবদেহে রূহ্ প্রবিষ্ট করা এবং তা হরণ করার কর্ম সম্পাদন করে থাকে। ইবনু মাস'ঊদ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে এ বিষয়টির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন,

"মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ তৈলাক্ত পদার্থের আকারে, এরপর চল্লিশ দিন জোঁকের আকৃতিতে রক্তপিণ্ডের আকারে, আরও চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডের আকারে- এ তিন পর্যায়ের মিলিতরূপে তোমার সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন এবং সে তোমার মধ্যে ফুৎকারের মাধ্যমে রূহ্ প্রবিষ্ট করে...।"[2]

---

[1] এ বিষয়ে আরও বেশি জানতে ৯ম অধ্যায় 'আল্লাহ্‌র দর্শন' দেখুন।

[2] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৪র্থ খণ্ড, ২৯০-২৯১ পৃ., হাদীছ নং ৪৩০ এবং *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১৩৯১ পৃ., হাদীছ নং ৬৩৯০।

এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশতাদের দ্বারা প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীবনসঞ্চারকারী রূহ্ প্রবিষ্ট করান। *'তিনি ফুৎকার প্রদান করলেন'*- এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুত আমাদেরকে স্মরণ করান যে, সৃষ্টিতে যা ঘটে একমাত্র তিনিই তার প্রধান কারণ, যেমন তিনি বলেন:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (سورة الصافات: ٩٦)

"আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আর তোমরা যা তৈরি কর সেগুলোকেও।" [সূরা আস্-স-ফফাত (৩৭): ৯৬]

বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কয়েক'শ হাত দূরে অবস্থানরত শত্রুপক্ষের দিকে রাসূল ﷺ এক মুঠো ধূলো ছুঁড়ে দেন। কিন্তু সেই ছোট এক মুঠো ধূলোকে আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকভাবে শত্রুপক্ষের সকলের চোখে পৌঁছানের ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কর্মকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

﴿... وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ... ﴿١٧﴾﴾ (سورة الأنفال: ١٧)

"...তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন... ।"

[সূরা আল-আনফাল (৮): ১৭]

সুতরাং *'স্বয়ং আল্লাহ্ যখন ফুৎকারের মাধ্যমে আত্মা প্রবিষ্ট করেন'*-এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য আত্মার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট আত্মাটিকে (যেমন, আদম ﷺ ও ঈসা ﷺ-এর রূহ্) বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তবে এটার অর্থ এই নয় যে, আলাহ তাঁর নিজ সত্তার কোন কিছু ফুঁ দিয়ে আদম ﷺ ও ঈসা ﷺ-এর মাঝে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। কুমারী মরিয়ামকে অবহিত করতে আল্লাহ্ তা'আলা এক ফিরিশতাকে প্রেরণ করে 'তাঁর রূহ্' বলে অভিহিত করার মাধ্যমে তিনি এ ঘটনাটিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন:

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾﴾ (سورة مريم: ١٧)

"তখন আমি তার (মরিয়মের) কাছে আমার রূহ্কে (অর্থাৎ জিব্রীলকে) পাঠিয়ে দিলাম। তখন সে (অর্থাৎ জিব্রীল) তার সামনে পূর্ণ মানুষের আকৃতি ধারণ করল।" [সূরা মারইয়াম (১৯): ১৭]

কুরআন একটি পরিপূর্ণ কিতাব। এর আয়াতগুলো একে অপরের ব্যাখ্যাস্বরূপ। তাছাড়া রাসূলের বক্তব্য (হাদীছ) এবং অনুশীলন (সুন্নাহ) কুরআনের আয়াতগুলোকে আরও ব্যাপক অর্থবহ ও সুস্পষ্ট করে তোলে। কুরআনের আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ ও পটভূমির বর্ণনা ব্যতিরেকে উল্লেখ করলে খুব সহজেই তার

প্রকৃত অর্থের বিকৃতি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আল-মাঊনের চতুর্থ আয়াতের কথা বলা যায়:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤﴾ (سورة الماعون: ٤)

"অতএব দুর্ভোগ সে সব সলাত আদায়কারীর।" [সূরা আল-মা'উন (১০৭): ৪]

এ আয়াতটি কুরআনের বাকী অংশ এবং ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, সমগ্র কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা সলাতকে বাধ্যতামূলক (ফরয) করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١٤﴾ (سورة طه: ١٤)

"প্রকৃতই আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার 'ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর।" [সূরা ত্ব-হা (২০): ১৪]

তথাপি সলাত আদায়কারীদের প্রতি যে লা'নত বর্ষিত হয় তা এ আয়াতটিতে বিধৃত হয়েছে। যা হোক, এর পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে বিষয়টির প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট হয়:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧﴾ (سورة الماعون: ٥-٧)

"যারা নিজেদের সলাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।" [সূরা মা'উন ১০৭: ৫-৬]

নিষ্ঠাবান সলাত আদায়কারী ঈমানদার ব্যতীত মিথ্যা ঈমান আনয়নের দাবীদার মুনাফিক সলাত আদায়কারীদের প্রতি লা'নত বর্ষিত হয়।

"আমি যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব"- এ আয়াতটি আরও অধিক অর্থপূর্ণ ভাষান্তর এমন হতে পারে। "তাকে সঠিকভাবে তৈরি করার পর, একটি আত্মাকে তার মধ্যে প্রবেশ করান।"

ফলে, মরমিবাদের মতাদর্শে প্রচলিত মানবাত্মা কর্তৃক এর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র সঙ্গে পুনর্মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টির কোন ভিত্তির অস্তিত্ব আল্লাহ্র ওহী কুরআনে নেই। মানব সম্পর্কিত আরবী শব্দ রূহ্ (আত্মা, বহুবচনে- আরওয়া) এবং নাফ্স-এর মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে এটি দেহের সাথে সম্পৃক্ত হলে নাফ্স বলে অভিহিত করা হয়।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ... ﴿٤٢﴾﴾

(سورة الزمر: ٤٢)

"আল্লাহ্ প্রাণ গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়, আর যারা মরে নি তাদের নিদ্রাকালে... ।" [সূরা আয্-যুমার (৩৯): ৪২]

উম্মু সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"আত্মাকে যখন হরণ করা হয়, চক্ষু তাকে অনুসরণ করে মুদিত হয়।"[১]

সকল সৎকর্মপরায়ণ আত্মাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এ নির্দোষ আত্মাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾

(سورة الفجر: ٢٧-٣٠)

"(অপর দিকে নেককার লোককে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রব্ব-এর দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট হয়ে এবং (তোমার রব্ব-এর) সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে। অতঃপর আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা আল-ফাজ্র (৮৯): ২৭-৩০]

অতএব, সৎকর্মপরায়ণ মানবাত্মা আল্লাহ্র মাঝে বিলীন বা তাঁর মহান সত্তার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে সসীম আত্মা সসীম দেহের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে পরিণামে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সময় পর্যন্ত জান্নাতের সুখ উপভোগ করতে থাকবে।

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৩৭ পৃ., হাদীছ নং ২০০৫।

একাদশ অধ্যায়

ক্ববর পূজা

সমাধিস্থকরণের সময়ে ও তৎপরবর্তীকালে মৃতকে সম্মান দেখাতে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ভক্তিমূলক ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন ও ক্ববরকে বিশেষভাবে শোভিতকরণের মাধ্যমে সজ্জিত সমাধি নির্মাণের কারণে মানবীয় ইতিহাসের অধিকাংশ সময় সত্য ধর্মে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে, মানবজাতির বেশিরভাগই কোন না কোন ধরণের ক্ববর পূজার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। পুরো মানবজাতির প্রায় এক চতুর্থাংশের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে চীনদেশবাসী; আর এদের অধিকাংশের ধর্ম মূলত দেবতাজ্ঞানে পূর্বপুরুষদের পূজা করার ধর্ম। তাদের বেশিরভাগ ধর্মানুষ্ঠান ক্ববরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধিত্বমূলক।[১] হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের পুণ্যবান ব্যক্তিদের ক্ববরসমূহ পবিত্র স্থান (মন্দির বা গীর্জা ইত্যাদি) হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর এ স্থানগুলোতে উপাসনাস্বরূপ ব্যাপকভাবে প্রার্থনা, বলিদান (দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু বা প্রাণী), তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় মুসলমান শাসক শ্রেণী ও জনগণ ইসলামের মূল বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি লাভ করে। ফলে অমুসলিমদের পৌত্তলিক (শির্কী) প্রথা ও চর্চাসমূহ এ সব নাম সর্বস্ব মুসলিম কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। 'আলীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-মতো সাহাবী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আশ-শাফী' (রহ.)-এর মতো প্রধান ফক্বীহগণ এবং

---

[১] চীনদেশীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যবাহী সমাজে দেবতাজ্ঞানে পূর্বপুরুষদের *(Pai Tsu)* প্রতি পরম ভক্তি জ্ঞাপন করা একটি অতি প্রাচীন, অটল ও প্রভাবক্ষম তত্ত্ব। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, মৃত ব্যক্তির *Hun* (পবিত্র আত্মা) এবং *P'o* (অপবিত্র বা মন্দ আত্মা) সাধারণত নিজের অস্তিত্ব ও সুখের জন্য তাদের বংশধর কর্তৃক প্রেরিত আধ্যাত্মিক অর্থ, ধূপধুনোর সুবাস, খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর দানের উপর নির্ভরশীল। ফলে যদি কেউ এ সকল বস্তুকে মৃতের প্রতি উৎসর্গ করে তবে এর প্রতিদান হিসেবে *Hun* (পবিত্র আত্মা) অলৌকিকভাবে সেই ব্যক্তির পরিবারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম। তবে সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কটি কেবল তিন থেকে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে বলে ধারণা করা হয়। তারপর আত্মাসমূহ অতিসাম্প্রতিক আত্মার মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। *(Dictionary of Religions,* পৃ. ৩৮*)*

সুফী হিসেবে খ্যাত জুনাইদ বাগদাদী ও 'আব্দুল ক্বাদির জীলানীর মতো *'ওলী'*দের কবরের উপর বিশাল আকারের সৌধ (গম্বুজ) নির্মাণ করা হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা *মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ* এবং সুদানের তথাকথিত মাহ্দীর কবরের উপরও অতি সাম্প্রতিক প্রথাগত সেই সমাধি নির্মিত হয়েছে। এ সকল সৌধের চারদিকে তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে অনেক অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণ বহুদূর থেকে আগমন করে থাকে। এমনকি অনেকেই এ সমাধি তথা মাজারগুলোর ভিতরে ও বাইরে অবস্থান করে মৃতের নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করে। তাছাড়া, এ সব জায়গায় কেউ কেউ পশু-পাখি নিয়ে এসে ধর্মীয় বা মৃতের উদ্দেশ্যে তথা সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে জবেহ্ করে। কবরে প্রার্থনাকারীর অধিকাংশই এ মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে যে, সৎকর্মপরায়ণ মৃত ব্যক্তিরা যেহেতু আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী তাই অন্যান্য জায়গায় 'ইবাদাত করার চাইতে তাঁদের নিকটে বা আশেপাশে অবস্থান করে ইবাদাতের কর্ম সম্পাদন করলে তার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এছাড়া, এ সকল বিশেষ মৃতব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা শান্তি অবতীর্ণ হওয়ায় এদের আশেপাশের সব কিছু নিশ্চয়ই শান্তি লাভে ধন্য হয় বলেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়। এমনকি যে জমির উপর ঐ সমাধি বা মাজার নির্মিত হয়েছে তাতে আল্লাহ্‌র করুণাধারা প্রবাহিত হয়। এ সকল বিশ্বাসের জের ধরেই ক্ববর ও মাজার পূজারীরা কিছু অতিরিক্ত শান্তি বা করুণা লাভের আশায় ক্ববর ও মাজারের দেয়ালে হাত মুছে তা নিজের শরীরের উপর বুলায়। ক্ববরবাসীর উপর বর্ষীয়মান শান্তি ও করুণার কারণে এর আশেপাশের স্থানও প্রভাবিত এবং এ স্থানের মাটিতে রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা রয়েছে -এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভর করে ক্ববর পূজারীরা প্রায়ই তাদের নির্দিষ্ট কবরের চারপার্শ্বের মাটি সংগ্রহ করে। ইমাম হুসাইন কারবালা প্রান্তরে যেখানে শহীদ হন সেখানকার কাদা মাটি শিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ কয়েকটি শাখার অধিকাংশই সংগ্রহ করে। তারপর মাটিকে আগুনে সেঁকে ছোট ছোট পাতখণ্ড তৈরি করে এবং সলাতের সময় তার উপর সিজদা করে।

মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করা:

ক্ববর পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সাধারণত দু'ভাবে মৃত ব্যক্তির নিকটে তাদের প্রার্থনা নিবেদন করে:

১. কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গণ্য করে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্যাথলিকরা (খ্রিস্টানরা) যেভাবে তাদের পাদ্রীদেরকে

ব্যবহার করে ঠিক তদ্রূপ তারা মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করে। প্রথমত, পাদ্রীদের নিকটে ক্যাথলিকরা তাদের পাপকে স্বীকার করে, এরপর পাদ্রীরা তাদের পক্ষ হয়ে স্রষ্টার নিকটে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করে। এভাবেই সাধারণ জনগণ এবং স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাদ্রীদেরকে গণ্য করা হয়।

একইভাবে প্রাক-ইসলামী যুগেও আরবের লোকেরা মূর্তিদেরকে তাদের মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করত। আরবের মুশরিকরা এ সম্পর্কে যা বলত তা আল্লাহ্ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেন:

﴿...مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى... ﴿٣﴾﴾ (سورة الزمر: ٣)

"আমরা তাদের ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।" [সূরা আয্-যুমার (৩৯): ৩]

কিছু কবর পূজারী এমন রয়েছে যে, তারা মৃতব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করে তাদের অভাব-অনটন ও বালা-মুসীবত দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য। তাদের তুলনায় সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র অধিকতর নিকটবর্তী এবং মৃত্যুর পরেও তারা যে কোন মানুষের প্রার্থনা শুনতে এবং তা পূরণ করতে সক্ষম-এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মূলত কবর ও মাজার পূজার উদ্ভব ঘটেছে। জীবিতদের প্রতি মৃতব্যক্তির করুণা প্রদর্শনের জন্য তাকে মধ্যস্থতাকারী মূর্তি বলে মনে করা হয়।

২. অনেকেই তাদের কৃত পাপের জন্য মৃতব্যক্তির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ কাজের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র গুণাবলী (আত-তাওয়াব) আরোপ করে মৃত ব্যক্তির উপর। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই মানুষের অনশোচনা জ্ঞাপন করা হয়। পাপের ক্ষমা কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব। কেননা একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল (আল-গাফূর)। এ সব কবর বা মাজার পূজারীদের কর্মকাণ্ড এবং ক্যাথলিক তথা খ্রিস্টানদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অভূতপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, হারানো জিনিস ফিরে পেতে থেবসের সন্ত অ্যান্থনির নিকটে প্রার্থনা করা হয়।[১] অনরূপভাবে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে, দূরারোগ্য ব্যাধিতে আরোগ্য লাভে, অনিশ্চিত বিয়ে অথবা এ ধরণের আরও অনেক বিষয়ে ধর্মযাজক জুড থ্যাড্ডাউসের নিকটে প্রার্থনা করা হয়।[২]

---

[১] *The World Book Encyclopedia,* (Chicago: World Book, Inc., 1087), vol. 1, p. 509.

[২] *The World Book Encyclopedia,* (Chicago: World Book, Inc., 1087), vol. 11, p. 146.

কোন ব্যক্তি কোথাও যাত্রা শুরু করলে তাকে পাহারা দিতে ভ্রমণকারীর রক্ষক সন্ত ক্রিস্টোফারের নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করত। এ প্রথার প্রচলন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি বহাল ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটে যায় একটি ঘটনা। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পোপের নির্দেশক্রমে যখন এ সন্তটির নাম তালিকা থেকে কাটা পড়ে, তখন সবাই নিশ্চিত হয়েছিন যে উক্ত সন্তটি সম্পূর্ণভাবেই কল্পিত ছিল।[১] এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে সব খ্রিস্টান যারা সাধারণভাবে নাবী যিশুকে (ঈসা ﷺ) স্রষ্টার পুত্র অথবা মানবরূপী স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে। অধিকাংশ খ্রিস্টান স্রষ্টা (আল্লাহ্) ব্যতিরেকে যিশুর নিকটেই তাদের প্রার্থনা ও আকুতি-মিনতি পেশ করে। একই অবস্থা মুসলমানদের, কারণ সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণ এমনও রয়েছে যারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের ইবাদাতকে নির্দিষ্ট করেছে।

ক্ববর বা মাজার পূজার এ দুই পদ্ধতিকেই ইসলাম সম্পূর্ণরূপে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম আমাদেরকে জানায় যে, কোন মানুষ মারা গেলে সে ***বারযাখ*** নামক এক অন্তরালের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে তার সকল কার্যাদির পরিসমাপ্তি ঘটে। সে জীবিত লোকদের জন্য কিছুই করতে পারে না, যদিও তার কর্মফলের দরুন জীবিতরা প্রভাবিত হতে পারে এবং অব্যাহতভাবে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে পারে। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

'কোন ব্যক্তি মারা গেলে তিনটি ব্যতিরেকে তাঁর সকল 'আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে: মানুষের জন্য কল্যাণকর এমন দান ও জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ সর্বদা উপকৃত হয়, সৎকর্মশীল সন্তান-সন্ততি যারা তার কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র নিকটে দু'আ করে।[২]

রাসূলের ﷺ সঙ্গে কারো খুব ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সে ব্যক্তির জন্য কোনই কল্যাণ করতে পারবেন না বলে বর্ণনা করার সময় তিনি অনেক কষ্ট অনুভব করছিলেন। তাঁর অনুসারীদেরকে এ বিষয়টি জানাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছেন:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾﴾

(سورة الأعراف: ١٨٨)

---

[১] *The World Book Encyclopedia,* (Chicago: World Book, Inc., 1087), vol. 3, p. 417.

[২] ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ৮৬৭ পৃ., হাদীছ নং ৪০০৫।

"বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি ফায়দা হাসিল করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। যারা ঈমান আনবে আমি সেই সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া অন্য কিছু নই।"

[সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৮৮]

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন:

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾﴾ (سورة الشعراء: ٢١٤)

"আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।"

[সূরা আশ্-শু'আরা (২৬): ২১৪]

-এ আয়াতটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'হে কুরাইশ গোত্রের লোকজন, আল্লাহ্‌র নিকটে তোমাদের মুক্তি নিশ্চিত করো (সৎ 'আমলের মাধ্যমে)। হে 'আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারি না। হে (আমার চাচা) 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব, আমি কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারি না। হে (আমার ফুফু) ছাফীয়্যা, আমি কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারি না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাত্বিমা, যা কিছু চাওয়ার আছে চাও, কিন্তু এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে সহায়তা করতে পারি!"[১]

অন্য একটি ঘটনা সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক সাহাবী রাসূলের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলল, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।' তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন,

'তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানিয়ে নিলে?!' বরং এ রকম বলো, 'আল্লাহ্ তা'আলার একার ইচ্ছাই চূড়ান্ত।'[২]

---

[১] *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ., হাদীছ নং ৪০২; ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮-৪৭৯ পৃ., হাদীছ নং ৭২৭-৭২৮।

[২] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* ১/২১৪, ২৮৩, ৩৪৭। এ প্রকার বাক্য বলা বিশ্বাসের প্রকৃতি ভেদে শির্‌কে আসগার বা আকবার-এর অন্তর্ভুক্ত। এই শির্‌কের প্রকৃতি হল, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোন প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহ্‌র পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে

মনে হয়। যেমন, বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মু'মিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেরই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শির্‌ক আসগার বলে গণ্য হবে। যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দু'টিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শির্‌ক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শির্‌ক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহ্‌র সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে 'আল্লাহ্‌র এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না' তবে তাও উপরের কথার মতোই শির্‌ক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোন বিষয়ে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে বলতে পারেন, 'এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে', অথবা 'আপনি যা চাইবেন তাই হবে'। যেমন, বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন, 'আল্লাহ্ ও আপনি যা চান তাই হবে', 'আগে আল্লাহ বাদে আপনি', 'উপরে আল্লাহ জমিনে জনগণ'; তবে তা উপরের কথাগুলোর মতো শির্‌ক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, 'হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শির্‌ক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি বলেন, 'হে সম্রান বা আমীর, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন...' তবে তা শির্‌ক বলে গণ্য হবে না।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়:

প্রথমত, মানবীয় ইচ্ছার পরিসর সকলেরই পরিজ্ঞাত। মানুষ তারা ইচ্ছাধীন বা কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের ইচ্ছা লৌকিক এবং মাহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা 'অলৌকিক' বা 'অপার্থিব'। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে। তিনি 'হও' বললেই সব হয়ে যায়। এরূপ 'ইচ্ছা'-র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এরূপ 'অলৌকিক' ইচ্ছা আছে বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ্ খুশি হয়ে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শির্‌ক আকবার এবং মহান আল্লাহ্‌র নামে জঘন্য মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ্ কাউকে এরূপ ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে কোথাও জানান নি। মূলত 'আরবের কাফিরদের শির্‌কের মূল ভিত্তি ছিল এরূপ চিন্তা। তারা নাবী, ওলী-আওলিয়াদের মুজিযা-কারামত এবং ফিরিশতাদের দায়িত্ব ও সুপারিশগ্রহণ বিষয়ক ওহীর নির্দেশনাগুলোকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে এ সকল বিষয়কে তাদের অলৌকিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করত। কেউ যদি এরূপ অর্থে বলে যে, 'আল্লাহ্ এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শির্‌ক আকবার এবং এর সংশোধনী হল 'মহান আল্লাহ্ একাই যা চান তাই হবে, অন্যের ইচ্ছার কোনই মূল্য নেই'।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা ও মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচ্ছাধীন কোন বিষয়ের আলোচনায় বলেন, 'আল্লাহ্ এবং আপনি যা চান' অথবা বলেন, 'আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চান' এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তবে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সর্বোপরি কার্যকর, তবে তার এ কথাটি শির্‌ক আসগর। তার বিশ্বাস সঠিক থাকলেও তার কথায় তার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে এরূপ বাক্যের সংশোধনী হল 'আল্লাহ যা চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা' বা অনুরূপ বাক্য।

কাতীলা বিনতু সাইফী (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "একজন ইহূদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে বলেন, 'আপনারা তো শির্‌ক করেন, কারণ আপনারা বলেন: 'আল্লাহ্ যা চান এবং তুমি যা চাও' এবং আপনারা বলেন: 'কা'বার কসম'। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা বলবে: 'আল্লাহ্ যা চান,

এরপর তুমি যা চাও', এবং বলবে: 'কা'বার প্রতিপালকের কসম'।" (হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* ৪/৩৩১; নাসাঈ, *আস-সুনান,* ৭/৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ, ১/২৬৩; হাদীছ ছহীহ) হুযাইফা (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা বলবে না, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে' বরং তোমরা বলবে, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে'। (আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* ৪/২৯৫; বাইহাকী, *আস-সুনানুল* কুবরা, ৩/২১৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহা, ১/২৬৩-৬৫; হাদীছ ছহীহ) তুফাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ (ﷺ) বলেন, "তিনি স্বপ্নে কতিপয় খৃষ্টানকে দেখে তাদেরকে বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে 'মাসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'। তখন তারা বলে, 'তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে 'আল্লাহ্ যা চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা চান'। এরপর তাঁর সাক্ষাত হয় একদল ইহূদীর সাথে। তিনি বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে 'উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র'। তখন তারা বলে, 'তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে 'আল্লাহ্ যা চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা চান'। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করে তাঁকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অন্যদেরকে জানিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, তাঁর গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, তোমাদের ভাই (তুফাইল) যে স্বপ্ন দেখেছে তা তোমরা জেনেছ। তোমরা এরূপ কথা বলতে যা আমি অপছন্দ করতাম, শুধু লজ্জার কারণে তোমাদেরকে নিষেধ করি নি। তোমরা বলবে না 'আল্লাহ্ যা চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা চান', বরং তোমরা বলবে 'আল্লাহ্ একাই যা চান, তাঁর কোন শরীক নেই'। (হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* ৪/৩৩১; আহমাদ, *আল-মুসতাদরাক,* ৩/৫২৩; নাসাঈ, *আস-সুনান,* ৬/২৪৪; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ, ১/২৬৪-৬৬; হাদীছ ছহীহ) অন্য হাদীছে 'আয়িশা (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা বলবে না 'আল্লাহ্ যা চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা চান' বরং বলবে 'আল্লাহ্ যা একাই চান'। (আবূ ইয়ালা, *আল-মুসনাদ,* ৮/১১৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২০৮-৯; সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য)

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্ যা চান অতঃপর আপনি যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীছে 'একমাত্র আল্লাহ্ যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, সাহাবীগণ 'আল্লাহ্ যা চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা চান' বলতেন তাঁর জীবদ্দশায়, যখন জাগতিকভাবে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ত এবং তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন। বিশ্ব পরিচালনা বা অলৌকিক 'ইচ্ছা' একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আমরা অগণিত আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে জানতে পারি যে, কারো কল্যাণ, অকল্যাণ, বিপদ দান, বিপদ থেকে উদ্ধার, হেদায়াত করা, ঈমান আনানো, ধ্বংস করা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ঝামেলা প্রদান করেন নি। এ ক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ তাঁর রাওযায় যেয়ে কখনোই বলেন নি যে, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ যা চান এবং এরপর আপনি যা চান, কাজেই আপনি আমাদের এ বিপদ বা অসুবিধা থেকে উদ্ধারের বিষয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করুন'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। মূলত সকল কাজে তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এছাড়া মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর মহান রাসূলের ﷺ মর্যাদা অতুলনীয়। তিনি কিছু ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ্ তা রক্ষা করতেন। যেমন, তিনি কা'বাঘরকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহ বোধ করছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ আগ্রহ পূরণ করেন এবং কা'বাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। (সূরা বাকারা: ১৪২-১৫০) কাজেই সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টাকা প্রদান, চাকুরী প্রদান, জমি দান, শাস্তি মওকুফ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বলা যায় 'হে আমীর বা হে নেতা, আল্লাহ্ যা চান এরপর আপনি যা চান', তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অনুরূপ বলায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কোন কোন বর্ণনায় এরূপ বলার অনুমতি তিনি সাহাবীগণকে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীছেই 'একমাত্র আল্লাহ্ যা চান' বলতে শিখিয়েছেন তিনি।

আল্লাহ্ তা'আলা ভাগ্যে যা নির্দিষ্ট করেছেন তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাসূলের ﷺ নেই- এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য মুসলমান কেবল রাসূলের কাছে প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা তথাকথিত বিভিন্ন ওলী-আউলীয়াদের কাছেও প্রার্থনা নিবেদন করতেও কার্পণ্য করে না। এ ভ্রান্ত চর্চাসমূহ মূলত সুফীদের একটি ভ্রান্ত দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা দাবী করে, *'রিজাল আল-গাইব'* (অদৃশ্য জগতের লোক) নামক কিছু নির্দিষ্ট আউলিয়া কর্তৃক এ মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের মধ্যে কোন পবিত্র ব্যক্তির মৃত্যু হলে অন্য আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সংক্রান্ত আউলিয়াদের শীর্ষে রয়েছে *কুতুব* (বিশ্ব নিয়ন্তা) অথবা *গাউছ্* (উদ্ধারকারী)। 'আব্দুল কাদির জীলানীকে[১] সাধারণ জনগণ *আল-গাউছ আল-'আযম (গাউস-ই-আযম)* অর্থাৎ মহান সাহায্যকারী হিসেবে অভিহিত করে[২]। বিপদ-আপদে তাঁর নিকটে অনেকেই চিৎকার করে *'ইয়া 'আব্দুল ক্বাদির আঘিছনী!'* (হে 'আব্দুল ক্বাদির, আমাকে রক্ষা কর!)-এই বলে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়।

এর কারণ, সম্ভবত, জাগতিক রাজা, বাদশাহ, আমীর, সওদাগর নেতা বা অনুরূপ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরে তার নামটি উল্লেখ করলে তাতে আনন্দিত হন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট চিরসমর্পিত। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তিনি ওহীর মাধ্যমে অবগত হতেন এবং সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এরূপ প্রশংসা তিনি অপছন্দ করতেন।

শির্ক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে, 'আমি আল্লাহ্‌র ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি', 'উপরে আল্লাহ্ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার', 'আমার জন্য আল্লাহ্ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই', 'আল্লাহ্ এবং আপনি না হলে কাজটি হতো না' ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে যদি বক্তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে তবে তা শির্ক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি কথার মধে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শির্ক আসগর বলে গণ্য হবে। আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। যেমন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হল আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা... আল্লাহ্‌র জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান। (বিস্তারিত দেখুন: *ইসলামী আক্বীদা*, পৃ. ২৬৬-৫১৩)

[১] মৃত্যুবরণ করেন ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

[২] এ ক্ষেত্রে স্মতর্ব্য যে, *'আল-গাউছ আল-আযম'* বা *'আল গাউছুল আযম'* এবং *'গাউছুল আযম'* বা *'গাউছে আযম'*- এ শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, *'আল গাউছুল আযম'*-এর অর্থ হচ্ছে 'মহানের (আল্লাহ্‌র সাহায্য)। যদিও শব্দ দু'টির অর্থ হিসেবে 'মহান সাহায্যকারী' লেখা হয়েছে, তবে, এ অর্থটি উক্ত শব্দ দুটির শাব্দিক বা পারিভাষিক অর্থ নয়। উপরন্তু, *'গাউছুল আযম'* বা *'আল গাউছুল আযম'* বলে হয়তো কেউ এ ধরণের কিছু তথা 'মহান সাহায্যকারী' মনে মনে উদ্দেশ্য করতে পারে, তবে শব্দের বাহ্যিক অর্থ বা গঠন প্রক্রিয়া বাহ্যত এ অর্থ প্রদান করে না। মূলত, এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে তা হল, ইসলামী শারিয়াতের বিধান হচ্ছে, ফাতাওয়া দিতে হবে যে কোন বিষয় বা বস্তুর বাহ্যিক রূপরেখা ও অবস্থার ভিত্তিতে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে আমরা যতটুকু জানব বা বুঝব তার উপর ভিত্তি করেই ফাতাওয়া হবে। আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তা নিয়ে টানা হেচড়া করার অধিকার নেই। –অনুবাদক

এ ধরণের শির্কের পুনরাবৃত্তি আমাদের চতুর্দিকে সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। অথচ মুসলিমরা প্রতিদিন তাদের সলাত আদায়কালে কমপক্ষে ১৭ বার বলে থাকে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ *(ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন)* অর্থাৎ *'আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'*

মৃতব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অথবা সরাসরি তাদের নিকটে প্রার্থনা করা- এ উভয় প্রকার প্রার্থনাই বৃহৎ শির্কের (শির্কে আকবার) পর্যায়ভুক্ত যা ইসলামের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তবে এ কথা খুবই দুঃখজনক হলেও তা সত্য এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ দু'ধরণের প্রার্থনা পদ্ধতি মুসলিম সমাজের ধর্মীয় পরিসীমায় বিভিন্ন রূপে অধিকাংশের অগোচরে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে। এ চর্চার সাথে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যে ভয়ংকর ঘোষণা দিয়েছেন তারই সত্যতা প্রমাণ করছেঃ

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ (سورة يوسف: ١٠٦)

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুশরিক।"

[সূরা ইউসুফ (১২): ১০৬]

তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদেরকে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা ইঞ্চি ইঞ্চি, গজ গজ করে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রতি পদে পদে এমনভাবে অনুসরণ করবে যে তারা যদি গর্তে প্রবেশ করে, তোমরা এর ব্যতিক্রম করবে না। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন কি না -এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, তারা ব্যতীত আর কারা হতে পারে?'[১]

মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কবরের পূজাসহ ক্যাথলিকরা (খ্রিস্টান) তাদের সাধুসন্তদের মূর্তিকে বা তাদেরকে যেভাবে পূজা বা ভক্তিমূলক শ্রদ্ধা করে সে বিষয়টিও এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত। ছাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

"কিয়ামাতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 'ওয়াসান' 'পূজিত দ্রব্যের' ইবাদত করবে।[২]

---

[১] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ৩১৪-৩১৫ পৃ., হাদীছ নং ৪২২; *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১৪০৩ পৃ., হাদীছ নং ৬৪৪৮।

[২] আবূ দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১১৮০-১১৮১ পৃ., হাদীছ নং ৪২৩৯; *হাকিম, আল-মুসতাদরাক,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; *ইবনু মাজাহ* এবং *তিরমিযি*। হাকিম ও যাহাবী

রাসূল ﷺ থেকে আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন,

"কিয়ামাতের পূর্বেই দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব 'যুল খালাসা'-র আশেপাশে[১] আন্দোলিত হবে। যুল খালাসাহ ছিল তাবালায় অবস্থিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা যা তারা জাহিলী যুগে ইবাদাত করত।[২]

সুতরাং ইসলাম ধর্মের উৎস এবং এর ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ফলে এ ধরণের চর্চা সম্বন্ধে প্রকৃত পটভূমি এবং এগুলোর উপর ইসলামি বিধানও পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হবে।

ধর্মের বিবর্তনমূলক পর্যায়

ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তন তত্ত্বের প্রভাবে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরে সর্বব্যাপী স্রষ্টা হওয়ার গুণাবলী আরোপের মাধ্যমে প্রাচীনকালের মানুষ কর্তৃক ধর্মের উন্মেষ ঘটেছিল।[৩] এ তত্ত্বের অনুসারীদের মতানুসারে, বিদ্যুৎ চমকানো, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত ধ্বংসাত্মক শক্তি অবলোকন করে প্রাচীনকালের মানুষেরা বিস্মিত হয় এবং এ সব শক্তিকে তারা অলৌকিক (অতি প্রাকৃতিক) সত্তা বলে মনে করেছিল। ফলে, দলনেতা বা অন্য কোন শক্তিশালী গোষ্ঠীর নিকটে তারা যেভাবে সাহায্য কামনা করত, ঠিক একইভাবে তারা এ শক্তিগুলোকে সন্তুষ্ট করার উপায় সন্ধান করত। আর এভাবেই প্রাচীনকালে

হাদীছটিকে ***বুখারী*** ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ***'ওয়াছান'*** (الوثن) বলতে মূর্তি, প্রতিমা ও যে কোন প্রকার পূজিত দ্রব্য বা বস্তু বুঝানো হয়। আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম তখন আমার গলায় ছিল একটি স্বর্ণের ক্রশ। তিনি আমাকে বলেন, তোমার গলা থেকে এ ***'ওয়াছান'*** বা পূজিত বস্তুটি ফেলে দাও। [তিরমিযী, *আস-সুনান,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮। তিরমিযী হাদীছটিকে গরীব বলেছেন।] এ সকল হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, মূর্তিপূজা, দ্রব্য পূজা, স্মৃতি বিজড়িত স্থান বা বস্তু পূজার মতো শির্কও মুসলিম উম্মাতের কারো কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। বাস্তব অবস্থাও তাই সাক্ষ্য দেয়। (বিস্তারিত দেখুন: *ইসলামী 'আক্বীদা,* পৃ. ৪৫০-৬২) *-অনুবাদক*

[১] ইবনু আছীর, *আন-নিহায়্যা ফী গারীব আল-হাদীছ ওয়া আল-আছার,* (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৬৩), ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃ.।

[২] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৯ম খণ্ড, ১৭৮ পৃ., হাদীছ নং ২৩২; ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, ১৫০৬ পৃ., হাদীছ নং ৬৯৪৪।

[৩] থমাস হোবসকে (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রি.) অনুসরণ করে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬ খ্রি.) তাঁর লিখিত *'Natural History of Religion'* নামক গ্রন্থে এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য, গ্রন্থটি ১৭৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। (*Dictionary of Religion*, ২৫৮ পৃ.)।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বা বলিদানের মতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নদী, বন-জঙ্গল ইত্যাদির আত্মা আছে বলে বিশ্বাসকারী উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ[১] কর্তৃক অনুসৃত ধর্মের সর্বপ্রাণবাদ নামক তত্ত্বকে ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[২]

সর্বপ্রাণবাদের এ পর্যায়ে বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তৎকালীন সময়ে একটি করে ব্যক্তিগত দেবতা ছিল। তারপর পরিবার প্রথা চালু হলে পারিবারিক দেবতাগণ ব্যক্তিগত দেবতাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। ভারতের হিন্দুরা একাধিক দেবতার উপাসনায় লিপ্ত এবং এদের প্রতিটি পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব দেবতা রয়েছে- এ বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামের তাগিদে পরিবার সম্প্রসারিত হয়। ফলে গোত্রের উদ্ভব ঘটে। পরিবারের পুরাতন দেবতাদের স্থান পর্যায়ক্রমে গোত্রের দেবতাদের দখলে চলে যায়। প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের আগমনে গোত্রের পরিধি ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে, ফলে দেবতাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতেই থাকে। অবশেষে, সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তি সীমাবদ্ধ করা হয় দুটি প্রধান দেবতার মাঝে। এদের একজনকে মঙ্গলের দেবতা এবং অন্যজনকে অমঙ্গলের দেবতা মনে করা হয়। বিবর্তনবাদীদের মতানুসারে, এ পর্যায়ের বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় পারস্যের অধিবাসী জোরাস্ট্রিয়ানদের ধর্মে। পারস্যের সংস্কারক 'জরথুস্ট' (গ্রীক ভাষায় 'জোরাস্টার)-এর পূর্বে পারস্যবাসীরা প্রাকৃতিক আত্মা, গোত্রীয় আত্মা ও পারিবারিক আত্মায় বিশ্বাস পোষণ করত বলে ধারণা করা হয়। নৃবিজ্ঞানীরা যে সব প্রমাণপঞ্জি সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তার ভিত্তিতে বলা হয়, জরথুস্টের (জোরাস্টার) সময়কালে গোত্রীয় দেবতাদের সংখ্যা কমে দুটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। *'আহুর মাজদা'* ও *'আংগ্রা মানিউ'*। *আহুর মাজদা*কে ভালোর স্রষ্টা এবং *আংগ্রা মানিউ*কে মন্দের স্রষ্টা বলে মনে করা হয়।[৩] গোত্রগুলো মিলিতভাবে পুরো একটা জাতিতে পরিণত হলে গোত্রীয় দেবতারাও একইভাবে জাতীয় দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে- এভাবেই একত্ববাদের উদ্ভব ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়। পুরাতন বাইবেলের বর্ণনানুসারে, আপন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ইসরাঈলীয়দের দেবতাকে একক জাতীয় সত্তা হিসেবে মনে করা হয়। ফলে, ইসরাঈলীয়রা তাঁর পছন্দের সন্তান-সন্ততি বলে উল্লেখ করে থাকে। খিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দিতে মিশরীয় শাসক ও চতুর্থ আমেনোটেপ বলে পরিচিত

---

[১] এদেরকে রেড ইন্ডিয়ানও বলা হয়।

[২] *Dictionary of Philosophy and Religion,* ১৬ এবং ১৯৩ পৃ.।

[৩] *Dictionary of Religion,* ২৮ ও ৪২ পৃ.।

আখেনাতেনকে ধর্মের বিবর্তনবাদী মতাদর্শের প্রমাণ হিসেবে উদাহরণ পেশ করা হয়। মিশরে প্রচলিত বহুদেবতার বিশ্বাসের বিপরীতে তিনি সূর্যমণ্ডল দ্বারা প্রতীকায়িত *'রা'* নামক একত্ববাদী প্রার্থনার প্রচলন করেন।[১]

অতএব, সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে, 'ধর্ম কোন আসমানী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে গড়ে ওঠা ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস বৈ কিছুই না। তারা বিশ্বাস করে যে, প্রকৃতির যত রহস্য রয়েছে অবশেষে তার উদঘাটন করবে বিজ্ঞান এবং সাথে সাথে ধর্ম অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

ধর্মের অধঃপতিত পর্যায়

ধর্মের উৎপত্তি এবং এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইসলামী মতাদর্শ পূর্বে বর্ণিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বধর্ম ত্যাগ বা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি এবং পুনর্গঠনমূলক একটি প্রক্রিয়া ব্যতীত এটি বিবর্তনমূলক নয়। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে একত্ববাদীরূপে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তারা বিভিন্ন রকম বহুত্ববাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। কখনো দ্বিত্ববাদ বা ত্রিত্ববাদ। আবার কখনো সর্বব্যাপিতা মতাদর্শের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছে মানুষ। স্রষ্টার একত্বের সরল পথের মূলে ফিরে আনতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সকল জাতি ও উপজাতির নিকটে প্রেরণ করেছিলেন নাবী ও রাসূলদেরকে। কিন্তু, প্রেরিত দূতগণ কর্তৃক দেখানো সরল পথ থেকে কালক্রমে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে এবং তাঁদের শিক্ষার পরিবর্তন করা হয় অথবা কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। তথাকথিত আদিম গোত্রের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে এ বাস্তবতার প্রমাণ মেলে যে, তারা সকলেই একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাসী ছিল। বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুসারে ধর্মের ক্রমবিকাশের পর্যায় যাই হোক না কেন, অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্যান্য সকল দেবতা বা আত্মার উর্দ্ধে এক সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাস করে। মধ্য আমেরিকার মেইয়ানদের সৃষ্টির দেবতা *'ইতযামা'*[২], সিয়েরা লিওনের মেন্ডেদের সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা *'গিও'*[৩], হিন্দু ধর্মের অসীম স্রষ্টার *'ব্রহ্মা'*[৪] এবং প্রাচীন শহর ব্যাবিলনের গির্জার সর্বোচ্চ ঈশ্বর *'মারদুক'*[৫] -এর প্রতি খেয়াল করলে সর্বোচ্চ সত্তার অস্তিতের বিষয়টি

---

[১] *Dictionary of Philosophy and Religion*, ১৪৩ পৃ.।

[২] *Dictionary of Religions*, ৯৩ পৃ.।

[৩] তদেব, ২১০ পৃ.।

[৪] তদেব, ৬৮ পৃ.।

[৫] তদেব, ২০৪ পৃ.।

সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি জোরাস্ট্রিয়াদের দ্বিত্ববাদেও *'আংগ্রা মানিউ'*-এর চেয়ে *'আহুর মাজদা'*র মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে। তারা বিশ্বাস করে, বিচার দিবসে *'আংগ্রা মানিউ*-কে *'আহুর মাজদা'* পরাজিত করবে। অতএব *'আহুর মাজদা'* তাদের সত্যিকারের সর্বোচ্চ সত্তা।[১]

বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুসারেই বহু-ঈশ্বরবাদ বা বহুত্ববাদ থেকে উৎপত্তি হওয়া একত্ববাদের মতাদর্শ সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে কোনক্রমেই পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। যা হোক, এ কথাটি সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ধর্মেই একজন সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। নাবী-রাসূলগণ কর্তৃক শেখানো একত্ববাদের মহান শিক্ষা হতে বিপথগামী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সৃষ্টির উপরে স্রষ্টার গুণাবলী অর্পণ করা যা শুরু হয়েছিল স্রষ্টার কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন ছোট-বড় দেবতা বা পূর্বসূরী মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার সূত্র ধরে।

একত্ববাদী ইহুদী ধর্ম হতে বহু-ঈশ্বরবাদী খ্রিস্টান ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি-মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। যিশু (ঈসা ﷺ) কর্তৃক প্রদর্শিত স্রষ্টার একত্বকে ধ্বংসের মাধ্যমে দ্বিত্ববাদের উত্থান ঘটানো হল। দ্বিত্ববাদ অনুযায়ী যিশু (ঈসা ﷺ) স্বয়ং স্রষ্টা ছিলেন না, বরং তাঁর সৃষ্ট পুত্র ছিলেন। অ্যাঁনাক্সাগোরাস থেকে এরিস্টোটল পর্যন্ত প্রচারিত গ্রীক মতাদর্শে গ্রীকরা যিশুকে (ঈসা ﷺ-কে) *'লৌগাস'* বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।[২] তারপর রোমানদের মধ্যে এ দ্বিত্ববাদের অধঃপতন ঘটে। ফলে ত্রিত্ববাদের উন্মেষ ঘটে। এমনকি ত্রিত্ববাদকে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন করে।[৩] অবশেষে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় সম্পূর্ণরূপে ত্রিত্ববাদের চর্চা চালু হয়। এ ক্ষেত্রে যিশুর (ঈসা ﷺ) মা মেরি (মারিয়াম ﷺ) এবং তথাকথিত অন্যান্য অনেক সন্তদেরকে মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বলে দাবী করা হয়। শুধু তাই নয়, মানুষের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতাও এদের উপরে অর্পণ করা হয়।

অনুরূপভাবে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদের ﷺ আনীত স্বচ্ছ ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও চর্চার সাথে বর্তমানের অধিকাংশ

---

[১] *Dictionary of Religions*, ২৮ পৃ.।

[২] এ দার্শনিকদের মতানুসারে, মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী অশরীরী আত্মা হল *নাউস* এবং লৌগাস হল *নাউস*-এর দৈহিক প্রকাশ। (*Dictionary of Philosophy and Religions*, ৩১৪ পৃ.।)

[৩] ক্যাপ্পাডোসিয়ানরা ত্রিত্ববাদের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক সূত্রের প্রণয়ন করেন এবং কন্সট্যান্টিনোপলের রোমান কাউন্সিল কর্তৃক ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে তা অনুমোদিত হয়। এ ত্রিত্ববাদ অনুযায়ী স্রষ্টা মাত্র একজন হলেও স্রষ্টা মূলত পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা -এ তিনজনের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রকাশ ঘটে। (*Dictionary of Philosophy and Religions*, ৫৮৬ পৃ.।)

মুসলিমের আক্বীদা-বিশ্বাসের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে ইসলামের মূল থেকে তাদের বিচ্যুত হওয়ার বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালক্রমে ইসলামের একত্ববাদী আদর্শের বিশুদ্ধতায় ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। নানা মতাদর্শের উদ্ভবের মাধ্যমে রাসূল ﷺ, তাঁর সম্মানিত বংশধরসহ পরবর্তীকালের ধার্মিক বা অর্ধামিক ব্যক্তিবিশেষকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত করে আউলিয়া উপাধিতে ভূষিত করেছে।

ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদের তত্ত্বানুযায়ী, প্রাণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে অ্যামিবার মতো একপ্রকার এককোষী সত্তা হতে। এককোষী ও অবিভক্ত প্রাণই ক্রমান্বয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রমের পর যৌগিক কোষে রূপান্তরিত হয়। তবে এ বিবর্তন তত্ত্ব ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এটি স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতির পর্যায়ক্রমকেই মূলত সমর্থন করবে। কারণ, স্বধর্ম বিচ্যুতির পর্যায়ক্রমানুসারে, স্রষ্টার একত্ববাদের মতো সহজ-সরল ধর্ম কালের পরিক্রমায় মূর্তিপূজার মতো জটিল আকারে রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে, ধর্ম সরলতা ও সহজবোধ্যতাহীন হয়ে পড়ে। স্থান, কাল ও পাত্রের উপর ভিত্তি করে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদের প্রসার ঘটে।

শির্কের সূচনা

প্রথম মানব ও নাবী আদম ﵇ থেকে শুরু হওয়া আল্লাহ্‌র একত্বের মতাদর্শের মাঝে কিভাবে বহু-ঈশ্বরবাদের উন্মেষ ঘটল তা আমাদের শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক স্থাপিত মূর্তিকে পরিত্যাগ করে একমাত্র স্রষ্টার ইবাদাত করতে নূহ ﵇-এর উম্মাতকে আহ্বান জানালে তারা কী জবাব দিয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহ-এর ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾﴾

(سورة نوح: ٢٣)

"আর তারা একে অপরকে বলেছিল, তোমাদের দেবদেবীদের কখনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আকে, আর না ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাসরকে।" [সূরা নূহ (৭১): ২৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন:

"যে প্রতিমার পূজা নূহ (আঃ)-এর কওমের মাজে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে তা কালক্রমে আরবদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। 'দুমাতুল-যান্দাল' নামক স্থানের 'কাল্‌ব' গোত্রের লোকদের দেবমূর্তি ছিল *ওয়াদ*[1], 'হুযাইল' গোত্র কর্তৃক *সুওয়া'আ* গৃহীত হয়েছিল দেবমূর্তি হিসেবে, *ইয়াগূছ* দেবমূর্তিকে প্রথমে গ্রহণ করে 'মুরাদ' গোত্র অবশ্য পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাত্বিফের দেবমূর্তি হিসেবে এবং এটি কওমে সাবা'র নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক এক স্থানে ছিল[2], দেবমূর্তি *ইয়া'উক্ব* গৃহীত হয় 'হামদান' গোত্র কর্তৃক এবং *নাস্‌র* দেবমূর্তির পূজা করত 'যুলকালা' গোত্রের হিমইয়া উপগোত্রের লোকেরা।[3] নূহ (আঃ)-এর কওমের কিছু নেক লোকের নামও ছিল *নাসর*। তাঁদের সময়কাল ছিল আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি খুব নেককার ও বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিল, যারা তাঁদের সৎকর্মপরায়ণতা সম্পর্কে খুবই

---

[1] আবু জা'ফর আল-বাক্বি থেকে *'ওয়াদ'* সম্পর্কে একটি পৃথক বর্ণনা রয়েছে। তা হল, "ইয়াযিদ ইবন আল-মুহাল্লাব এমন এক স্থানে নিহত হয়েছিলেন যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর উপাসনা করা হয়েছিল। *'ওয়াদ'* নামক ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ও সর্বাধিক নেককার বুজুর্গ মানুষ। তিনি তাঁর জাতির নিকটে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মারা গেলে লোকেরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি তাঁর তিরোধানের পর ব্যাবিলনের মানুষেরা তাঁর কবরের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁর জন্য খুবই আহাজারী করত। ইবলীস তাদের এ অবস্থা দেখে সুবর্ণ সুযোগটি হাত ছাড়া হতে দেয় নি, তাই একজন মানুষের আকৃতি ধরে আগমন করে সে তাদেরকে প্ররোচিত করে বলল, 'এ ব্যক্তির জন্য তোমাদের যে কী দুঃখ ও বেদনা, আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে দেব যা তোমরা তোমাদের যৌথ মিলন কেন্দ্রসমূহে রেখে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবে? তারা এতে সম্মত হলে সে তাঁর অনুরূপ একটি মূর্তি তৈরি করে দিল। তারা এটিকে তাদের যৌথ মিলনকেন্দ্রে রেখে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের স্মরণের এ অবস্থা দেখে শয়ত্বান পুনরায় এসে বলল, 'আমি কি তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে রাখার জন্য অনুরূপ মূর্তি তৈরি করে দেব? তারা এতেও সম্মত হলে সে প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য এর অনুরূপ মূর্তি তৈরি করে দেয়। তারা তা গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের সন্তানরা তাদের এ সকল কার্যকলাপ দেখতে থাকে। বংশবৃদ্ধি হয়ে যখন নতুন প্রজন্ম তাদের স্থান দখল করে নিল এবং তাঁকে স্মরণ করার মূল কারণ সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা অজ্ঞ রয়ে গেল, তখন তাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম আল্লাহ্‌কে ব্যতীত এ মূর্তিরই উপাসনা করতে লাগল। ফলে 'ওয়াদ'-এর মূর্তিই হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যার পূজা-অর্চনা ও উপাসনা শুরু হয়। অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শির্ক হল নেককার মানুষের ক্ববর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাষ্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে।" (ইবনু আবী হাতিম; ইবনু কাছীর, *ক্বাসাসুল আম্বিয়া*, পৃ. ১১৫; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬/২৬৯) -*অনুবাদক*

[2] অথবা ছাবা অথবা ইয়ামেনের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত মাযহাজ গোত্র। -*অনুবাদক*

[3] ইয়েমেনের হিমায়্যার গোত্রের রাজা [মুহাম্মাদ ইবনু মানযূর, *লিসান আল- 'আরব*, (বৈরুত: দার সাদির, নতুন সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ.]

উচ্চ ধারণা পোষণ করত। তাঁরা সকলেই এক মাসের মধ্যে একে একে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে স্বজনরা তাঁদের জন্য খুবই বেদনার্ত হল। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল, 'তোমরা যে সব মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদাত করো, যদি তাঁদের বসার স্থানগুলোতে (বৈঠকশালা) এক একটি মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে দাও এবং তাঁদের নামে নামকরণ করো, তবে এ সব মূর্তি দেখে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাতের প্রতি অধিক আগ্রহী ও মনোযোগী হতে পারবে, তোমাদের ইবাদাত পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের স্মারক হিসেবে প্রতিকৃতি তৈরি করে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে স্থাপন করল এবং উপাসনালয়ে আসা যাওয়ার সময় সে সব মূর্তির সাথে সাক্ষাত করে পুণ্যবানদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদাতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। তবে তাঁদের প্রজন্মের কেউই এ মূর্তিগুলোর পূজা করে নি। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এ নতুন প্রজন্মের লোকেরা ধীরে ধীরে মূর্তিগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেল। এ সুযোগে শয়তান এসে তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, 'তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু মূর্তিই তৈরি করে রাখেন নি, বরং তারা তো অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এঁদেরই ইবাদত করত। উপরন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্রষ্টা ও উপাস্য হল এ সব মূর্তিই। তাছাড়া, এ মূর্তিগুলোকে ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত।' এ নতুন প্রজন্মের লোকেরা শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হল। ফলে বিভ্রান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং মূর্তিপূজার শির্কের সূচনা হল।[১] আর তাদের পরবর্তী বংশধরগণ মূর্তিপূজা অব্যাহত রাখল।[২]

আমাদের পূর্ববর্তীদের তাওহীদপন্থী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে কিভাবে মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদের অনুপ্রবেশ হয়েছিল তা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীর উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়েছে। এ তথ্যটি স্বধর্ম স্খলনের মতাদর্শকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, পূর্ববর্তীগণের মূর্তিপূজার উৎসমূলকে প্রকাশ করে। উপরন্তু,

---

[১] মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়িসের বর্ণনা। আত্ব-ত্ববারী।

[২] ***বুখারী***, (আরবী-ইংরেজি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৪-৪১৫ পৃ., হাদীছ নং ৪৪২; তাবারী, তাফসীর, ২৯ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; ইবনু কাসীর, সূরা নূহ। *বুখারী মওকূফ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেন। 'তাফসীর' অধ্যায় হাদীছ নং ৪৯২০।*

কোন মানুষ বা প্রাণীকে মূর্তি বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ইসলাম কেন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে তার ব্যাখ্যাও বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত ব্যাখ্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যে মূসা ﷺ-কে দশটি বিধান দিয়েছিলেন সেখানে এবং পুরাতন বাইবেলেও প্রতিমূর্তি অংকণ ও তৈরিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

"পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মতো হোক বা মাটির উপরকার কিছুর মতো হোক কিংবা পানির মধ্যকার কোন কিছুর মতো হোক। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ।"[১]

নাবী যিশু (ঈসা ﷺ) কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষানুসারে আদি খ্রিষ্টধর্ম স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের মতাদর্শের প্রভাবে তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে যায়। এর ফলে মূর্তি তৈরির জন্য সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাধারণ যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধে নিহতদের, বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মযাজক (সন্ত), ধর্ম সংস্কারক, মেরি (মারিয়াম), যিশু (ঈসা ﷺ) এবং এমনকি স্বয়ং স্রষ্টার মূর্তি তৈরি করা হল।[২]

যারা ছবি আঁকে, মূর্তি নির্মাণ করে এবং এগুলোকে প্রদর্শন কারীদের পরকালীন কঠিন শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে শেষ নাবী ও রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন। রাসূলের স্ত্রী 'আয়িশা বিনতু আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,[৩]

"একদা রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার কক্ষে পশমী কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। তাতে ছিল পাখাওয়ালা ঘোড়ার অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। তিনি ['আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা] নাবী ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, 'হে 'আয়িশাহ! ক্বিয়ামাতের দিন সে-সব লোকের সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, যারা সৃষ্টির (প্রাণীর) সদৃশ তৈরি করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে তা জীবিত করো। তিনি ﷺ আরও

---

[১] *Exodus 20: 4 (হিজরত ২০: ৪)*

[২] ঈশ্বরে (স্রষ্টায়) বিশ্বাসের নিদর্শন হিসেবে মূর্তি নির্মাণে নিসিয়ার দ্বিতীয় কাউন্সিল (৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) সরকারিভাবে অনুমোদন করেছিল। তাদের ধারণা মতে, স্বর্গীয় Logus (অর্থ 'শব্দ') যেহেতু সম্পূর্ণভাবে মানবীয় রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তাই তাঁকে যে কোন রূপে রূপায়িত করা যায়। (*Dictionary of Religions*, ১৫৯ পৃ.)

[৩] ***বুখারী***, (আরবী-ইংরেজি), ৭ম খণ্ড, ৫৪২ পৃ., হাদীছ নং ৮৩৮; ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১১৫৮ পৃ., হাদীছ নং ৫২৫৪।

বলেন, 'নিশ্চয়, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি এবং মূর্তি থাকে, সে ঘরে (রাহ্‌মাতের) ফিরিশতারা প্রবেশ করে না।"

তারপর 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

এরপর আমরা ওটা দিয়ে একটি বা দুটি বসার গদি তৈরি করি।[১]

সৎকর্মশীলদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা:

নাবী নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়কালের উপরোক্ত ঘটনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সৎকর্মশীল তথা নেককার বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি অতি ভক্তি-ভালবাসা ও প্রশংসার কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে মূর্তিপূজার শুরু হয়।[২] এ বিষয়ের সমর্থনে বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে যিশুর (ঈসা আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিমূর্তি পূজা করাকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত প্রশংসা করার মধ্যে লুক্কায়িত বিপদের ভয়াবহতার কারণে সাহাবীদেরকে এবং অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। উমার ইবনু আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'মারিয়ামের পুত্রকে খ্রিস্টানরা যেভাবে করেছে, সেরূপ তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না। আমি আল্লাহ্‌র এক বান্দা মাত্র। তাই আমাকে শুধু *'আব্দুল্লাহ্‌* (আল্লাহ্‌র বান্দা) ও *রাসূলুহু* (রাসূল) বলে সম্বোধন করো।'[৩]

---

[১] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ৭ম খণ্ড, ৫৪২ পৃ., হাদীছ নং ৮৩৮; ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, ১১৫৮ পৃ., হাদীছ নং ৫২৫৪।

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ৩১১ পৃ.।

[৩] ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত। ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজী), ৪র্থ খণ্ড, ৪৩৫ পৃ., হাদীছ নং ৬৫৪। প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিষয় হল বুজুর্গগণের সম্বোধনের পদ্ধতি ও তাঁদের সম্মানে উপাধি ব্যবহার। তবে এ বিষয়ে সারল্য ও স্বাভাবিকতাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা ছিলেন সবার উর্ধ্বে। তাঁদের হৃদয় জুড়ে ছিলেন তিনি। তাঁর জন্য অকাতরে সকল সম্পদ, স্বজন ও নিজ জীবন বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই ভক্তি ও ভালবাসা ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশের রীতি তাঁদের ছিল না। তাঁরা সর্বদা *'ইয়া রাসূলুল্লাহ'* (হে আল্লাহ্‌র রাসূল) ও *'ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ'* (হে আল্লাহ্‌র নাবী) বলেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। তাঁকে সম্বোধন করে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও ভালবাস জানাতে তাঁরা অনেক সময় বলতেন: 'আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবানি হউন'। *'ইয়া হাবীবাল্লাহ', 'ইয়া খলীলাল্লাহ'* ইত্যাদি বলার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীছে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র হাবীব ও খলীল। তাঁকে সম্বোধনের সময় *'সাইয়্যেদানা', 'মাওলানা'* ইত্যাদি ভক্তি বা মর্যাদা-জ্ঞাপনক উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। যদিও কাউকে *'সাইয়্যেদানা', 'মাওলানা'* ইত্যাদি বলার রেওয়াজ তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এগুলোর ব্যবহার না-জায়িয নয়। উমার ফারুক আবূ বকর

সিদ্দীক (রা)-কে বলেন, 'আপনি সাইয়েদুনা: আমাদের সাইয়্যেদ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচেয়ে প্রিয়। (*বুখারী*, হা/৩৬৭০) উমার (রা) আরও বলতেন: 'আবূ বকর আমাদের সাইয়্যেদ: নেতা, আমাদের সাইয়্যেদকে, বেলালকে মুক্ত করেছেন। (*বুখারী*, হা/৩৭৫৪) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়িদ ইবনু হারিসা (রা)-কে বলতেন: 'তুমি আমাদের ভাই এবং মাওলানা, অর্থাৎ আমাদের মাওলা (বন্ধু, অভিভাবক বা খাদেম)। (*বুখারী*, হা/২৭০০) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই বলেছেন যে, তিনিই মানবকুলের নেতা বা সাইয়্যেদ। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'আমি আদম সন্তানদের সাইয়্যেদ বা নেতা, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম আমিই মাটি ফুড়ে উঠব, আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফা'আতই কবুল করা হবে। (সুনান *আবূ দাউদ*, হা/৪৬৭৩, সহীহ)

সম্ভবত দু'টি কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে তাঁরা এ সমস্ত উপাধি ব্যবহার করতেন না। **প্রথমত:** আল্লাহ্‌র বান্দা, নাবী ও রাসূল হওয়ার মর্তবা সর্বোচ্চ মর্যাদা। এরপরে অন্য কোন শব্দ আর তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে না। যেমন, কাউকে রাষ্ট্রপতি বলার পরে আরা পৌরসভার চেয়ারম্যান, এলাকার মাতবর, সংসদ সদস্য ইত্যাদি উপাধিতে কোন সম্মান বৃদ্ধি হয় না। **দ্বিতীয়ত:** তিনি ভালবাসতেন যে, তাঁকে শুধু 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র বান্দা) ও 'রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র রাসূল) বলা হোক। অতিরিক্ত উপাধি তিনি অপছন্দ করতেন।

তৎকালীন আরবীয় সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের প্রশংসা ও বিভিন্ন উপধি ব্যবহারের নিয়ম ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। বরং সারল্যই তাঁর প্রিয় ছিল। অনেক সময় রাসূল (ﷺ)-এর আদবের সাথে অপরিচিত দূরের বেদুঈনগণ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রশংসাবাচক উপাধি ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। যেমন:

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন: এক ব্যক্তি বলে, 'ইয়া মুহাম্মাদ (হে মুহাম্মাদ), ইয়া সাইয়্যেদানা (হে আমাদের নেতা), ইবনা সাইয়্যেদিনা (আমাদের নেতার পুত্র), খাইরানা (আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি), ইবনা খাইরিনা (শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তান)।' তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'হে মানুষেরা, তোমরা তাক্বওয়া (আল্লাহ্ ভীতি) অবলম্বন করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী বা প্রবৃত্তির অনুসারী করে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ), আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে, তা আমি পছন্দ করি না। *(মুসনাদে আহমদ, হাদীছ নং ১২১৪১, ১৩১১৭, ১৩১১৪)*

আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর (রা) বলেন: আমি বনু আমের গোত্রের একদল প্রতিনিধির সাথে মদীনায় নবীজী (ﷺ)-এর কাছে এলাম। আমরা বললাম, 'আপনি আমাদের ওলী বা অভিভাবক এবং আপনি আমাদের সাইয়্যেদ বা নেতা।' তিনি বললেন, 'সাইয়্যেদ তো আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলা'। আমরা বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান'। তখন তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের কথা বল বা কিছু কথা বল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে না যায়'। *(সুনানে আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৮৭৬।)*

সাহাবীগণ শাহাদতের জন্য বা তাঁর উপর সলাত ও সালাম প্রেরণ করতে তাঁর নাম নিতেন। যেমন, 'হে আল্লাহ্, মুহাম্মাদের উপর সলাত প্রেরণ করুন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর সলাত প্রেরণ করুন। আল্লাহ্ তাঁর নাবী মুহাম্মাদের উপর সলাত প্রেরণ করুণ।' তবে সলাত প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর নামে আগে 'সাইয়্যেদানা', 'হাবীবানা', 'মাওলানা', 'শাফিয়ানা' ইত্যাদি উপাধি ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) একটি দরুদে 'সাইয়্যেদুল মুরসালীন', 'ইমামুল মুত্তাক্বীন', 'খাতামুন নাবিয়্যিন', 'ইমামুল খাইর', 'রাসূলুর রাহমাহ' উপাধি ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর এ সকল উপাধি তো বলে শেষ করা যায় না। রিসালাত, নুবওত ও আবদিয়তের উপাধিই সকল উপাধির অর্থ বুঝায়। এজন্য এগুলোই বহুল প্রচলিত। তাঁরা সর্বদা এগুলোই ব্যবহার করতেন। অন্য

কারো কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করতে হলে সাহাবীগণ সাধারণত তাঁর উপধি 'রাসূলুল্লাহ' ও 'নাবীয়্যুল্লাহ' বলে তাঁর উল্লেখ করতেন। যেমন বলতেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন, নাবীয়্যুল্লাহ ﷺ বলেছেন বা করেছেন ইত্যাদি। কখনো কখনো তাঁরা অন্যের কাছে তাঁর উল্লেখ করতে তাঁর নাম উল্লেখ করতেন, যদিও সাধারণত তাঁর উপধি বলাই তাঁদের রীতি ছিল। একব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-কে সফরে সলাত কসর করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলে, 'আমরা তো কুরআন কারীমে নিজ গৃহে উপস্থিতকালে সলাতের বিষয়ে ও ভয়কালীন সলাতের উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু সফরের সলাত সম্পর্কে কিছু দেখতে পাই না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, 'ভাতিজা, মহান আল্লাহ্ আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠালেন, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা তো শুধু সে কাজই করি মুহাম্মাদ ﷺ-কে যা করতে দেখেছি। (নাসাঈ, হা/১৪৩৪; ইবনু মাজাহ, ১০৬৬) এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে তাঁদের রীতি। আর অন্য সকল বুজুর্গ সাহাবীগণের ক্ষেত্রে তাঁদের রীতি ছিল সম্বোধনের সময় কুনিয়াত ধরে ডাকা। অর্থাৎ 'অমুকের পিতা' বলে ডাকতেন। আর তাঁদের উল্লেখ করার সময় নাম ধরে উল্লেখ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবী বা অন্য কোন নাবী বা সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে ডাকার জন্য তাঁর নাম বলার জন্য নামের পূর্বে বা পরে হযরত, হুজুর, কেবলা, বাবা, বাবাজান, খাজা ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন না। আর আমাদের দেশের প্রচলিত অগণিত আল্লাহ্র নৈকট্যজ্ঞাপক উপাধি তাঁরা কখনো ব্যবহার করেন নি। তাবিঈগণ, তাবি-তাবিঈগণ, ইমামগণ এবং প্রথম যুগের সকল আলিমই এভাবে চলেছেন। উপাধির ব্যবহার তাঁদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। একটু পরের যুগে সামান্য উপাধি যা ব্যবহার করা হতো তা মুসলমানদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অনুসারে। আল্লাহ্র সাথে তাঁর কতটুকু সম্পর্ক এ বিষয়ে কোন কিছু বলা হতো না। গাওস, কুতুব ইত্যাদি শব্দের তো কোন অস্তিত্বই ছিল না। মুহিউস সুন্নাহ, কামেউল বিদ'আত, ইমামুল আইম্মাহ, গাউসে আজম, গাওসে সাকালাইন, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, আশেকে রাসূল, খাজায়ে খাজেগান, শাহেনশাহে তরীকত, ওলীকুল শিরোমনি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি অগণিত উপধির কোনকিছুই তাঁরা কখনেই ব্যবহার করেন নি। কারো জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর নামের সাথে কোন উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। হানাফী মাযহাবের অন্যতম দুই ইমাম- ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার (রাহি.) ইন্তেকালের পরে তাঁর মতামত সংকলন করে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বই লিখেন। তাঁদের বইগুলো বাজারে পাওয়া যায়। আপনারা একটু কষ্ট করে তাঁদের লেখা বইগুলো পড়ে দেখুন। তাঁরা কখনেই 'আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)' বলা ছাড়া কোন উপাধী ব্যবহার করেন নি। অসংখ্য স্থানে শুধু লিখেছেন: আবূ হানীফা বলেছেন, আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আবূ হানীফার মত, আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র মত ইত্যাদি। ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমামুল ফক্বীহ, ইমামে আযম, ইমামুল আইম্মাহ, ফকীহকুল শিরোমনি, ওলীকুল শিরোমনি, গাওসে সামদানী ইত্যাদি একটি উপাধিও তাঁরা ব্যাবহার করেন নি। তাঁদের সকল ভক্তি প্রকাশ করেছেন একটি বাক্যে: 'রাহিমাহুল্লাহ'। আপনারা ইসলামের প্রথম তিন বরকতময় যুগের যে কোন বিদ্বানের যে কোন গ্রন্থ থেকে এ ধরণের একটি উপাধিও খুঁজে বের করতে পারবেন না। এমনকি এর পরবর্তী কয়েক যুগেও এ সকল উপাধির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের প্রথম ৩০০ বৎসরের মধ্যে লেখা কোন হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, 'আক্বীদা, জীবনী, ইতিহাস বা অন্য কোন গ্রন্থে এ ধরণের কোন উপাধি ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না (শিয়া, রাফেযী, মু'তাযিলা বা বিভ্রান্ত ফির্কাসমূহের গ্রন্থ ছাড়া)।

কারে ঈমান, তাক্বওয়া আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের পর্যায় ব গভীরতা জ্ঞাপক কোন উপাধি ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে ভাল বলতে কুরআন ও হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ্ জাল্লা শা'নুহু নির্দেশ প্রদান করেছেন, '*তোমরা তোমাদেরে ভালত্বে বর্ণনা বা দাবী করবে না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে,*

নাবী ও ধর্মযাজকদের (সাধু-সন্ত) কবর হিসেবে সেগুলোর উপর ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ উপাসনালয় তৈরি করেছে, এ প্রথাকে রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন। তাছাড়া, মৃত ব্যক্তির পূজা করা এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রশংসা করার মহাবিপদ থেকে সতর্ক করা এবং এ ধরণের কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন, যাতে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার চর্চার অনুপ্রবেশ ইসলামে না ঘটে।

ইথিওপিয়ায় অবস্থিত একটি গির্জার দেয়ালে ছবি দেখেছিলেন বলে রাসূলের স্ত্রী উম্মু সালামা[১] (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলের মৃত্যুশয্যায় অবস্থানকালে তাঁর নিকটে বর্ণনা করেন। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন,

---

তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে। [সূরা নাজম (৫৩): ৩২] রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভাল-মন্দ বলতে ও কাউকে নিশ্চিত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একবার একজন সাহাবী তাঁর সামনে অন্য সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে, 'তাঁকে তিনি মু'মিন বা খাঁটি বিশ্বাসী বলে মনে করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন যে, 'মু'মিন না বলে বল: মুসলিম'। (*বুখারী,* হা/২৭; *মুসলিম,* হা/১৫০) অর্থাৎ, ইসলামের বিধান পালনকারী হিসেবে বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে হবে। ঈমানের গভীরতা ও বিশুদ্ধতা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। আবূ বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করে। তিনি বলেন: 'হতভাগা, তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে!!' কয়েকবার এ কথা বললেন। এরপর বললেন: 'যদি তোমাদের কারো কখনো একান্তই কোন ভাইয়ের প্রশংসা করার দরকার হয়, তাহলে সে লোকটির যে গুণগুলো সে জানে সেগুলো সম্পর্কে বলবে, 'আমি অমুককে এরূপ মনে করি, আল্লাহ্ই তাঁর সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখেন, আমি আল্লাহ্র উপরে কাউকে ভাল বলছি না। আমি মনে করি লোকটি এরূপ, এরূপ।' (*বুখারী,* হা/২৬৬২, ৬১৬২; *মুসলিম,* হা/৩০০০) এই হল নাবীদের পরেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ওলী ও বুজুর্গগণ অর্থাৎ সাহাবীগণের বিষয়ে কথা বলার ও প্রশংসা করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা। তাহলে বাকী দুনিয়ার অন্যান্য সকল বুজুর্গ, দরবেশ, ইমাম, আলিম, ভালমানুষ বা অন্য কারো বিষয়ে আমাদের কিভাবে কথা বলা প্রয়োজন! আর কী-ভাবেই বা আমরা বলি? আমরা হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি পূর্বযুগের পুস্তকাদি পাঠ করার সময় বারবার বলছি: আয়িশা বলেছেন, ফাতিমা বলেছেন, খাত্তাবের ছেলে উমার বলেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আবূ হানীফা বলেছেন ইত্যাদি। এসব নামের সাথে দু'আর বাক্য 'রাদিআল্লাহু আনহু/আনহা' ছাড়া কিছুই বলি না। কিন্তু নিজেরা বলতে গেলে মনে হয় আগে হযরত, মা ইত্যাদি না লাগালে বোধহয় বেয়াদবী হয়ে গেল। আমাদের এ রুচি পরিবর্তন করে সাহাবী, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈগণের রূচির কাছে নেওয়া বড়ই প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্র দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যে দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের প্রবৃত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও কর্মের অনুসারী করে দেন এবং সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন। (বিস্তারিত দেখুন: *এহইয়াউস সুনান,* পৃ. ৫০৮-৫১৬) -*অনুবাদক*

[১] উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নাম ছিল হিন্দ বিনতু আবি উমাইয়া। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত। কুরাইশ মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে রক্ষা পেতে তিনি এবং তাঁর স্বামী আবূ সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করলে তাঁরাও মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের চার বছর পরে তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। তৎকালীন সময়ের জ্ঞানী মহিলার মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। রাসূলের ﷺ মৃত্যুর পর থেকে ৬৮৪

'কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি মারা গেলে তারা সে ব্যক্তির কবরের উপর উপাসনালয় (মাজার) তৈরি করে এবং তার ছবি চিত্রিত করে রাখে। আর এরাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বনিকৃষ্ট মানব।'[১]

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূল ﷺ-এর নিকটে উম্মু সালামা رضي الله عنها যখন গির্জার বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন, তখন রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং তাঁর ঘোষণা 'সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি' দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন্য এ ধরণের চর্চা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। খ্রিস্টানদের প্রথাকে তীব্রভাবে লা'নত করার পিছনে যে বিষয়টি সক্রিয় তা হল মূর্তিপূজার দু'টি মূল উৎস:

১. ক্ববর সাজানো।

২. চিত্র তৈরি করা।[২]

নূহ عليه السلام-এর সময়কার মূর্তিপূজার ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত দু প্রকারের কাজই মানুষকে শির্কের দিকে ধাবিত করে।

কবরের বিধি-বিধান

রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ক্ববর পূজা সম্পর্কে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারী করেছিলেন। কারণ, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীয়ে গায়র মাতলু দ্বারা জানিয়েছিলেন যে, এ প্রথা তাঁর উম্মাতের জন্য বড় ধরণের ফিৎনা স্বরূপ হবে। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের জন্য ক্ববর পরিদর্শন (যিয়ারাত) নিষিদ্ধ করেছিলেন। এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল সাহাবীদের মধ্যে তাওহীদ দৃঢ়ভাবে প্রথিত না হওয়া পর্যন্ত। রাসূল ﷺ বলেন,

'তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারত (পরিদর্শন) করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এটি যেহেতু মৃত্যুকে (আখিরাতের কথা) স্মরণ করায় তাই আমি অনুমতি প্রদান করছি।'[৩]

খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি ইসলামী আইন-কানুন শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। (ইবনু আল-জাওযী, *সিফাহ আস-সাফওয়া,* কায়রো: দার আল-ওয়া'ঈ, ১ম সংস্করণ ১৯৭০, ২য় খণ্ড, ৪০-৪২ পৃ.।)

[১] 'আয়িশা رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত। ***বুখারী*** ও ***মুসলিম*** উভয় এ হাদীছটিকে সংগ্রহ করেছেন। ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃ., হাদীছ নং ৪১৯ এবং ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃ., হাদীছ নং ৪২৬; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃ., হাদীছ নং ৯৭৭, ১০৭৬; সুনানে ***তিরমিযী,*** হাদীছ নং ১০৫৪।

[২] *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* গ্রন্থের ৩২১ পৃ.য় ইবনু তাইমিয়া উল্লেখ করেছেন।

[৩] বুরাইদা ইবনু আল-হুসাইব কর্তৃক বর্ণিত। ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৬৩-৪৬৪ পৃ., হাদীছ নং ২১৩১; আবূ দাউদ, *সুনান আবী দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৯ পৃ., হাদীছ নং ৩২২৯; আন-নাসাঈ, ***আহমাদ*** এবং আল-বায়হাক্বী।

যা হোক, ক্ববর পরিদর্শনের (যিয়ারত) অনুমতি থাকলেও রাসূল ﷺ এ সংক্রান্ত কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন যেন পরবর্তী প্রজন্ম ক্ববর পূজারীতে পরিণত না হয়।

১. ক্ববর পূজায় বাধা প্রদান কল্পে ক্ববরস্থানে সকল প্রকার প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (নিয়ত যাই থাকুক না কেন)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

   'ক্ববরস্থান ও পায়খানা ব্যতীত পুরো পৃথিবীই মাসজিদ (ইবাদাতের স্থান)।[১]

   ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন,

   'তোমাদের বাড়িতে কিছু সলাত আদায় করো এবং একে ক্ববরস্থানে পরিণত করো না।[২]

   পরিবারের নিকটে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে বাড়িতে সলাত আদায় না করলে তা ক্ববরের ন্যায় হয়ে যায়, কারণ ক্ববরে সলাত আদায় করার অনুমতি নেই। ক্ববরস্থানে অবস্থান করে একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করা শির্‌ক না হলেও, শয়ত্বানের ধোঁকায় অজ্ঞ জনসাধারণ মনে করতে পারে যে, ক্ববরস্থানের মৃতদের নিকটে প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুতরাং মূতিপূজা উত্থানের এ সূক্ষ্ম পথটিকে শক্তহাতে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনু আল-খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন রাসূলের এক সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ক্ববরের সন্নিকটে সলাত আদায় করতে দেখে চিৎকার করে তাঁকে জানালেন, 'ক্ববর! ক্ববর!'[৩]

২. দ্বিতীয়ত, স্ব-ইচ্ছায় ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায় করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, অজ্ঞ লোকেরা পরবর্তীতে ধারণা করতে পারে যে, মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে। আবূ মুরছিদ আল-ঘানাভির বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। আবূ দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃ., হাদীছ নং ৪৯২ এবং ইবনু মাজাহ।

[২] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃ., হাদীছ নং ২৮০; ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ., হাদীছ নং ১৭০৪।

[৩] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃ., হাদীছ নং ৪৮। এ হাদীছগুলো দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ক্ববরস্থানকে অপবিত্র মনে করে রাসূল ﷺ সেখানে প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয় নি। কারণ রাসূলে অন্য হাদীছের মাধ্যমে জানা যায়, নাবী-রাসূলদের ক্ববর পবিত্র। রাসূলের মতানুসারে, তাঁদের মৃতদেহকে ক্ষয় করতে আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে নিষেধ করেছেন। অতএব, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যেহেতু তাদের নাবীদের ক্ববরকে উপাসনালয়ে (ইবাদাতের স্থান) পরিণত করে শির্‌কের চর্চা করছে, তাই রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাদেরকে লা'নত করেছেন। ক্ববরস্থানের অপবিত্রতার কারণে নয়। (*তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ৩২৮ পৃ.।)

'ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায় করবে না অথবা ক্ববরের উপরে বসবে না।'[১]

৩. ক্ববরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। কারণ, রাসূল ﷺ অথবা সাহাবীরা তিলাওয়াত করেছেন -এ মর্মে কোন প্রমাণ নেই। ক্ববরস্থানে গমন করে কী পড়তে হবে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে তাঁর স্ত্রী 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি ﷺ ক্ববরবাসীদের প্রতি সালাম ও তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতে বলেন। কিন্তু 'আয়িশাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল ﷺ সূরা ফাতিহা অথবা কুরআনের অন্য কোন সূরা পড়তে বলেন নি।[২]

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন,

'তোমরা তোমাদের গৃহকে ক্ববরস্থানে পরিণত করো না। কারণ, যে বাড়িতে *সূরা আল-বাকারা* তিলাওয়াত করা হয়, শয়ত্বান সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।'[৩]

---

[1] ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৬০ পৃ., হাদীছ নং ২১২২; আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২২৩; নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ।

*** তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে দু'আও (অনানুষ্ঠানিক ইবাদাত) এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ বলেন, 'দু'আই ইবাদাত।' (*বুখারীর আল-আদাব আল-মুফরাদ*, আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ., হাদীছ নং ১৪৭৪; তিরমিযি এবং ইবনু মাজাহ।) তবে সলাত (আনুষ্ঠানিক ইবাদাত) আদায় করতে হবে কা'বামুখী (মক্কার দিকে মুখ ফিরে) হয়ে। দু'আ যদিও একটি ইবাদাত, কিন্তু, দু'আ করার জন্য কিবলামুখী হওয়া কোন শর্ত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: মনে রাখতে হবে, জানাযার কার্যাবলী ক্ববরস্থানে করার বিধান ইসলামে নেই। জানাযা কার্য সাধারণত জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য বরাদ্দ বড় পরিসরের জায়গা অথবা *মাসজিদ*-এ সম্পন্ন হয়। তবে, জামা'আতের সামনে মূলত ইমামের সরাসরি সম্মুখে মৃতদেহ রেখে জানাযার সলাত সম্পাদন করা হয় বিধায় এ সলাতে কোন রুকূ' বা সিজদা নেই। ফলে কেউই ধারণা করতে সক্ষম হয় না যে, এ সলাত মৃতের উদ্দেশ্যে হচ্ছে না বরং মৃতের কল্যাণের নিমিত্তে দু'আস্বরূপ আদায় করা হচ্ছে। জানাযার সলাতে পঠিতব্য দু'আটির এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

[২] নাসির আদ-দীন আল-আলবানী, *আহ্কাম আল-জানাইয*, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৬৯), ১৯১ পৃ.। দু'আটি নিম্নরূপ:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

আস-সালামু 'আলা আহলিদ-দিয়ারি মিনাল-মু'মিনীন ওয়াল-মুসলিমীন ইয়ারহামুল্লাহু আল-মুসতাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল-মুসতাখিরীন ওয়া ইন্না ইন্শা আল্লাহু বিকুম লাহিকূন। (মু'মিনগণ এবং এ বাসস্থানগুলোতে বসবাসকারী মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের অগ্রে গমনকারী এবং পশ্চাদ্গামীদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলা করুণাধারা বর্ষণ করুন। আল্লাহ্ চাইলে আমরা তোমাদের সাথী হব।[*মুসলিম*, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৬১-৪৬২ পৃ., হাদীছ নং ৯৭৪।]

[৩] ***মুসলিম***, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ৩৭৭ পৃ., হাদীছ নং ১৭০৭; তিরমিযি, হাদীছ নং ১০৫২; ***আবু দাউদ***, হাদীছ নং ৩২৩৫, ৩২২৬ এবং ***আহমাদ***, হাদীছ নং ২৫৩৪৪।

এ হাদীছের মত আরো অন্যান্য হাদীছেও ক্ববরে কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানের প্রতি ইশারা করে। বাড়িতে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তদুপরি, কুরআন তিলাওয়াত না করে বাড়িকে ক্ববরস্থানে পরিণত করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে; কারণ ক্ববরস্থানে তিলাওয়াত করা হয় না।[১]

৪. ক্ববর চুনকাম করা, কবরের উপর বসা,[২] এর উপর সৌধ বা ইমারত বা ঘর জাতীয় কিছু নির্মাণ করা,[৩] কবরের গায়ে লেখা[৪] এবং ক্ববরকে উঁচু করা[৫] থেকে বিরত থাকতে রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন। এ ব্যতীত ক্ববরের উপরে নির্মিত সকল সৌধকে ভেঙ্গে মাটি সমান করতে তিনি ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। 'আলী ইবনু আবি ত্বালিব (রাঃ) বলেন, যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি বা এক বিঘতের চেয়ে উঁচু) কোন ক্ববর দেখলে তা সব আশেপাশের মাটি সমান করে দিতে রাসূল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬]

---

[১] ক্ববরস্থানে *সূরা ইয়াসীন* পাঠ করা সম্পর্কিত কোন হাদীছ নেই। তাছাড়া, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে তার উপরে *সূরা ইয়াসীন* পাঠ করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। (*আহকাম আল-জানাইয,* ১১ পৃ. এবং ১৯২ পৃ.র ২ নং পাদটীকা দেখুন।)

[২] ***মুসলিম,*** আস-সহীহ, ২/৬৬৭।

[৩] যাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃ., হাদীছ নং ২১১৬ এবং আবু দাঊদ, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৬-৯১৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২১৯-৩২২০।

[৪] যাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। আবু দাঊদ, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৬-৯১৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২১৯ এবং আন-নাসা'ঈ।

[৫] যাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৫৯-৪৬০ পৃ., হাদীছ নং ২১১৬; আবু দাঊদ, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৬ পৃ., হাদীছ নং ৩২১৯ এবং আন-নাসা'ঈ।

[৬] ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃ., হাদীছ নং ২১১৫; আবু দাঊদ, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড,৯১৪-৯১৫ পৃ., হাদীছ নং ৩২১২; আন-নাসা'ঈ এবং তিরমিযি।
এ হাদীছ থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরকেও মূর্তি ও ছবির ন্যায় শির্ক প্রসারের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন এবং এগুলো তৈরি করাই শুধু নিষেধ করেন নি, উপরন্তু কেউ কোন ক্ববর উঁচু বা পাকা করলে তা ভেঙ্গে সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে মূর্তি ভাঙ্গতে ও ছবি নষ্ট করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ধরণের কাজকে অর্থাৎ মূর্তি তৈরি করা, ছবি তৈরি করা বা ক্ববর উঁচু করাকে তিনি কুফ্রী বলে গণ্য করেছেন। কেননা, তা কুফর ও শির্ক প্রসারের কারণ। পূর্ববর্তী উম্মতের মানুষেরা ক্ববরকে তা'যীম করতে যেয়ে তাকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবে শির্কে নিপতিত হয়েছে। তাঁর সাহাবীগণও এই দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ২৫/৩০ বৎসর পরেও খলীফা 'আলী (রাঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে এ সকল শির্কের ওসীলা থাকলে তা ভাঙ্গতে তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধান আবুল হাইয়াষ আল-আসাদী-কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, 'আমি কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন: যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি

৫. ক্ববরের উপরে মাসজিদ নির্মাণ করতে রাসূল ﷺ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করেন, "যখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তিনি নিজেই ডোরাকাটা চাদরটি টেনে নিয়ে বারবার তাঁর মুখমণ্ডলের উপর রাখতে লাগলেন। যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তখন আমরা তা তুলে নিচ্ছিলাম। এই অবস্থায় তিনি ﷺ বললেন,

'আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ওপর, আল্লাহ্ ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে ধ্বংস করুন, কারণ তারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদ ও সলাতের স্থানে রূপান্তর করেছে।'[১]

জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি বা এক বিঘতের চেয়ে উঁচু) কোন ক্ববর দেখলে তা সব আশেপাশের মাটি সমান করে দিবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।' (সহীহ *মুসলিম,* কিতাবুল জানায়িজ, হাদীছ নং ৯৬৯; বিস্তারিত দেখুন: এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৯৬-৪৪৩)

উল্লেখ্য: অধিকাংশ মুসলিম দেশের মানুষেরা এ হাদীছগুলোকে ভুলে গেছে। অন্যান্য দেশের অনুকরণে তারাও ক্ববরের উপরে বিভিন্ন ধরণের সৌধ, ইমারত, মসজিদ ও মাজার নির্মাণ করেছে। মিশরের মত দেশের ক্ববরস্থানগুলোকে মনোরম শহরের মতো করে সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সুন্দর সুন্দর রাস্তা। মৃতের স্মরণে নির্মিত মাজার বা সমাধি বা সৌধগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে অনেক গরীব পরিবার সেগুলোকে ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে স্থায়ী নিবাসরূপে বসবাস শুরু করছে। উপরোক্ত হাদীছসহ এ বিষয় সংশ্লিষ্ট আরও অনেক হাদীছ অনুযায়ী কেবল এ ধরণের সকল সৌধকেই ধ্বংস করা হবে না; বরং ভারতের তাজমহল, পাকিস্তানের করাচীতে অবস্থিত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ 'আলী জিন্নাহ-এর ক্ববরের উপরে নির্মিত সৌধ, সুদানের তথাকথিত মাহ্‌দী এবং মিশরের সাইদ আল-বাদাভীর ক্ববরের উপরে নির্মিত জাঁকালো সমাধিগুলোকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এ লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফলে, পরিদর্শকদের দান-খয়রাতের উপর বেঁচে থাকা এ সকল সমাধি বা মাজারকে কেন্দ্র করে অবস্থানকারী তথাকথিত খাদেমদের কর্মকাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অজ্ঞতায় নিমজ্জিত পরিদর্শনকারী মানুষেরা মনে করে মাজারের খাদেমদের প্রতি দয়াবান হলে ওলী-আউলীয়া বা সাধু-দরবেশের নিকট থেকে কৃপা লাভে ধন্য হওয়া সহজ তাই তারা খাদেমদেরকে বেশি বেশি দান-খয়রাত করে থাকে।

[১] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃ., হাদীছ নং ৪২৭; *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ., হাদীছ নং ১০৮২; আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড,৯১৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২২১ এবং আদ-দারিমি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ক্ববর বা ক্ববরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা সলাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাল ﷺ ইহূদী-খ্রিস্টানদেরকে এভাবে কঠিন ভাষায় লা'নত ও অভিশাপ করেছেন। মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহ্‌র ইবাদত। অথচ আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য তিনি ঐসব জাতিকে লা'নত করলেন শুধুমাত্র কবরের কাছে এই ইবাদতগুলি পালন করার কারণে। এমনকি আমরা দেখছি যে, ক্ববর পাকা করা বর্জন করা কঠোরভাবে তা নিষেধ করা এবং কবরের পার্শ্বে মসজিদ বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা আদর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই চলেছেন। একইভাবে পরবর্তী দুই মুবারক যুগের মানুষেরা চলেছেন। এ সকল যুগের উলামায়ে কিরাম, আলিম, ইমাম, দরবেশ, সাধক কারো ক্ববর তাঁরা পাকা করতেন না, গম্বুজ বানাতেন

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"হে আল্লাহ্, আমার ক্ববরকে যেন পূজার বস্তু বানিয়ে দিবেন না যাকে ইবাদাত করা হবে। আল্লাহ্র অভিশাপ ও গজব সেই সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নবীগণের ক্ববরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।[১]

৬. ক্ববর পূজার সম্ভাব্য সকল উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজের কবরের চতুর্দিকে বাৎসরিক বা মৌসুমী জমায়েত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'আমার ক্ববরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না অথবা তোমাদের বাড়িকে ক্ববরস্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা যে কোন জায়গা থেকেই আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে শান্তি (রহমত) কামনা কর না কেন, তা আমার কাছে পৌঁছে যাবে।[২]

৭. ক্ববরকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। এ চর্চা অন্যান্য সকল ধর্মে শির্কী তীর্থযাত্রার সূচনা করে। আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) উভয়েই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

'*মাসজিদ হারাম* (মক্কার কা'বা), *মাসজিদে নববী* (নবীর মাসজিদ) এবং *আল-আকসা*-এ তিন মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করো না।'[৩]

আবু বাসরা আল-গিফারি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা এক সফর হতে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। এ সময় আবু বাসরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

না। ক্ববর কেন্দ্রিক কোন প্রকারের অনুষ্ঠান, উৎসব, ওরস, ইসালে সাওয়াব, মাহফিল, আয়োজন ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এমনকি প্রাচীন যুগের কোন নাবীর ক্ববরকেও তাঁরা পাকা করে গম্বুজ গেলাফ দিয়ে মাজার বানিয়ে দেন নি। উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর খিলাফতকালে ইরাকে দানিয়েল নাবীর কবরের সন্ধান পান। কবরের মধ্যে অনেক কিতাবও পাওয়া যায়। তিনি ক্ববর লোকচক্ষুর আড়াল করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। সেখানে প্রাপ্ত কাগজপত্রও দাফন করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। (তাফসীরে ইবনু কাসীর, ৩/৭৬)

[১] মুয়াত্তা মালিক ১/১৭২; মুসনাদ *আহমাদ* ২/২৪৬।

[২] আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৫৪২-৫৪৩ পৃ., হাদীছ নং ২০৩৭ এবং *আহমাদ*। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ববরকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক উৎসব বা সমাবেশকে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে তথাকথিত পীর-মাশাইখ, ওলী-আউলীয়া, বুযুর্গানদের ক্ববর, মাজার ও সমাধিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উৎসব যেমন, তাদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন অথবা অন্য কোন উপলক্ষে সমাবেশ ও অনুষ্ঠান পালন করা তো ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে বাইরে। চতুর্থ খলীফা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত হাদীছ অনুসারে, সমাধি ও মাজার কেবল ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হওয়া নয়, বরং এগুলোকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার ধর্মীয় উৎসব চিরতরে বন্ধ করতে হবে।

[৩] অর্থাৎ ক্ববর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে। ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ১৫৭ পৃ., হাদীছ নং ২৮১; ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৬৯৯ পৃ., হাদীছ নং ৩২১৮; আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৫৪০ পৃ., হাদীছ নং ২০২৮; তিরমিযি; আন-নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ।

কোথা থেকে আসছেন, সে সম্পর্কে আবু হুরায়রা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। আবু বাসরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উত্তরে বলেন যে তিনি আত্‌-তূর থেকে সলাত আদায় করে এসেছেন। এ কথা শুনে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, তুমি সেখানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি তোমার সাথে সাক্ষাত হতো, কারণ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

'*মাসজিদ হারাম* (মক্কার কা'বা), *মাসজিদে নববী* (নবীর মাসজিদ) এবং *আল-আকসা* -এ তিন মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদের উদ্দেশ্যে (নেকি লাভের আশায়) ভ্রমণ করো না।'[১]

ক্ববরকে ইবাদাতের স্থান বা মসজিদে পরিণত করা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইবনু মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন,

'শেষ যামানায় (ক্বিয়ামাতের পূর্বে) যারা বেঁচে থাকবে এবং ক্ববরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণতকারীরাই মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'[২]

জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

'তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নাবী ও ওলীদের ক্ববরগলোকে মসজিদ, ইবাদতগাহ বা সলাতের স্থান বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো ক্ববরকে মসজিদ বা ইবাদত ও সলাতের জায়গা বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে।'[৩]

উপরোক্ত হাদীছগুলো হতে ক্ববরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করার নিষিদ্ধতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ হাদীছগুলোতে *'ক্ববরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করা'* বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দসমষ্টি দ্বারা তিন ধরণের সম্ভাব্য অর্থ প্রদান করা যেতে পারে:

১. ক্ববরের উপরে বা ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায় বা সিজদা করা:

ইবনে 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীছ দ্বারাই ক্ববরে সলাত আদায় নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। উক্ত হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

[১] ***আহমাদ*** ও আত-তাইলাসি কর্তৃক সংগৃহীত। আলবানী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। *আহকাম আল-জানাইয,* ২২৬ পৃ. দেখুন।

[২] ***আহমাদ*** কর্তৃক সংগৃহীত।

[৩] সহীহ ***মুসলিম*** ১/৩৭৫-৭৬, হাদীছ নং ২৩, ৫৩২, ১০৮৩।

'ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায় করবে না অথবা ক্ববরের উপরে বসবে না।'[১]

তাছাড়া পূর্বে বর্ণিত আবু মুরছিদ-এর হাদীছের বক্তব্যও একই।

২. **ক্ববরের উপর মসজিদ নির্মাণ অথবা মাসজিদের ভিতরে ক্ববর স্থাপন করা:**

উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে ক্ববরের উপরে মাসজিদ নির্মাণ অথবা মাসজিদের ভিতরে ক্ববর স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাখ্যা করে বলেন, ক্ববরের উপর ইবাদাতের স্থান নির্মাণকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বশেষ হাদীছের ব্যাখ্যানুযায়ী মাসজিদের ভিতরে ক্ববর স্থাপন করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। এ হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'নাবী-রাসূলদের ক্ববরকে মাসজিদে রূপান্তরকারীদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করুন।'[২]

আবু উবাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ যে কথা বলেন তা হল, "... তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নাবীদের ক্ববরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেয়।[৩]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাসজিদে ক্ববর দেয়া হলে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত এই শেষ বাণীর উপর ভিত্তি করেই সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

৩. **ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় করা:**

ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ। কারণ, ক্ববরকে মসজিদ হিসেবে গণ্য করা তথা সেখানে সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হল ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় করার নিষেধাজ্ঞা। কোন পথ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে, উক্ত পথের শেষ অবধি যা রয়েছে তা এমনিতেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা যেতে পারে, বাঁশী এবং তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষিদ্ধ করেছেন। আবু মালিক আল-আশ'আরি বর্ণনা করেন যে তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

---

[১] আত্ব-ত্ববারানি কর্তৃক সংগৃহীত।

[২] ***বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃ., হাদীছ নং ৪২৭ এবং ২য় খণ্ড ২৩২ পৃ., হাদীছ নং ৪১৪; ***মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ., হাদীছ নং ১০৮২; আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৯১৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২২১।

[৩] মুসনাদ ***আহমাদ*** ১/১৯৫। দেখুন: সহীহ ***বুখারী,*** ফাতহুল বারী ১/৫৩১, হাদীছ নং ৪৩৪, ৩/২০৮; সহীহ ***মুসলিম*** ১/৩৭৫-৩৭৬, হাদীছ নং ১৬/৫২৮।

'আমার অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক অবৈধ যৌন মিলন, রেশমের কাপড় পরিধান করা (পুরুষের জন্য), মাদকদ্রব্য এবং বাদ্যযন্ত্রকে (মা'আযিফ) হালাল মনে করবে।'[1]

অতএব, বাদ্যযন্ত্রকে নিষিদ্ধ করা হলে, বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং তার শ্রবণ করা উভয়ই নিষিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। একইভাবে, ক্ববরের উপরে মাসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে এটা মনে করা ঠিক নয় যে, মাসজিদ নির্মাণ করা ভালো কাজ নয়। কারণ, অন্য জায়গায় মাসজিদ নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর কাজ। এ ক্ষেত্রে ক্ববরের উপরে নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। অতএব ক্ববরের উপরে সলাত আদায় (ইবাদাত করা) নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা কিংবা ক্ববরের উপরে নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় বা ইবাদাত করা নিষিদ্ধ।

ক্ববরবিশিষ্ট মাসজিদ

এ ধরণের মাসজিদ প্রতিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে দু'প্রকার:

১. ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদ, এবং

২. যে মাসজিদ নির্মাণের পর এর ভিতরে ক্ববর দেয়া হয়েছে।

সলাত আদায়ের ব্যাপারে উক্ত দু'প্রকার মাসজিদের মধ্যে কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উভয় ক্ষেত্রে, ক্ববরের প্রতি কোন মনোযোগ না দেয়া হলেও, এ মাসজিদগুলোতে সলাত আদায় করা উচিত নয়। আর, ক্ববরকে উদ্দেশ্য করে সলাত আদায় করা হলে তা হারাম। যা হোক, ক্ববরগুলো নির্মিত হওয়ার উৎসের উপর ভিত্তি করে এগুলোকে সংশোধন করার প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা দেখা দেয়:

১. ক্ববরের উপরে নির্মিত মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং উক্ত ক্ববরের উপরে কোন সৌধ থাকলে তা মাটি সমান করতে হবে। এ মাসজিদটি যেহেতু একটি ক্ববর হিসেবে ছিল, তাই এটির পূর্বাবস্থায় ফিরে নিতে হবে।

২. মাসজিদের ভিতরে স্থাপিত ক্ববরকে অন্যত্র সরাতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ মাসজিদটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কালে যেহেতু এটি একটি মাসজিদরূপেই ছিল এবং তখন উক্ত ক্ববরটি এ মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাই মাসজিদটিকে তার পূর্ববস্থায় ফিরে আনতে হবে।

---

[1] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজী), ৭ম খণ্ড, ৩৪৫ পৃ., হাদীছ নং ৪৮৪।

রাসূল ﷺ-এর ক্ববর

মদীনায় রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মাসজিদের ভিতরে তাঁর ক্ববরের উপস্থিতিকে অন্য কোন মাসজিদে কাউকে ক্ববর দেয়া বা কবরের উপরে মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা কোনক্রমেই যাবে না। রাসূল ﷺ তাঁর মৃতদেহকে মাসজিদের ভিতরে সমাহিত করতে বলে যান নি অথবা সম্মানিত সাহাবীগণও তাঁর ক্ববরকে মাসজিদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। পরবর্তী প্রজন্মের লোকজন রাসূলের ক্ববরের প্রতি অত্যধিক ভক্ত হয়ে পড়বে -এ ভয়ে সাহাবীগণ বিচক্ষণতার সাথে রাসূল ﷺ-কে সাধারণ ক্ববরস্থানে দাফন করেন নি। গাফরার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস 'উমার বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-কে কোথায় দাফন করবেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহাবারা যখন একত্রিত হলে একজন বলল, 'চলুন, আমরা রাসূল ﷺ-কে সেখানেই দাফন করি যেখানে তিনি সলাত আদায় করতেন।' আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন, 'তাঁকে পূজা করার মূর্তিতে পরিণত করা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন।' অন্যান্যরা বলল, 'আল-বাকিতে যেহেতু মুহাজিরিনদেরকে (যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছিল) ক্ববর দেয়া হয়েছে, তাই চলুন, তাঁকেও সেখানে দাফন করি।' তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'নিশ্চয়ই, রাসূল ﷺ-কে আল-বাক্বিতে দাফন করা মানে তাঁকে হেয় করা; কারণ কেউ কেউ তাঁর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে যা একমাত্র আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব, আমরা যদি তাঁকে বাইরে (ক্ববরস্থানে) নিয়ে যাই এবং সতর্কতার সাথে তাঁর ক্ববরকে পাহারা দিলেও, আমাদের দ্বারা আল্লাহ্র হক্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।' তারপর তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবু বাকর, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' তিনি উত্তর দিলেন, "আমি রাসূল ﷺ-কে একটি কথা বলতে শুনেছি, তা ভুলি নি। তিনি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন নাবীর রুহ সেখানেই কবজ করেন যেখানে তাঁকে দফন করা তিনি পছন্দ করেন।' অতএব তোমরা তাঁকে তাঁর বিছানার স্থানেই দাফন কর।"

কয়েকজন বলল, 'আল্লাহ্র কসম, আপনি যা বললেন তা সন্তোষজনক এবং প্রত্যয়যোগ্য।' তারপর তারা রাসূলের ﷺ শয্যাস্থানের ('আয়িশার ঘরে) চতুর্দিকে দাগ দিলেন এবং সেখানে ক্ববর খুঁড়লেন। 'আলী, আল-'আব্বাস ও আল-ফাযল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং রাসূলের পরিবার তাঁর দেহ দাফন করার জন্য প্রস্তুত করলেন।[১]

---

[১] ইবনু যানজূইয়্যা কর্তৃক সংগ্রহীত। আলবানী তাঁর লিখিত *'তাহযীর আস-সাজিদ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২), ১৩-১৪ পৃ.।

'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘর এবং মাসজিদের মধ্যে পার্থক্য ছিল মাত্র একটি দেয়াল। দেয়ালে একটি দরজা তৈরি করা হয়েছিল। এ দরজা দিয়েই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত পরিচালনার জন্য মাসজিদে প্রবেশ করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ববর হলে মাসজিদকে পৃথক করতে সাহাবীরা উক্ত দেয়ালের দরজাটিকে বন্ধ করে দেন। ফলে, তাঁর ক্ববরকে যিয়ারত করার জন্য তৎকালীন সময়ে মাত্র একটি পথ খোলা ছিল। তবে এ পথটিও ছিল মাসজিদের বাহিরে।

মাসজিদে নাবাবী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় খলীফা 'উমার এবং তৃতীয় খলীফা উছমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সময়ে। কিন্তু তাঁরা দু'জনই 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরগুলোকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে সতর্কতার সংঙ্গে বিরত থাকেন। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের ঘর অভিমুখে সম্প্রসারণ করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ববরও মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত অনিবার্যভাবেই। যা হোক, মদীনায় বসবাসকারী সকল সাহাবীদের মৃত্যু হলে[১] খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনু আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম মসজীদে নাবাবীকে পূর্বদিকে বর্ধিত করেন। আর তিনিই 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্য স্ত্রীদের ঘরগুলোকে ভেঙ্গে দেন। আল-ওয়ালিদের গভর্নর 'উমার ইবনু 'আব্দুল-'আযীয এ সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করেন।

'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘর মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর চতুর্দিকে গোলাকার একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয় যেন তা মাসজিদের ভিতর থেকে আদৌ দেখা না যায়। পরবর্তীতে ঘরের উত্তর কোণা হতে আরও দু'টি অতিরিক্ত দেয়াল নির্মিত হয় যা ত্রিভুজাকারে পরস্পর মিলিত হয়। কেউ যেন সরাসরি ক্ববরের দিকে ফিরতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেই মূলত এ কাজ করা হয়েছিল।[২]

অনেক বছর পার হয়ে যায়, মাসজিদের ছাদের সঙ্গে গম্বুজের সংযোজন ঘটানো হয়। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ববরের উপরেও সরাসরি তা স্থাপন করা হয়।[৩] পরবর্তীতে দরজা ও জানালাবিশিষ্ট পিতলের খাঁচা দ্বারা পরিবেষ্টিত করে ক্ববরের দেয়ালগুলোকে সবুজ কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

---

[১] যাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন মদিনায় মৃত্যুবরণকারী শেষ সাহাবী। তিনি খলিফা 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে (৬৮৫-৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] কুরতুবী কর্তৃক বর্ণিত। *তাইসীর আল-'আযীয আল-হামীদ,* ৩২৪ পৃ.য় উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩] ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কালাউন আস-সালাহী সর্বপ্রথম রাসূলের সেই ঘরের উপরে গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং ১৮৩৭ সালে সুলতান আব্দুল হামিদের আদেশে এ গম্বুজগুলোকে প্রথম সবুজ রং করা হয়। ('আলী হাফীয, *History of Madina,* Jeddah: al-Madina Printing and Publication Co., ১ম সংস্করণ ১৯৮৭), ৭৮-৭৯ পৃ.।

ক্ববরের চতুর্দিকে যদিও প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই ভ্রান্তির সংশোধন আবশ্যক। দেয়ালের মাধ্যমে আবারও ক্ববরকে মূল মাসজিদ থেকে পৃথক করতে হবে, যেন কেউ ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায় বা মাসজিদের ভিতর থেকে দেখতে না পারে।

রাসূলের মাস্‌জিদে সলাত আদায়

কেবল মাস্‌জিদে নববী ব্যতীত অন্য কোন ক্ববরবিশিষ্ট মাস্‌জিদে সলাত আদায় করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কারণ, অন্যান্য ক্ববরবিশিষ্ট মাসজিদের ব্যাপারে তেমন কোন গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় না, যেমনটি পাওয়া যায় মাসজিদে নববীর ক্ষেত্রে।[১] রাসূল ﷺ স্বয়ং সে সব বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে বলেন,

'আল-মাসজিদ আল-হারাম, আল-মাসজিদ আল-আক্বসা এবং আমার মাসজিদ - এ তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদকে উদ্দেশ্য করে ভ্রমণ করো না।'[২]

তিনি ﷺ আরও বলেন,

'আমার মাসজিদে এক রাক'আত সলাত আদায় করা, অন্যত্র (আল-মাসজিদ আল-হারাম ব্যতীত) ১০০০ রাক'আত সলাতের চেয়েও অনেক উত্তম।[৩]

তাঁর মাসজিদের এক অংশের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন:

'আমার ঘর এবং আমার মিম্বারের মাঝামাঝি জায়গায় জান্নাতের একটি বাগান রয়েছে।'[৪]

রাসূলের মাসজিদে সলাত আদায় করা যদি মাকরূহ (অপছন্দনীয়) হতো, তাহলে তাঁর মাসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত সকল গুণাবলী অকেজো হয়ে যেত এবং অন্যান্য সাধারণ মাসজিদের চাইতে রাসূলের মাসজিদের বিশেষত্ব বলে কিছুই

---

[১] এ ধরণের কোন গল্পের সত্যতার প্রমাণ নেই যে, কা'বার উন্মুক্ত অংশে নাবী ইসমাঈল ﷺ এবং তাঁর মা অথবা অন্য কোন নবীকে সমাহিত করা হয়েছে।

[২] আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ১ম খণ্ড, ১৫৭ পৃ., হাদীছ নং ২৮১; *মুসলিম* কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৬৯৯ পৃ., হাদীছ নং ৩২১৮; আবু দাঊদ, *সুনান আবি দাঊদ,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৫৪০ পৃ., হাদীছ নং ২০২৮; তিরমিযি; আন-নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ।

[৩] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ২য় খণ্ড, ১৫৭ পৃ., হাদীছ নং ২৮২; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৬৯৭ পৃ., হাদীছ নং ৩২০৯।

[৪] *বুখারী,* (আরবী-ইংরেজি), ৩য় খণ্ড, ৬১-৬২ পৃ., হাদীছ নং ১১২; *মুসলিম,* (ইংরেজি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ৬৯৬ পৃ., হাদীছ নং ৩২০৮।

অবশিষ্ট থাকত না। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি বিশেষ সময়ে সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও 'কারণবিশিষ্ট' স্লাত আদায় করা যায়। যেমন, তাহিইয়াতুল মাসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযু, সূর্য গ্রহণের স্লাত, জানাযার স্লাত ইত্যাদি।[১] অনুরূপভাবে, কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে রাসূল ﷺ-এর মাসজিদে সলাত আদায় করা জায়েয।[২] অতএব, আল্লাহ্ না করুন, *'আল-মাসজিদ আল-হারাম* অথবা *'আল-মাসজিদ আল-আক্বসা'*-তে কোন ক্ববর দেয়া হলেও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ মাসজিদগুলো বিশেষ সম্মান ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে এ দু'টি মাসজিদে স্লাত আদায় করা জায়েয হতো।

---

[১] ***ফিকহুস সুন্নাহ,*** ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ.।

[২] *তাহ্যীর আস-সাযিদ,* ১৯৬-২০০ পৃ.।

শেষকথা

কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে শির্ক থেকে মুক্ত ও তাওহীদের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত সত্যিকারের ঈমানই একমাত্র আল্লাহ্র স্বীকৃত ও তাঁর নিকটে গ্রহণযোগ্য। আর এ সম্পর্কে পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদান বা দক্ষতার সাথে তাদের কৃত কার্যকলাপের ব্যাখা-বিশ্লেষণ করলেও, আদর্শ ঈমান থেকে বিচ্যুতির কারণে তাদের সকল ক্রিয়াকলাপ পৌত্তলিকতা ও কুফরী (অবিশ্বাস) বলে গণ্য। আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিকভাবে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তাঁর একত্ব সর্বদা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্ একত্বের বাণী প্রচারিত হয়েছিল তাঁরই প্রেরিত সকল নাবী ও রাসূল ﷺ কর্তৃক। সুতরাং এ তত্ত্বটি শুধু নীতিগতভাবে মূল্যায়ন বা আবেগজনিত সমর্থনের জন্য নয়; বরং আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় এটি একটি প্রয়োগবাদী পরিকল্পনা বৈ কিছুই ছিল না। এ সত্যতার তাৎপর্য মূলত মানবের সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

"আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" [সূরা আয্-যারিয়াত (৫১): ৫৬]

মানুষের সৃষ্টি মূলত আল্লাহ্র নিখুঁত গুণাবলীর অন্যতম প্রকাশ। তিনি স্রষ্টা (আল-খালিক) এবং একমাত্র তিনিই মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি পরম দয়ালু (আর-রাহমান), তাই এ বিশ্বের জন্য সুখ ও শান্তি প্রদান করেছেন। তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী (আল-হাকীম), তাই মানুষের জন্য যে সব বস্তু ও কর্ম ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং যা উপকারী তার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল (আল-গফূর), তাই যারা আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। আবু আইয়ুব ও আবু হুরায়রা উভয়েই বর্ণনা করেন যে রাসূল ﷺ বলেন,

"যদি তোমরা কোন পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতেন এবং এমন জাতিকে তোমাদের জায়গায় স্থানান্তর করতেন যারা পাপ করতো ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতো, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।[১]

---

[১] ***মুসলিম*** কর্তৃক সংগৃহীত, (ইংরেজি অনুবাদ), খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৬-৩৭, হাদীছ নং ৬৬২০-২২।

একইভাবে, মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অন্যান্য সকল স্বর্গীয় গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে।

অন্যদিকে, আল্লাহ্‌ যেহেতু মানুষের 'ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন, তাই মানুষ তার নিজের কল্যাণের নিমিত্তেই আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে। আল্লাহ্‌কে 'ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব ও আত্মিক উভয় দিকের কল্যাণের সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করে; তাই ক্ষণকালের এ পার্থিব ভ্রমণের শেষপ্রান্তে এসে সে তার নিজের জন্য চিরস্থায়ী সুখের বাসস্থান জান্নাত লাভ করে ধন্য হয়। ফলশ্রুতিতে, আল্লাহ্‌র একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানুষের জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডকে 'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করে, যদিও কিছু কিছু কর্মকে তাৎপর্যহীন ও মামুলি মনে হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক:

১. কাজটি অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

২. কাজটি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে।

মানুষ তার পুরো জীবনকে সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজের মধ্য দিয়ে ব্যয় করতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٦٢)

"বল, আমার সলাত, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)।"

[সূরা আল-আন'আম (৬): ১৬২]

তবে এ কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঐ পর্যায়ে পৌঁছা কেবল তাওহীদের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে সতর্কতার সাথে ও সচেতনভাবে এ তাওহীদের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

সুতরাং তাওহীদ বিরোধী সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও পরিবার-পরিজন, গোষ্ঠি বা জাতির সঙ্গে আবেগতাড়িত বন্ধনকে এক পার্শ্বে রেখে ঈমানের মূল ভিত্তি তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়নকারী প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক। কারণ, শুধুমাত্র এ তাওহীদের জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হতে পারে।

সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এবং বাইরে। আল্লাহ্কে বর্ণনা করতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সৃষ্টির সীমা বহির্ভূত। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নন অথবা কোন সৃষ্টির অংশ বা অংশবিশেষ কোনক্রমেই তাঁর উর্ধ্বে নন। তিনি সৃষ্টিজগতের কোন অংশও নন অথবা সৃষ্টিজগতও তাঁর কোন অংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সত্তা সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও বিছিন্ন। তিনিই স্রষ্টা এবং সমগ্র মহাবিশ্ব ও এর মধ্যস্থিত সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির অংশবিশেষ মাত্র। যা হোক, আল্লাহ্র গুণাবলী কোনক্রমেই তাঁর সৃষ্টির মতো সসীম নয়, বরং তা অসীম। তিনি দেখেন, শ্রবণ করেন এবং সব কিছুই জানেন। সৃষ্টজগতে সংঘটিত সকল কিছুর মূল কারণ তিনিই। কিছুই ঘটে না একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত। অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম মূলত দ্বৈতবাদীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও ভিন্ন। আর এটিই পূর্ণ একত্ববাদ। এ দ্বৈতবাদীসুলভ ধারণায় স্রষ্টা তো স্রষ্টাই এবং সৃষ্টি তো সৃষ্টিই। দুটি পৃথক সত্তা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। অসীম ও সসীম। কোনক্রমেই একটি অন্যটির পরিপূরক নয় অথবা উভয়ই এক নয়। একই সময়ে ইসলাম দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র একত্বের ধারণা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে এক; তাঁর কোন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি বা অংশীদার নেই। তিনি শক্তি ও ক্ষমতায় এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই। একমাত্র তিনিই এ মহাবিশ্বের সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক ও উৎস।[১] সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। একইরূপ, সৃষ্টির সাথে

---

[১] কারো ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে অনুযায়ী যখন তিনি কোন দল বা গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসাবার ইচ্ছা করেন, তখন জনগণের অন্তরকে সে দলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট করে দেন। তাই তারা স্বেচ্ছায় অথবা কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও তাদেরকে ভোট দেয় এবং এ প্রক্রিয়ায়ই সে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে যেহেতু জনগণ কোন দলকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য ভোট দিতে পারে না, সেহেতু ক্ষমতার মূল মালিক হলেন তিনিই, জনগণ নয়। সে-জন্য কেউ যদি এ কথা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পিছনে আল্লাহর কোন হাত নেই এবং জনগণই এর সব কিছুর মালিক, তবে তার এ ধারণা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। এমন ধারণা না নিয়ে বললে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কথাটি আপত্তিকর হওয়ায় তা শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরণের কথা বলার বিষয়টি শর'য়ী দৃষ্টিতে গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম ধারার প্রথম প্যারাতে এ জাতীয় সিদ্ধান্তই গৃহীত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি হল: 'All powers in the Republic belong to the people and their exercise on behalf of the people shall be effective only under, and by the authority of this Constituion' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ৬) জনগণকে এ ধরণের ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: *'সকল ক্ষমতার মালিক কেবল আল্লাহ।'* [সূরা বাক্বারা (২): ১৬৫] *'বল, হে আল্লাহ!*

লেখকের গ্রন্থপঞ্জী

১. সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, ***তাইসীর আল-'আজীজ আল-হামীদ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী; ২য় সংস্করণ, ১৯৭০)।

২. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, ***আল-সিলসিলাহ আল-আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ,*** (কুয়েত: আদ-দার আছ-ছালাফীয়্যা এবং ইয়েমেন: আল-মাকতাবাহ আল ইসলামীয়্যা; ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), ভলিউম: ৪

৩. ঐ, ***আহকাম আল-জানাইজ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল ইসলামীয়্যা; ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)।

৪. ঐ, ***মুখতাছার আল-'উলূম,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল ইসলামী; ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

৫. ঐ, **ছহীহ সুনান আত-তিরমিযী,** (রিয়াদ: আরব ব্যুরো অভ্ এডুকেশন ফর দ্যা গাল্ফ স্টেটস; ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)।

৬. ঐ, ***তাহযীর আছ-ছাযিদ,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল ইসলামী, ২য় সংস্করণ; ১৯৭২)।

৭. 'আলী, আব্দুল্লাহ ইউসূফ, ***পবিত্র কুরআন*** *(ইংরেজি অনুবাদ),* (বৈরুত: দার আল-কুরআন আল-কারীম)।

৮. Arberry, A.J., ***Muslim Saints and Mystics,*** (London: Routledge and Kegan Paul; 1976)।

৯. আশ'আরি, আবূল-হাছান 'আলী আল, ***মাকালাত আল-ইসলামিয়্যীন,*** (কায়রো: মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিছরীয়্যা; ২য় সংস্করণ ১৯৬৯)।

১০. আসক্বালানি, আহমাদ ইবনে 'আলী ইবনে হাজার আল-, ***তাহযীব আত-তাহযীব,*** *(হায়দ্রাবাদ: ১৩২৫-৭)*।

১১. আশক্বার, 'উমার আল, ***আল-'আক্বীদাহ ফি আল্লাহ্*** (কুয়েত: মাকতাব আল-ফালাহ; ২য় সংস্করণ ১৯৭৯)।

১২. বাগদাদী, 'আবদুল-ক্বাহির ইবনে তাহির আল-, ***আল-ফার্ক্ব বাইন আল ফিরাক্ব,*** *(বৈরুত: দার আল-মা'রিফা; সংস্করণ বিহীন)*।

১৩. বায়হাকী, আহমাদ ইবনে আল-হুসাইন আল-, ***কিতাব আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*** *(বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ঈলমীয়্যা; ১ম সংস্করণ ১৯৮৪)*।

১৪. Cowan, J.M., ***The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic,*** *(New York: Spoken Language Services Inc.; 3rd ed., 1976).*

১৫. Essien-Udom, E.U., ***Black Nationlism,*** *(শিকাগো: শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৬২)*।

১৬. গুনাইমান, 'আব্দুল্লাহ আল, ***শারহ্ কিতাব আত-তাওহীদ মিন ছহীহ আল-বুখারী,*** (মাদীনা: মাকতাবাহ আদ-দার; ১৯৮৫)।

১৭. Gibb, H.A.R., ***Shorter Encyclopedia of Islam,*** (Ithaca, New York: Cornell University Press; 1953).

১৮. হাফিজ, 'আলী, ***Chapters from the History of Madina,*** (জেদ্দা: আল-মাদীনা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন কো.; ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭)।

১৯. হাছান, আহ্মাদ, ***সুনান আবী দা'উদ*** (ইংরেজি অনুবাদ), (লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স; ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

২০. Hinnells, John, ***Dictionary of Religions,*** (England: Penguin Books, 1984).

২১. Hitching, Franced, ***The Neck of the Giraffe,*** (New York: Ticknor and Fields, 1982).

২২. বাইবেল, Revised Standard Version (নেলসন, ১৯৫১)।

২৩. হুজরীরী, 'আলী ইবনে 'উছমান আল-, ***কাশফ আল-মাহযুব,*** নিকলসান কর্তৃক অনূদিত, (লন্ডন: লূয্যাক; ১৯৭৬ সালে পুনরায় মুদ্রিত)।

২৪. ইবনে আবিল-'ইয আল-হানাফী, ***শারহ্ আল-'আক্বীদাহ আত-তহাভীয়্যা,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী; ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

২৫. ইবনে আছীর, ***আন-নিহায়্যাহ ফি গরীব আল-হাদীছ ওয়া আল-আছার,*** (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যা; ১৯৬৩)।

২৬. ইবনে আল-জাওযি, ***সিফাহ আছ-ছাফওয়াহ,*** (কায়রো: দার আল-ওয়া'ঈ, ১ম সংস্করণ; ১৯৭০)।

২৭. ইবনে হাম্বল, আহমাদ, ***আর-রাদ 'আলা আল-জাহিমিয়া,*** (রিয়াদ: দার আল-লিওয়া; ১ম সংস্করণ ১৯৭৭)।

২৮. ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ, ***আত-তাওয়াসসুল ওয়াল-ওয়াসীলাহ,*** (রিয়াদ: দার আল-ইফতা; ১৯৮৪)।

২৯. Johnson-Davies, Denys, ***An-Nawawi's Forty Ḥadith,*** (English Trans.), (Damascus, Syria: The Holy Koran Publishing House; 1976).

৩০. খান, মুহাম্মাদ মুহসিন, ***ছহীহ আল-বুখারী,*** (আরবী-ইংরেজি), (রিয়াদ: মাকতাবা আর-রিয়াদ আল-হাদীছা; ১৯৮১)।

৩১. খোমেনি, আয়াতুল্লাহ মূসাভী আল-, ***আল-হুকূমাহ আল-ইসলামিয়া,*** (বৈরুত: আত-তালী'আ প্রেস; আরবী সংস্করণ, ১৯৭৯)।

৩২. Lane, Edward William, ***Arabic-English Lexicon,*** (Cambridge, England: Islamic Texts Society; 1984).

৩৩. মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে, ***লিসান আল-'আরব,*** (বৈরুত: দার সাদির; সংস্করণ বিহীন)।

৩৪. মুহাম্মাদ, ইলিয়াহ, ***Our Saviour Has Arrived,*** (Chicago: Muhammad's Temple of Islam, ২য় ভলিউম, ১৯৭৪).

৩৫. মুযাফ্‌ফার, মুহাম্মাদ রিযা আল-, ***Faith of Shi'a Islam,*** (USA: Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)।

৩৬. ফিলিপ্স, আবূ আমীনাহ বিলাল, ***Ibn Taymiyah's Essays on the Jinn,*** (রিয়াদ: তাওহীদ পাবলিকেশন; ১৯৮৯)।

৩৭. রহীমুদ্দিন, মুহাম্মাদ, ***মুওয়াত্তা ইমাম মালিক,*** (ইংরেজি অনুবাদ), (লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স; ১৯৮০)।

৩৮. ***Readers Digest Great Encyclopedia Dictionary,*** (New York: Funk & Wagnalls Publishing Company, ১০ম সংস্করণ, ১৯৭৫)।

৩৯. Reese, W. L., ***Dictionary of Philosophy and Religion,*** (নিউ জার্সি: হিউম্যানিটিস প্রেস; ১৯৮০)।

৪০. রিযভি, সাইয়্যিদ সা'ঈদ আখতার, ***Islam,*** (তেহরান: A Group of Muslim Brothers, 1973)।

৪১. শাহরস্তানি, মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দুল-করীম আশ-, ***আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল,*** (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ; ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫)।

৪২. সিদ্দিকী, আব্দুল হামিদ, ***ছহীহ মুসলিম,*** (ইংরেজি অনুবাদ), (লাহোর: শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স; ১৯৮৭)।

৪৩. তাবারী, ইবনে যারির আত-, ***জামি' আল-বায়ান 'আন তা'বিল আল-কুরআন,*** (মিশর: আল-হালাবি পাবলিশিং কো.; ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯)।

৪৪. Wilson, Colin, ***The Occult,*** (New York: Randon House, 1971).

৪৫. যিরিকলি, খাইরুদ্দীন আয-, ***আল-'আলাম,*** (বৈরুত: দার আল-'ইলম লিল-মালাঈন; ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

অনুবাদকের গ্রন্থপঞ্জী

৪৬. ড. মুহাম্মাদ মুয্‌যাম্মিল আলী, ***শির্‌ক কী ও কেন?,*** (এডুকেশন সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ; প্রকাশকাল, ২০০৭ ঈসায়ী)।

৪৭. ঐ, ***দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়,*** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ; প্রকাশকাল, ২০০৬ ঈসায়ী)।

৪৮. সালিহ আল-উছায়মীন, ***ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম,*** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ; প্রকাশকাল, ২০০৭ ঈসায়ী)।

৪৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ***ইসলামী 'আক্বীদা,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ; প্রকাশকাল ২০০৭ ঈসায়ী)।

৫০. ঐ, ***এহ্‌ইয়াউস সুনান,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ; ৫ম সংস্করণ ২০০৭ ঈসায়ী)।

৫১. ঐ, ***রাহে বেলায়াত,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬ ঈসায়ী)।

৫২. ঐ, ***ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ২০০৬ ঈসায়ী)।

৫৩. ঐ, ***রাহে বেলায়াত,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ; ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬ ঈসায়ী)।

৫৪. ঐ, ***আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ)।

৫৫. ঐ, ***হাদীছের নামে জালিয়াতি,*** (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬ ঈসায়ী)।

৫৬. শফীউর রহমান মুবারাকপুরী, ***আর-রাহিকুল মাখতূম,*** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৯ ঈসায়ী)।

৫৭. ড. মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুর রহমান আল-উরাইফী, ***তাওহীদের কিশতী,*** (আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী, ঢাকা; ২য় প্রকাশ ২০০৮ ঈসায়ী)।

বি. দ্র.—অনুবাদকের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত বইগুলো তাওহীদ পাবলিকেশন্সে পাওয়া যাচ্ছে।

ড. বিলাল ফিলিপ্স[১]

জন্মঃ

জামেইকার অন্যতম নগরী কিংস্টন। যুক্তরাজ্যের ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশের অধিবাসী ও দ্বাদশ শতাব্দীর কুখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন হেনরী মরগ্যান এ নগরীতেই তার গোপন আস্তানা গড়ে তুলেছিল। ঈসায়ী সালটা ছিল ১৯৪৭। ধীরে ধীরে এ দ্বীপটি দ্রুতলয় সংগীতের এক নূতন জগতের রূপ পরিগ্রহ করছিল। ঠিক এ সময়েই **ডেনিস ব্রেইডলি ফিলিপ্স** জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি খ্রিস্টান পরিবারে। তাঁর পিতা 'Bradley' ছিলেন প্রোটেস্টান্ট চার্চের ক্ষমতাসীন বর্ষীয়ান যাজক এবং মাতা 'Joyce McDermott' ছিলেন ইংল্যান্ডের সরকারি প্রটেস্টান্ট গীর্জার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা। পিতা-মাতা দু'জনই ছিলেন তখনকার খ্যাতিমান শিক্ষক-শিক্ষিকা। দাদা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং গ্রীক, হিব্রু ও ইংরেজি ভাষায় লেখা বাইবেলের বিখ্যাত পণ্ডিত। এ পরিবার ছিল শিক্ষাবিদে পরিপূর্ণ ও উচ্চ শিক্ষিত। তাছাড়া, খুবই প্রশস্ত মনের অধিকারী হিসেবেও তাঁর বংশের কম পরিচিতি ছিল না।

শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য ও শিক্ষাঃ

জামেইকায় অবস্থানকালীন সময়ের তেমন কোন বিশেষ স্মৃতি তিনি মনে করতে পারেন না। বসবাসের জন্য তাঁর পরিবার যখন কানাডায় স্থানান্তরিত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে আমি খ্রিস্টান ধর্ম চর্চা বলতে বুঝতাম গীর্যায় মেয়েদের সাথে সাক্ষাত করা, বিভিন্ন পার্টির আয়োজন করা ইত্যাদি। আমি নিয়মিতভাবেই আমার মায়ের সংগে প্রত্যেক রবিবার গীর্যায় যেতাম, কিন্তু গীর্যায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে কখনোই জোর-জবরদস্তি করা হয় নি। গীর্যায় যাওয়ার ব্যাপারটি ধর্মীয় কাজের চেয়ে অনেকাংশে একটি সামাজিক কাজ বলেই গণ্য করা হতো। সেখানে যা শেখানো হতো বা প্রার্থনা করা হতো তা আমার এক কান দিয়ে ঢুকত এবং মস্তিস্কে কোন ক্রিয়া না করেই অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যেত।'

এ সময়ে কানাডায় অবস্থান করা সম্পর্কে তিনি বলেন, "মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কানাডায় এসে আমাকে যে বিষয়টির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল, 'আমাদের স্কুলের সীমানায় বড় সুইমিং পুল ছিল। নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল ছাত্রকে উলঙ্গ হয়ে পানিতে সাঁতার কাটতে হতো। বলা যায়, এটিই ছিল নিয়ম যা পালন করতে সকল ছাত্রই বাধ্য ছিল। তবে ডাক্তারের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং পিতামাতার সাক্ষরিত আপত্তিপত্র থাকলে কোন কোন ছাত্র এ বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেত। আমাকে মূলত এ আপত্তিকর বিষয়টি ব্যাপকভাবে

---

[১] বিলাল ফিলিপ্সের বক্তৃতা *'My Way to Islam'*, তাঁর নিজের লিখিত আত্মজীবনী, ২০ জুন (মঙ্গলবার) ২০০৬ তারিখে *'Saudi Gazette'*-এ Sabiha A. Muhammad এবং *'Gulf Today'*-তে Dominick Rodrigues কর্তৃক লিখিত *'Biography of Bilal Philips'* অবলম্বনে লিখিত হয়েছে এ পরিপূর্ণ জীবনী। -*অনুবাদক*

প্রভাবিত করেছিল।" এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁর পিতামাতার সংগে আলাপ করলে যে উত্তর তাঁরা প্রদান করেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে আমার বাবা-মা সেই জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন যা তারা অতিক্রম করে এসেছেন। বর্তমানে একজন বালক হিসেবে স্কুলে আমাকে যতটুকু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার চেয়ে বরং অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়েছিল।'

এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠা যেখানে এক জনের উপর আরেক জনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং এ ব্যাপারটিকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা বা বিবেচনা করা ছোট্ট বালকের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। তাঁর মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্যকরণের স্বল্প ক্ষমতা ও বোধশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ের অভ্যুদয় ঘটল যখন তিনি তারুণ্যে পদার্পন করলেন।

প্রথমবারের মতো এ অভিমানী বালক অনুভব করতে সক্ষম হল যে, এ পৃথিবীর সব ধারণা ও মতাদর্শ বা নীতি-নৈতিকতা সঠিক নয়। তখনকার দিনে কানাডার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইউরো-কানাডীয়। আর এই ইউরো-কানাডীয় জনগোষ্ঠীরা মনে করত যে শ্রেষ্ঠতায় তারাই প্রথম। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করত ও বিভিন্ন সমাজ থেকে আগত লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাত। তাই অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের মাধ্যমে তারা মানব সভ্যতা ধ্বংসের এ নিকৃষ্ট কাজের বৈধতা প্রমাণ করতে চেষ্টা চালাত এবং এ প্রকৃতির ধারণার প্রচার-প্রচারণায় তারা তাদের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে করত।

কানাডিয়া-কলোম্বিয়া প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও উপদেষ্টাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বলে বিলাল ফিলিপ্সের পরিবার যখন মালয়েশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়; তখনই প্রথমবারের মতো তিনি মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন।

তাঁর ভাষায়, 'যদিও এখানে এসে তুলনামূলকভাবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু একটি মুসলিম দেশে বসবাস করার অনুভূতি আমি খুব কম সময়ই মনোযোগের সাথে অনুভব করতাম। যেহেতু ব্রিটিশরা মালয়েশিয়াতেও পৌঁছেছিল তাই তাদের অবশিষ্টাংশ তদবধি বর্তমান ছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যেমন ছিল ইউরো-এশীয়, তেমনি ছিল এমন মালয়েশীয় মুসলিম যাদেরকে ইংরেজি ভাষাভাষি তথা ইংরেজ বলে গণ্য করা চলে, কারণ তাদের চাল-চলন তথা কৃষ্টি-কালচার ছিল সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের মতো। মালয়েশিয়ার সমাজে ইসলামের তেমন কোন চর্চাই আমি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রত্যক্ষ করি নি।'

তিনি আরো বলেন, 'মালয়েশিয়ায় থাকাকালে আমার বাবা-মা এক ইন্দোনেশীয় ছেলের দত্তক গ্রহণ করেন। ছেলেটির পিতামাতা ছিল ইন্দোনেশীয় কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল মালয়েশিয়ায়। তৎকালীন সময়ে মালয়েশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী কোন ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত সন্তানের জন্য মালয়েশিয়ার স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল না। তাই আমার পিতামাতা ভেবেছিলেন যে ঐ ছেলেটিকে কানাডায় নিয়ে গিয়ে শিক্ষিত করে তুলবেন। ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, ছেলেটি মুসলিম। ছেলেটির নাম ছিল *'আউহ সুলাইমান'*। কিন্তু পরবর্তীতে এ নামটি পরিবর্তন করে আমাদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল। সে ছিল এক প্রচণ্ড লজ্জাশীল বালক। *'ইসলাম'* সম্পর্কে সে আমাদেরকে কখনোই কিছু বলে নি। মাঝে মাঝে আমি যখন এ নতুন ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করতে দরজা খুলতাম তখন দেখতাম যে, সে দরজার দিকে মুখ করে তার মাথা এমনভাবে মেঝেতে ঠুকছে যেমনভাবে আমরা আমাদের মাথা গির্জাতে প্রার্থনার সময় মেঝেতে মাথা ঠেকাতাম। প্রায় প্রায় ছেলেটি তার ঘরের দরজার দিকে

মুখ করে আমাদের চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যায়ামের মতো অনুশীলন করত। এমনকি এ সময়ে আমি তার সামনে দিয়েই হেঁটে যেতাম। তাকে তার এ ধরণের কর্মকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে কোনই উত্তর দিত না। এমনকি অনেক জোর জবরদস্তি করেও কোন ফল হতো না। তাই এ ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখি নি এবং প্রকৃত ব্যাপার উদঘাটনে উঠে পড়েও লাগি নি। আমার মা যখন শুকরের মাংস রান্না করত তখন সে এ মাংস না খেয়ে মাছের তরকারি খেত। তখন আমি ভাবতাম যে, ছেলেটির রুচি বোধহয় একটু ভিন্ন রকমের। আমার মা ঐ ছেলেটির ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন বলে রামাযান মাস এলে মা ঐ ছেলেটিকে সেহ্‌রী খাওয়ার জন্য ডেকে দিতেন, সলাত আদায়ের সুযোগ করে দিতেন ইত্যাদি। তবে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করার পরে বুঝতে পেরেছি যে, সে তখন সলাত আদায়, সিয়াম পালনসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করত; কিন্তু সে কখনো আমাদেরকে তার এ সব অনুশীলন সম্পর্কে কিছুই বলে নি।

তিনি মালয়েশিয়াতে 'রক'-এর দল গঠন করে পেশাগতভাবে গিটার বাজানো শুরু করেন এবং বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মালয়েশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে *'Jimmy Hendrex of Shaba'* নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তখনকার জন্য তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল গান-বাদ্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ফলশ্রুতিতে এ-লেভেল পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি ভুক্তভোগী হন।

উচ্চশিক্ষাগ্রহণ ও বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া:

তাঁর বাবা-মা বুঝতে পারলেন যে, সে যদি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করে তাহলে এটি তার জন্য ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না। তাই তারা তাঁকে কানাডার Vancouver-এ অবস্থিত 'Simon Frasier University'-তে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, তখন এ বিশ্বাবিদ্যালয়টিই প্রথমবারের মতো *'Credit Hour'* পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম পরিচালনা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিল, যদিও তৎকালীন সময়ে কানাডার অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হতো।

তিনি বলেন, 'আমি যখন 'Simon Frasier University'-তে ভর্তি হই, তখন এ বিশ্ববিদ্যালের পরিবেশ তেমন পরিপাটি ছিল না, কেমন যেন এলোমেলো ও অগোছালো ছিল। আমেরিকা থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসত। আর তাদের ভাবাদর্শের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছিল। কারণ তাদের প্রচারিত মতবাদ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন সময় অ্যালেন জিন্সবার্গ ও টিমোথি লিরির মতো সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারা মাদক সংস্কৃতি ও হিপি[1] আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতেছিল। কয়েকটি বিভাগের বিশেষ কিছু শ্রেণীতে প্রভাষক ও অধ্যাপক তথা শিক্ষক-

[1] ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিবিধান অগ্রাহ্য করে অদ্ভুত বেশভূষা ও জীবনযাত্রার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে এমন ব্যক্তি।

শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গাঁজা[১] খেতে দিত। তারপর তারা সবাই মিলে ধূমপান করার পরে পড়াশোনা শুরু করত।'

তাছাড়া, কানাডায় ফিরে এসে তিনি ষাট-এর দশকের শেষদিকে ও সত্তর-এর দশকের প্রথমদিকে পরিচালিত 'The Volatile Student Movements' (প্রাণচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন)-এর দিকে ধাবিত হন।

তিনি বলেন, '১৯৬০ সালের শেষের দিকে আমি কানাডার Vancouver-এর 'Simon Frasier University'-তে অধ্যয়নরত অবস্থায় তৎকালীন স্কুলগুলো ছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ। আমাদের অধিকার আদায়ে লড়তে আমি ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং এ যুদ্ধে কানাডার সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি।'

এ সময়ে তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল একজন চিকিৎসা বিষয়ক আর্টিস্ট হওয়া যাতে বিজ্ঞান ও আর্টের প্রতি ভালবাসার মিশ্রিত রূপ দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অবশেষে তিনি বায়োকেমিস্ট্রি বিষয় পছন্দ করেন। অন্যদিকে আর্ট ইউনিভার্সিটি থেকেও স্কলারশিপ অর্জন করতে সক্ষম হন।

জীবনের লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হবার পূর্বেই তিনি নিজেকে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেন। যে বীজ তাঁর শৈশবে বপন করা হয়েছিল এবং যে ধারণার শক্তিতে মনে হচ্ছিল যে, এই পশ্চিমা সমাজে বোধহয় অজানা এক শূন্যতা বিরাজ করছে অথবা এ সমাজ কিছু একটা হারাচ্ছে এবং সবকিছুরই একটা আমূল পরিবর্তন দরকার, এ সব চিন্তা-চেতনার ফল এতদিনে দৃশ্যমান হল। অধিকার আদায়ে অনেক অবস্থান বিক্ষোভ পরিচালিত হতো এবং মাঝে মাঝে সেই অরাজকতা এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করত যে এমনকি পুলিশের সাথেও সংঘর্ষ করতে হতো।

'Liberal Arts' বিভাগের প্রফেসরেরা কমিউনিজমের পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন এবং তারা তাদের ক্লাসে কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের মতবাদকে শিক্ষা দান করতেন। এসবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'কার্ল মার্ক্স'-এর কর্মকাণ্ডের উপর ব্যাপকভাবে সুগভীর অধ্যয়ন করেন।

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'এ সময়ে ম্যালকম এক্সের আত্মজীবনী অধ্যয়নের এক সুবর্ণ সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। তাঁর আত্মজীবনী আমাকে অনেকাংশেই সাহায্য করেছিল ইসলামের মতো কিছু একটা সম্পর্কে জানতে। তখনকার সময়ে আমাদের পরিচালিত আন্দোলন অথবা অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের জন্য মূলত এই আত্মজীবনী পড়া একটি আদর্শ ও আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ বলে গণ্য হতো। এ গ্রন্থ অধ্যয়নের পর আমি আমেরিকার সকল বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে সক্ষম হয়েছিলাম। সকল অরাজকতার দূরীকরণ দ্বারা সবার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নিজেকে সমাজ পরিবর্তনের এক প্রোগ্র্যাম হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। আর এ পরিবর্তন সাধনের কথা ছিল বড় ধরণের এক বিপ্লবের মাধ্যমেই এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুশীলন পরিবত্যাগ করে এ বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কারণ, খ্রিস্টান ধর্মের কোন শিক্ষাই আমার জীবনের জন্য প্রায়োগিক বলে মনে হয় নি। এ ধর্মকে শুধু মনে হয়েছিল কতিপয় লোক কর্তৃক সম্পন্ন তথ্যমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কিছু ধাঁধাময় অধ্রুব সত্য রূপে।'

---

[১] এক প্রকার মাদকদ্রব্য যা তৈরি করা হয় শন (গাঁজা) গাছের পাতা ও ফুল থেকে। এই পাতা ও ফুল শুকিয়ে কাগজে ভর্তি করে সিগারেটের ন্যায় খাওয়া হয়।

তিনি আরো বলেন, 'আমেরিকাতে নির্যাতনের ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন ছিলাম এবং আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ে অনেক কিছুই অধ্যয়ন করেছিলাম, বিশেষ করে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের (রেড ইন্ডিয়ান) সম্পর্কে যারা সংখ্যায় প্রায় আট কোটি ছিল যখন ইউরোপীয়রা আমেরিকায় আগমন করে; কিন্তু এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে হয়েছিল মাত্র বিশ লক্ষ। এ বিষয়টির পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ববরণের ঘটনাসমূহ এবং আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নিধনের কার্যক্রম আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছিল। ফলে পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী খুব বড় করে ধরা পড়ল আমার নিকটে। এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে গ্রহণ করা পদক্ষেপের শুরুতেই দেখতে পেলাম যে, কমিউনিজম হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার। কারণ, কমিউনিজমে রয়েছে সকলের জন্য সমানভাবে সম্পদ বিতরণের ব্যবস্থা, সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকার। তাই শীঘ্রই আমি বনে গেলাম একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট এবং নিজেকে মার্ক্স-লেনিনবাদ মতাদর্শের একজন বিশিষ্ট দাবীদার হিসেবেও ভাবতে থাকি।"

রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধানের অনুসন্ধানকল্পে তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বড় বড় নেতাদের মতো করে কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে ঝেঁপে পড়েন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে বেশ কিছু দিন আন্দোলন করার পর এটাও আমার জানার বাকী রইল না যে, কৃষ্ণাঙ্গদের এ আন্দোলনে যুক্ত থেকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হওয়ার নয়। কারণ এক কৃষ্ণাঙ্গ নেতা কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ যা তৎকালীন কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর জন্য অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত ছিল, তা ছিল মূলত শ্বেতাঙ্গ নারীদের ধর্ষণ সংক্রান্ত বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। লেখক কিভাবে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ নারী ধর্ষণ করেছিল তা এ বইটিতে সে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিল। আমেরিকায় বর্ণবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে এই বইটি লেখা হয়েছে তা লেখকের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আমি এই বইটি পড়ার পর দেখি এটি কেবল শ্বেতাঙ্গ নারী ধর্ষণের ঘটনার সিরিজ। আমার মনে হয় না যে আমি বইটি পুরোপুরি পড়েছিলাম। যা হোক, এ বইটিই ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য একটি আদর্শ পুস্তক। যা পড়ে কৃষ্ণাঙ্গরা পুলকিত হতো, গর্ব করত, জোরালোভাবে আন্দোলনের অনুপ্রেরণা লাভ করত।'

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর পড়াশোনা করে পুরো শিক্ষাক্রম শেষ না করেই তিনি বের হয়ে আসেন এবং সমাজতন্ত্র (Communism) প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগঠিত টরোন্টোর একটি দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সত্তর দশকের শুরুতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ কানাডায় আগমন করে। তিনি এবং তাঁর দলের কর্মীরা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সমাজের মর্যাদানুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষিত করে সমাজে বিদ্যমান নানা বৈষম্য দূরীকরণে আইন পরিবর্তনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর দল কর্তৃক বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে তিনি আফ্রিকার ইতিহাস ও সমাজতন্ত্র আন্দোলন শিক্ষা দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর গান-বাদ্যের যোগ্যতাকে সেন্টারের জন্য অনুদান সংগ্রহের কাজে লাগানো হতো। তাছাড়া চারুশিল্পে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা ব্যবহৃত হতো এ আন্দোলনের পিছনে। তিনি তাদের আন্দোলনের পত্রিকা এবং মিছিলের জন্য ব্যবহৃত পোস্টারে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতেন। এসবের পাশাপাশি সমাজকে সহায়তা করার মানসিকতার কারণে তিনি অপরাধী শিশুদের জন্য পরামর্শদাতা হিসেবে চাকরিও গ্রহণ করেন।

একই সময়ে এ সব তরুণ আদর্শবাদীরা ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। তৎকালীন সময়ের অতি প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শন ছিল এ রকম যে, উত্তর আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশে চীন ও রাশিয়ার তুলনায় ভিন্নরূপে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। কারণ এ সকল দেশে দুর্দমনীয় আন্দোলন পল্লীঅঞ্চল থেকে শুরু হয়ে কৃষকশ্রেণীকে সংগঠিত করেছিল। কিন্তু উত্তর আমেরিকাতে এ বিপ্লব শহরে সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হতে পারত।

একটা শহুরে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করতে প্রত্যেক কর্মীকে শহরের মধ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হতো। এ ধরণের যুদ্ধে গাড়িই ছিল অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র এবং এর বিভিন্ন প্রকার চালনা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক ছিল প্রতিটি কর্মীর জন্য। ফলে গাড়ির যন্ত্রাংশ ও মেরামত কৌশল আয়ত্ত করতে তিনি পুনরায় কারিগরি কলেজে ফিরে যান।

সন্তানের এ সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর পিতা-মাতা বরাবরই বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তার পিতার সঙ্গে বেশ কয়েকবার প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে বাকবিতণ্ডা হয়। তবে এ সময় তার মা অবশ্য শান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় বিলাল ফিলিপ্স তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে খুব বেশী দিন বসবাস করেন নি। বরং বাসস্থান ত্যাগ করে তিনি সমমনা যুবকদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা শুরু করেন।

কিছুদিন পরে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, তিনি যে-সব লোকদের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁর বিস্তর ব্যবধান রয়েছে; বিশেষকরে নৈতিক বিষয়াবলীতে। তারা সকলে নতুন একটি সমাজ বিনির্মাণে বদ্ধ পরিকর ছিল কিন্তু নিজেদেরকে পরিবর্তন করার মতো কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা তাদের ছিল না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করা শুরু করল। বিশেষ করে নতুন সমাজ বিনির্মাণে এর যোগ্যতার বিষয়টি।

তিনি বলেন, "সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের কোন নৈতিক ভিত্তি আছে বলে মনে হল না। লোকজন যদি মাদকদ্রব্য, সমকামিতা, কুকাজে শিশুদেরকে ব্যবহার অথবা যে কোন কর্মকে নৈতিকতা বলে ধরে নেয়, তাহলে এটা ঠিক আছে। গাঁজার বিক্রয় এখনো নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে নিউইয়র্কে এর ব্যবহার বৈধ, ইংল্যান্ডে সমকামিতায় লিপ্ত দু'জনে এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে- ইত্যাকার বিষয় আমাকে প্রায়ই প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলত।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'তখনকার সকল আন্দোলনের মূল সূচনাকারী ছিল কৃষ্ণাঙ্গরা। এ সব আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা সবাই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গরা যেহেতু তৎকালীন সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিগৃহীত সম্প্রদায় ছিল, তাই তাদের আন্দোলনের আওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ছিল। তবে কলেজ পড়ুয়া শ্বেতাঙ্গরা আন্দোলনরত কৃষ্ণাঙ্গদেরকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করত। ঘটনাক্রমে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলে এক প্লাটফর্মে জমায়েত হল। এ দিকে সমকামীরা জনসমক্ষে প্রকাশ্যে আগমন করে সমকামিতার অধিকার আদায় ও মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করার পর আরেকটি নারীমুক্তি আন্দোলনও একই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

তিনি আরও বলেন, "প্রায় এক বছর ধরে আমি আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করলাম কিন্তু কর্মীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ফিরে এলাম কানাডার টরেন্টোতে। এখানে এসে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেয়ার পাশাপাশি আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হলাম। সমাজকে পরিবর্তন করার দাবী করত

কমিউনিজম, কিন্তু এ পরিবর্তনের জন্য বাস্তবে তেমন কোন নীতিই এর মধ্যে বর্তমান ছিল না। উপরন্তু কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল বিধায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অবশেষে সর্বহারার নামে এটি বিশাল আকারের নির্যাতনমুখী আন্দোলনের সূচনা করেছিল। অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা-নেত্রীদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত দেখেছি, যদিও তারা জোর দিয়েই বলতেন যে, 'বিপ্লব সংঘটিত হবার পরে এ সব দুর্নীতিপরায়ণতা আমাদের মাঝ থেকে দূর হয়ে যাবে।' কিন্তু আমার নিকটে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, এ সব ব্যক্তি যদি ক্ষমতা লাভ করে তবে তারা কেবল দুর্নীতিরই প্রসার ঘটাবে। তাছাড়া, কয়েকজন নেতা-নেত্রী ছিল অবিরত ধূমপায়ী, অর্থাৎ তারা এত বেশী পরিমাণে সিগারেট খেত যে একটা সিগারেট শেষ হতে না হতেই অন্য আরেকটি সিগারেট খাওয়া শুরু করত। সিগারেট খাওয়ার এ ধারা বজায় থাকত সর্বক্ষণ।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, "একদিন একটি সিগারেটের প্যাকেট কেনার জন্য আমাদের অফিসের এক ব্যক্তির কাছে টাকা চাইলে সে আমাদের সংগৃহীত দানের টাকা থেকে দিল। আমি এ দানের অর্থ থেকে টাকা নিতে ইতস্তত করে তাকে বললাম যে, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তা খরচ করব? এ কথার উত্তরে সে বলল, 'আমরা আমাদের মৌলিক প্রয়োজনাদি এ অর্থ দ্বারাই পূরণ করব। অতএব তোমার এ নীতিকথার ইতি টান।' এ কথা শুনে আমি ভাবতে লাগলাম যে আন্দোলনসংশ্লিষ্ট সকলেই কিভাবে এত শীঘ্রই দুর্নীতির অমানিশা অন্ধকারে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মূলত তারা তাদের কথিত প্রতিরোধ কমিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সংগৃহীত অর্থের অনেকাংশ তাদের নিজেদের দল, বাসা ভাড়া, ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়, পার্টির আয়োজন করতে সেই অর্থ ব্যবহার করত। এমনকি মাদকদ্রব্যের জন্য খরচ বাবদও তারা সংগৃহীত অর্থ থেকে ব্যয় করত। তারা জোঁকের মতো মানুষের দানের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করত। আমি যদিও তাদের সংগে একত্রে আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম, তবুও এ ঘৃণ্যতর বিষয়টি আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। কারণ, আমরা সেই অর্থ সংগ্রহ করতাম মূলত পীড়িতদেরকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু হায়! তারা তো জঘন্যতম কাজে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আরো বেশী দুর্নীতিপরায়ণ হতে থাকল তারা। আন্দোলনরত কর্মীদের বেশিরভাগ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যান্যদের মতো আমিও তখন মাদকাসক্ত হয়েছিলাম। তাছাড়া আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের আন্দোলনের কর্মীদের মতো দুর্নীতিবাজ অন্য কেউই তৎকালীন সময়ে ছিল না।"

'ইসলাম' ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভঃ

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, '*ইসলাম* সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম 'Battle of Algeria' নামক একটি তথ্যমূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এ চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছিল আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুসলিম নারীদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখেছিলাম। তারা হিজাব পরা ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদের পোশাকের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখে চলাফেরা করত।'

তিনি আরো বলেন, "একই সময়ে *'ইসলামের জাতি'* (Nation of Islam) নামক আরেকটি দল কৃষ্ণাঙ্গদের স্বপক্ষে আন্দোলন করত। এ দলটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম *এলিজা মুহাম্মাদ*। তথাকথিত এ মুসলিম *'ইসলাম'* নামে নতুন একটি ধর্ম উদ্ভাবন করেছিল যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম থেকে

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ নিয়ে। সে শিক্ষা দিত যে, 'সকল কৃষ্ণাঙ্গ হল স্রষ্টা এবং সকল শ্বেতাঙ্গ হল শয়ত্বান। একটি বড় স্রষ্টা রয়েছে, যে তাঁকে শিক্ষাদান করতে আগমন করে এবং, সে হল স্রষ্টার প্রেরিত একজন নাবী।' *এলিজা মুহাম্মাদ*-এর অন্যতম অনুসারী *ম্যালকম এক্স* খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ম্যালকম ১৯৫২ সালের পরে কালো মুসলমানদের এ সংগঠনে যোগ দেন। দলের অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও নামের শেষে এক্স ব্যবহার করা শুরু করেন। Nation of Islam-এর বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা এবং সদস্য বাড়ানোয় অসামান্য অবদান রাখেন ম্যালকম এক্স। অচিরেই দলনেতা এলিজা মুহাম্মাদের পর নিজের জায়গা করে নেন ম্যালকম। পরে নেতৃত্ব ও অন্যান্য নীতিগত কারণে এলিজা মুহাম্মাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চির ধরে। তারপর ১৯৬৪ সালে এলিজা মুহাম্মাদের দল ত্যাগ করে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান লাভ করেন। তিনি (ম্যালকম এক্স) প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম মস্ক ইংক' এবং 'Organization of Afro-American Unitiy'। সে বছরই হজ্জ সম্পন্ন করেন তিনি। মক্কায় বিভিন্ন জাত ও গোত্রের মুসলমানকে একই কাতারে দেখে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, কেবল প্রকৃত ইসলামের পক্ষেই জাত-গোত্র বিভেদ দূর করা সম্ভব। এতদিন পর্যন্ত তাঁর নীতি ছিল, 'জন্মগতভাবেই শ্বেতাঙ্গরা বর্ণবাদী। তাই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা বা আপস নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্যা কৃষ্ণাঙ্গদেরই সমাধান করতে হবে।' মার্টিন লুথার কিংয়ের অহিংস আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন এক্স। কিন্তু হজ্জের পর তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। ম্যালকম ঘোষণা করেন, 'সব বর্ণের মানুষই আল্লাহ্‌র বান্দা।' এর পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটে অংশগ্রহণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাঁর এ আমূল পরিবর্তনের ছয় মাসের মধ্যেই ১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ম্যানহাটনের এক জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দানে দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রকৃত ইসলামের দিকে ধাবমান ম্যালকম এক্স। পরবর্তীতে তাঁর আত্মজীবনী সম্পর্কে যাঁরা পড়েছে তাঁরাই এক্সের নীতিকে আঁকড়ে ধরেছে।"

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমদের একটি উপাসনালয় পরিদর্শনে যাওয়ার পর তাদের সংগঠন ও নারীদের শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে এতই দাগ কাটে যে, আমার নিকটে আমাদের নিজেদের তথাকথিত আদর্শবাদকে বড়ই ভিত্তিহীন বলে মনে হল। ১৯৭৫ সালে এলিজা মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে প্রভূত মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করেন তার ছেলে ইমাম ওয়ারিছ দীন মুহাম্মাদ। আন্দোলনের ভেতর ক্রমশ যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে ইসলামী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে যা প্রকৃত ইসলামের নিকটবর্তী ছিল অনেকাংশেই। কিন্তু আমার অন্তর যে ধরণের পরিবেশ খুঁজে ফিরছিল, তেমন কোন আন্দোলন বা সংস্থার সন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমি পুনরায় কানাডায় ফিরে আসি।'

কিছু দিনের জন্য যোগসাধনা, নিরামিশভোগীর[1] মতো বিষয়গুলোসহ হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কিছু নীতিমালাকে এবং এ ধরণের কতিপয় তত্ত্বকে পরীক্ষা করলেন, কারণ এগুলোকে তাঁর নিকটে মানব অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

---

[1] যারা সাধারণত স্বাস্থের উন্নতি সাধনে ভালভাবে রান্না করা নিরামিষ জাতীয় খাদ্য খায় এবং প্রাণীজ খাদ্য থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে।

'ইসলাম' ধর্মের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হওয়া:

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'গেরিলা যুদ্ধ শিখতে চীনদেশে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর ইতোমধ্যে জানতে পারি যে, আমার যে বন্ধুটি তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অন্যতম এক বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত উগ্র নারী নেত্রী[১] *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছে। এদিকে উক্ত নারী নেত্রীর মার্ক্স-লেনিনবাদী বিশ্বাসের স্বপক্ষে অন্যতম প্রশংসাকারী ছিলাম আমি নিজেই। কারণ, তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বেশী উগ্র মাওবাদী কমিউনিস্ট বলে খ্যাত ছিল এই নারী নেত্রী। তাছাড়া, মাও সেতুং-এর লেখা বইগুলোও সে মুখস্ত করেছিল, যাতে যে কোন সময় সে মাও সেতুং-এর নিকটে যে কোন প্রয়োজনীয় কোর্স সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি সে ছিল তৎকালীন বিশ্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী সক্রিয় নেত্রী। ফলে, এ রকম এক ব্যক্তিত্বের *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করাকে আমি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলাম। কারণ, এ ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। তাই, *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করতে আমার প্রিয় সেই নেত্রীকে কী প্রভাবিত করেছিল তা জানতে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে কিছু বই অধ্যয়নের জন্য আমি সংকল্পবদ্ধ হই।'

তিনি বলেন, 'যথাসময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে, তা হল- কমিউনিস্ট সমর্থনপুষ্ট এক ছাত্র আন্দোলনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ১৯৭১ সালের বড়দিনে (২৫ ডিসেম্বর) সে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করে। তারপর সে আমাকে *'ইসলাম'* সম্পর্কে এমন বিষয়ে পড়াশুনা করতে বাধ্য করে যা কমিউনিজম, খ্রিস্টান ধর্ম, পুঁজিবাদ এবং অন্যান্য মতবাদের মধ্যকার বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তৃতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করে। এ ক্ষেত্রে 'Islam: The Misunderstood Religion' নামক গ্রন্থটি তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিকভাবে সঠিক পথের দিশা পেতে এ বইটি তাৎক্ষণাৎ দিক নির্দেশনা হিসেবে অনুপ্রাণিত

---

[১] ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে বিয়ে করেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বক্তা ড. 'আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক। [ড. আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার সময়কাল ১৯৭০ ঈসায়ী সন। তারপর সৌদি আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Da'wah and Islamic Sciences' থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'College of Da'wah and Islamic Sciences' থেকে ইজাযাত লাভ করেন। পরবর্তীতে কানাডার 'University of Toronto' থেকে 'পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস (দর্শন)' বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং আফ্রিকার বড় বিদ্বান, মুজাহিদ ও সামাজিক কর্মী শায়খ 'উছমান দান ফোদিও-এর প্রথমদিককার জীবন তথা পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস (দর্শন) বিষয়ে Doctorate ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি আমেরিকা, কানাডা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইমাম, শিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিন বছরের অধিক কাল ব্যাপী তিনি কানাডার প্রথম সারির পত্রিকা 'The Toronto Star'-এর 'ধর্ম ও জীবন' সংক্রান্ত পাতার কলামিস্ট ছিলেন। এছাড়া 'York University (University of Toronto)' এবং 'McGill University'-তে 'ইতিহাস', 'নারী শিক্ষা', 'ভূগোল' ও 'মধ্যপ্রাচের ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ের গেস্ট লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফিকার কেইপ টাউনের 'The True Dawn Institute' (Islamic Training & Development)-এর সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ টাউনে অবস্থিত 'The Muslim Judicial Council'-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও তিনি। তাছাড়া, কেউপ টাউনের 'Discover Islam Centre'-এর পরিচালক, দক্ষিণ আফিকার 'The Dawah Coordinating Forum'-এর আমীর এবং 'Islamic Social Services & Resources Association (ISSRA)-এর সভাপতি, ইমাম ও পরামর্শক হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। তিনি মাঝে মাঝে 'Peace TV'-তে বক্তৃতা করেন। মূলত বর্তমান পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ইসলামের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ উৎসমূল অভিমুখে ধাবিত হওয়া, ঠিক এ রকমই জ্ঞান নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন ড. 'আব্দুল্লাহ হাকিম কুইক।]

করেছিল।' 'Towards Understanding Islam' গ্রন্থটি যেহেতু আধুনিক বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে ইসলামী ধ্যান ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছে তাই এটিও তাঁকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "প্রথম বইটি খুবই বাস্তবসম্মত। কারণ এ বইটিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সাথে খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি সকল মতবাদ ও তন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। ফলে এ বইটি পড়ে আমার বুঝার আর বাকী রইল না যে, মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান যা কমিউনিজমের প্রস্তাবনা ও পুঁজিবাদের নীতিমালা অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট; এমনকি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার চেয়ে অনেক গুণ উঁচু মানের। যে কোন ব্যক্তিকে *'ইসলাম'* পরিবর্তন করতে সক্ষম এবং কুরআনের অন্যতম একটি আয়াতে বলা হয়েছে, *"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের নিকট দেয়া তাঁর অবদানকে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই (তাদের কর্মনীতির মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে।"* [সূরা আনফাল (৮): ৫৩ এবং সূরা রা'দ (১৩): ১১] কুরআনের এ আয়াতটি আমাকে বিশেষভাবে মোহাবিষ্ট করেছে।"

তিনি এ ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, পশ্চিমা সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে একমাত্র *'ইসলাম'* ধর্মই শ্রেষ্ঠ উপায়। ফলে তিনি *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ইংরেজিতে প্রাপ্ত *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে সকল তথ্যাবলী ঐকান্তিক উৎসুকের সাথে অধ্যয়ন করার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁকে ভাবিয়ে তোলে, তা হচ্ছে, পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তি সংশোধন ব্যতিরেকে সুবিন্যস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে গুড়িয়ে দিয়ে কখনোই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, 'যদি তিনি মুসলমান হতেন তাহলে এ সকল কর্মকাণ্ড তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন সম্পূর্ণভাবে। কোন কাজই তিনি অংশবিশেষ করে ফেলে রাখতেন না।'

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বিলাল ফিলিপ্স *'ইসলাম'* ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক হতে স্রষ্টা, জিন ও ফিরিশতা বিষয়ক ধারণাকে বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেন, 'স্রষ্টা সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আমার হৃদয়ে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ সামান্য ধারণাটুকু সমাজতন্ত্রীয় দর্শনের আঘাতে বিদূরিত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কারণ সমাজতন্ত্রীয় দর্শন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যাবস্থা ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাও আমাকে স্রষ্টার ধারণায় বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ:

একইসময়ে তিনি একটি ঘটনার সম্মুখীন হন যাকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলা যায়। তাঁর বর্ণনায়, 'আমি যে এলাকায় বসবাস করতাম সেখানে আমার একটি পৃথক ঘর ছিল। এ ঘরেই আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর সংগ্রহে অনেক বই-পুস্তক ছিল। তাই কেউ কেউ এ লাইব্রেরী থেকে বই ধার করত। আবার কেউ কেউ আমার ঘরে বসেই পড়াশুনা করত। কারণ আমার ঘরটিতে একটি বড় টেবিল ও কয়েকটি চেয়ারেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। একদিন আমি এ ঘরের বিছানায় শুয়েছিলাম এবং আমার কতিপয় বন্ধু আমার টেবিলে বসে পড়তেছিল। এ সময় আমি অর্ধঘুমন্ত

অবস্থায় তন্দ্রাবিষ্ট ছিলাম। তারপর আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার বাইসাইকেল চালিয়ে একটি গুদাম ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছি। যতই ভিতরে প্রবেশ করছি ততই যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দুশ্চিন্তা আমায় ঘিরে ধরল। আমার সাধ্যমতো আমি অনেক গহীনে প্রবেশ করলাম। চতুর্দিকে তাকিয়ে বের হবার কোন পথই দেখতে পেলাম না। আমি পুরোপুরি অন্ধকারে নিমজ্জিত। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকার ছাড়া। মুহূর্তের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ আমাকে অজানা এক ভয় আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলে। এ রকম ভয়ের অনুভূতি আমি পূর্বে কখনোই লাভ করি নি। সে অজ্ঞাত ভয় সম্পর্কে ভেবে দেখি তা হচ্ছে মৃত্যুর ভয়। আমার অনুভূতি ছিল এ রকম যে, আমি যদি এখান থেকে বের হতে না পারি তবে আমি আর কখনোই বের হতে পারব না। আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ মুহূর্তে আমি চিৎকার করা শুরু করলাম, 'দয়া করে আমায় সাহায্য কর! আমায় সাহায্য কর!' আমার কণ্ঠের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন শব্দই বের হল না! শব্দগুলো আমার কণ্ঠের মধ্যেই গলগল করল। আমার অন্তর এক করুণ আর্তনাদে চিৎকার করছিল যে, অনেকেই তো আমার ঘরে বসেছিল কিন্তু কেউই আমাকে শুনতে পেল না, সাহায্য করল না, আমাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে এল না!? আমি নিজেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়! আমাকে সাহায্য করার মতো কেউই নেই, এ বিষয়টি বুঝার আর বাকী রইল না। প্রাণে বাঁচার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম এবং মৃত্যুর নিকটে হার মানলাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলাম।'

এ স্বপ্নটি তাঁর মনে প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলে। আর এ ঘটনাটির মাধ্যমেই তাঁর অন্তরে স্রষ্টার ধারণা প্রবিষ্ট হয়। স্বপ্ন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউই ঐ কঠিন মুহূর্ত থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারত না। স্রষ্টাই আমাকে সম্পূর্ণ হতাশা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন এবং আমাকে মুক্ত করেছিলেন অত্যন্ত কষ্টদায়ক এক অবস্থা হতে।'

পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়েছিলেন যখন তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়েছিলেন, *"আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ গ্রহণ করেন মৃত্যুর সময়, আর যে মরে নি, তার নিদ্রাকালে।"* [সূরা যুমার (৩৯): ৪২] প্রকৃতপক্ষে উক্ত স্বপ্নটি বিলাল ফিফিপ্সের উপর খুব বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল বিশেষ করে স্রষ্টার ধারণা বিষয়ে। স্বপ্নের প্রভাবে বিলালের মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব বাস্তব। এরূপে প্রায় ছয় মাস ব্যাপী অনেক অধ্যয়ন, গবেষণা ও আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি তাঁর দোদুল্যমান সিদ্ধান্তকে স্থির করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণ করেন।

'ইসলাম' ধর্মগ্রহণ পরবর্তী সময়:

বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'পরবর্তীতে সলাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সময় সিজদা করা সম্পর্কিত আলোচনা অধ্যয়নকালে আমার বোধোদয় হল যে, আমার পিতামাতা যে ছেলেটির দত্তক গ্রহণ করেছে সে মুসলিম। এ কথা ভাবতেই আমার হৃদয় কষ্টে কেঁদে উঠল। অন্যদিকে অবশ্য আমার আনন্দের সীমাও ছিল না। কারণ আমার সে ভাইটি আমাদের সংগে অনেক বছর ধরে অবস্থান করতেছিল এবং সে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে জানত, নিয়মিতভাবে সলাত আদায় করত, সাওম পালন করত; কিন্তু সে আমাদেরকে কখনো কিছু বলে নি। সে তখনও

আমার পিতামাতার সংগে বাস করত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়তেছিল। তারপর আমি তার সংগে সাক্ষাত করে *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তাকে অবহিত করলে সে খুব খুশিই হল। আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'অনেক বছর যাবৎ আমাদের সাথে বাস করা সত্ত্বেও তুমি কেন আমাকে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানাও নি? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত করে বলল, '*ইসলাম* সম্পর্কে আমি তোমাকে কোন কিছু বললে তুমি যদি এতে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম হয়ে যাও, আর এর কারণে তোমাদের পরিবারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হোক তা আমি কখনোই চাই নি। তাছাড়া, তোমার পিতামাতা আমাকে এতদিন ধরে পালন করেছে, এর প্রতিদানস্বরূপ তারা আমার নিকট থেকে এমন কিছু অবশ্য আশাও করে না।' তারপর আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি জান যে এ বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করেছেন? শুধু তুমিই নও বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই এটি অবশ্যই করণীয় যে, একজন ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা অন্যকে জানাবে এবং কোনটি ভ্রান্ত, কোনটি সঠিক তা উপস্থাপন করবে। এরপর গ্রহণ করা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করবে।'

তারপর তিনি টরেন্টোতে ফিরে গিয়ে আরবী শেখা শুরু ক'রে খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত শিখতে সক্ষম হন। তখনও তিনি গান-বাদ্য চর্চা করতেন, কারণ কেউ তাঁকে অবহিত করেছিল না যে, ইসলামে গান-বাদ্য নিষিদ্ধ (হারাম)। তিনি বলেন, "Simon Frasier University-তে আমি আমার ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের সংঙ্গে বিভিন্ন কনসার্ট ও নাইটক্লাবে গিটার বাজাতাম যেখানে প্রায় সবাই ছিল মাদকের নেশায় মত্ত অর্থাৎ সকলে মদ পান করে মাতলামি করত আর আমি তাদের মাঝে সংগীত পরিবেশন করতাম। এ সময় মনে হতো যে, আমি এক ভিন্ন জগতে অবস্থান করছি। তাছাড়া, আমি মঞ্চেও সংগীত পরিবেশন করতাম। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে মদ-গান-বাদ্য-সংগীতের এ মজলিসের সঙ্গে জড়িত রাখা একেবারেই অসমীচীন মনে হল। তাই আমি এ চর্চাকে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলাম।"

তিনি আরো বলেন, "তখন আমার জীবন ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত এবং ইসলামের সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা কোন বড় ধরণের সমস্যা তৈরি করেছিল না আমার জন্য। তবে, কোন ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার পর শয়তান সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঐ ব্যক্তিকে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করা হতে বিরত রাখতে। বিশেষ কিছু উৎসব ব্যতিরেকে আমি ধুমপান ও মদ পান করতাম না। তবে এ ক্ষেত্রে আমার ভিতরে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ বলে উঠত, 'তুমি কি এখনও এ সকল আনন্দ-বিনোদন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নও? যদি প্রস্তুত থাক তবে প্রতিজ্ঞ হও যে, তুমি আর কখনোই এগুলো স্পর্শ করবে না।' ফলে আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম এবং আমার *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হলাম।"

'ইসলাম' ধর্ম গ্রহণের প্রায় দু'মাস পর এভাবে মদ-গান-বাদ্য করা বন্ধ করার পাশাপাশি তিনি নানা প্রকার ছবি অংকনের কর্মসমূহ পরিত্যাগ করলেন।

'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে বৃত্তি লাভ:

বিলাল ফিলিপ্স আরবী ভাষা এবং ফিক্হ (ইসলামী আইন) শেখা শুরু করলেন এক মিশরীয় ব্যক্তির নিকট যার পিতা ছিল ইসলামী বিদ্বান। তারপর *'ইসলাম'* ধর্ম সম্বন্ধে আরও বেশি পরিমাণে জানতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি এত তথ্য সংগ্রহ করলেন যে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সত্যতার ব্যাপারে তিনি সন্দিহান হয়ে

পড়লেন। কারণ তার সংগৃহীত তথ্যসমূহের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। এ ধরণের সকল সন্দেহ ও বিতর্ক দূরীভূত করতে এবং সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে *'ইসলাম'* শেখার করার পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত ও মূল উৎস থেকে *'ইসলাম'* শিখতে তিনি প্রাচ্যে গমনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবলেন যে, তিনি প্রাচ্য থেকেই নিজেকে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন, কারণ প্রাচ্য হচ্ছে ইসলামের মূল ও প্রকৃত উৎস। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি লাভের জন্য তিনি আবেদন করেন। তার আবেদন গৃহীত হয়। অবশেষে তিনি সৌদি 'আরবে গমন করেন।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাসের ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ে অনুন্নত ছিল। শিক্ষার্থীরা বসবাস করত সৈন্যালয়ে। প্রচণ্ড শীতকালে গরম পানি বা গ্রীষ্মের তীব্র গরমের সময়ে কোন ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিল না। বিলাল ফিলিপ্সকে দু'বার বিষাক্ত বিচ্ছু কামড়িয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে সকল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই তিনি রীতিমত পড়াশুনা চালিয়ে যান।

ইসলামের সকল দিকগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে তিনি প্রকৃত ও আসল স্থানকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশী গুণ বিস্তৃত। পাশ্চাত্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে জোর প্রদান করা হয় মূলত চিন্তাশক্তি, গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। অন্যদিকে প্রাচ্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুত্ব দেয়া হয় মূলত তথ্যাবলী স্মৃতিতে ধরে রাখা, *'ইসলাম'* ধর্মের প্রকৃত রূপকে অনুধাবন ও অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃতি প্রদানের ওপর।'

বিলাল ফিলিপ্স ছয় বছর ব্যাপী মদীনায় পড়াশুনা করেন। প্রথম দু'বছর ব্যয় করেন আরবী ভাষা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে। এছাড়াও তিনি আরবের ছাত্রদেরকে ইংরেজী ও কারাতে শিক্ষা দেন।

শেষ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নকালে 'Minarat-ul-Riyadh International School'-এ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান এবং ঐ বিজ্ঞাপনটি কেটে তিনি তার পিতামাতার নিকটে পাঠিয়ে দেন। সে সময় দক্ষিণ ইয়েমেনে শিক্ষাদান করে তার পিতামাতা সবেমাত্র কানাডায় ফিরে এসেছিল। তথাপি তাঁরা আবেদন করেন এবং সাথে সাথেই নিয়োগ পেয়ে যান।

'King Saud University'-তে ভর্তি এবং কর্মজীবনে প্রবেশ:

১৯৭৯ সালে B.A. পাস করার পর তিনি মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য রিয়াদে অবস্থিত King Saud University-এর College of Education-এ ভর্তি হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অধিকাংশ ক্লাস সান্ধ্যকালীন ছিল বিধায় 'Saudi Television Channel Two'-তে কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রস্তুত ও উপস্থাপনা করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'Why Islam'; এ অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। বিভিন্ন ধর্ম ও পরিবেশ থেকে আগত নও মুসলিমদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হতো *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের পিছনে সক্রিয় কারণগুলো সম্পর্কে। এছাড়াও তিনি 'Minarat-ul-Riyadh International School'-এর ইংরেজী বিভাগে 'Islamic Education' শিক্ষাদান শুরু করেন। এ স্কুলটিতে তিনি দশ বছরের অধিক সময়ব্যাপী ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।

আরবী বিভাগে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমকে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র অনুবাদই শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ সেখানে শিক্ষাদান করা হতো একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। বিলালের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিল পাশ্চাত্য থেকে আগত এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করত। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে

তাদেরকে কারণ ও অনুসন্ধানমূলক তথ্যাবলী পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। ফলে এ বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি পাঁচটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

ইংরেজিতে ইসলামী শিক্ষাক্রম তৈরির ক্ষেত্রে এটিই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ। এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ছিল, কারণ তখন অসংখ্য মুসলিম প্রবাসীর ছেলেমেয়েরাই শুধু ইংরেজি মাধ্যমে অধ্যয়নের উপযোগী ছিল।

কুরআন, ফিক্বহ, হাদীছ, তাফসীর ও তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মূল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মাঝেমাঝে তার ক্লাসের তিন চতুর্থাংশ সময় বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা তরুণদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উঠতি বয়সী তরুণেরা জানতে সক্ষম হয়েছিল অবাধ মেলামেশা, ধূমপান, মদপান, গান-বাদ্য ও নৃত্যকলা কেন তাদের বিপক্ষে অবস্থানরত পশ্চিমাদের জন্য অনুমোদিত; কিন্তু তাদের জন্য নয়। তারপর তিনি এ সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ, পরিসংখ্যান এবং যুক্তি ব্যবহার করতেন।

তিনি বলেন, 'আমার ছাত্রদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রায় ১৫% থেকে ২০% ছাত্র ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করছে। তারা ফিরে গেছে পাকিস্তান, ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকায় এবং নিজেদেরকে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম প্রচারে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করেছে। আমি যাদেরকে শিক্ষাদান করেছি তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা নিশ্চিতরূপে নাস্তিক ছিল। কিন্তু এ বিষয়টি তার নিকটে পরবর্তীতে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়রূপে পরিগণিত হয়, যখন এ সব ছেলেদেরকে অনবরত শিক্ষাদান করার পর তারা সক্রিয় মুসলিমে পরিণত হয়। ফলে শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়িত সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও পদ্ধতির যথার্থতা প্রমাণিত হয়।'

অংকনে তার যে দক্ষতা ছিল তা আবার নতুনরূপে অভ্যুদয় হল। তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফীর জগতে উৎকর্ষতা সাধন শুরু করলেন।

১৯৮৫ সালে ইসলামী আক্বীদায় (Islamic Philosophy) M.A. ডিগ্রী অর্জন করার পর উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালীন (মরুভূমির ঝড়) তিনি রিয়াদে অবস্থিত সৌদি বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের ধর্মীয় বিভাগে কাজ করা শুরু করেন। সেখানে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বাহরাইন ও সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকান সৈন্যের ঘাঁটিগুলোতে কয়েকবার বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। তিনি বলেন, 'ইসলামের প্রকৃত রূপকে আমেরিকায় এমন ভয়ংকরভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পাঁচ মাস পরে আমি এবং আরও পাঁচজন আমেরিকান দাঈ মিলিতভাবে একটি প্রকল্পে একযোগে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলাম। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে ছিল আমেরিকার সৈন্য ঘাঁটিগুলোতে অবস্থানরত মোট পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের নিকটে *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ নিরসনে চেষ্টা করা। আর এর ফলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিন হাজারের অধিক সৈন্য *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছিল।'

নও মুসলিম সৈন্যদেরকে দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকা সফর করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমেরিকার সৈন্যদের সকল ঘাঁটিতে সলাত আদায়ের সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে 'Muslim Members of the Military (MMM)' নামক এক সংস্থার সাহায্যে কয়েকটি সম্মেলন পরিচালনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ইমাম নিয়োগদানে মুসলিমদেরকে অনুরোধ করতে আমেরিকার প্রশাসন

নীতিগতভাবে বাধ্য হয় এবং তৎপরবর্তী বছর হতে আমেরিকার সৈন্যদের জন্য ইমাম নিয়োগ করা শুরু হয়।

তিনি বলেন, 'উপসাগরীয় যুদ্ধাকালীন সময়কার কিছু নও মুসলিম বসনিয়ায় গমন করে বসনীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং সার্বিয় কর্তৃক চালানো নৃশংসতার মোকাবেলায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে অংশ নিয়ে বসনীয়দেরকে সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করেছিল।'

কিন্তু তিনি যেহেতু উপসাগরীয় যুদ্ধকালে সৌদি আরবের অবস্থানের বিরোধীতা করে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তাই তিনি সৌদি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ফিলিপাইন ও আরব আমিরাতে গমন:

সৌদি 'আরব থেকে বিলাল ফিলিপ্স ফিলিপাইন সফরে বের হন। সেখানে মিনদানাও দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে তিনি মুসলিমদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তাঁর এ সব ভাষণের ফলস্বরূপ সেখানকার কোটাবাটে নগরীতে 'Sharif Kabunsuan Islamic University' নামে সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ সমৃদ্ধ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা অনুষদের এম. এড. শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন।

University of Wales-এর ইসলামী শিক্ষা অনুষদ থেকে তিনি ইসলামী ধর্মতত্ত্বে Ph.D. সম্পন্ন করেন ১৯৯৪ সালে। এরপর শায়খ সালিম আল-ক্বাসিমীর আহ্বানে ড. বিলাল ফিলিপ্স 'আরব আমিরাতে ফিরে আসেন। এখানে তিনি *'দার আল-বের'* নামক দুবাই কেন্দ্রীক এক দাতব্য সংস্থায় যোগদান করেন এবং কারামা নগরীতে 'Islamic Information Center' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁকে সাহায্য করেছেন উছমান বারী (আয়ারল্যান্ডের নও মুসলিম), আহমাদ (ফিলিপাইনের নও মুসলিম) এবং 'আব্দুল লতিফ (কেরালার অধিবাসী) সহ আরও অনেক দ্বীনী ভাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত। গত পাঁচ বছরে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, চিন, জার্মানী, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান থেকে আগত প্রায় ১৫০০ মানুষ এ ইসলামী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, 'প্রকৃত যুক্তিসম্মত ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির চাহিদার পাশাপাশি জীবনের নৈরাশ্য, হতাশা ও অসন্তোষ ছিল এত অধিক সংখ্যক লোকের *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণের পিছনে প্রধান কারণ। কেউ কেউ মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে আবার অনেকেই *'ইসলাম'* ধর্ম ও মুসলিমদের উৎকর্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কৌতুহলবশত *'ইসলাম'* ধর্ম গ্রহণ করেছিল।'

তাঁর পিতামাতাও মুসলিম হলেন:

নাইজেরিয়ার উত্তরাংশ, ইয়েমেন, সৌদি 'আরব ও মালয়েশিয়ার মুসলিম জনসাধারণের মাঝে অবস্থান করে তাদের জীবনাচরণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ড. বিলাল ফিলিপ্সের পিতা-মাতা দুজনই এবং তারা তিলে তিলে উপলব্ধি করছিল কিভাবে আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার নিকৃষ্ট অবনতি ঘটেছে যার ছোঁয়া থেকে তারাও নিরাপদ নয়, ফলে তারা উভয়েই *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণ করেন ১৯৯৪ সালে, এটি ঘটে ড. বিলাল ফিলিপ্স *'ইসলাম'* ধর্মগ্রহণের প্রায় ২২ বছর পরে। এ সময় তাঁদের বয়স ছিল সত্তর বছর। অন্যরকম এক আনন্দঘন মুহূর্তের সাক্ষাত লাভ করেন তিনি এ ঘটনার মাধ্যমে। তাঁর পিতামাতা তথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও যেন

'ইসলাম' ধর্মগ্রহণ করে এজন্য তিনি এই দীর্ঘ সময় কী করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এ দীর্ঘ সময় ব্যাপী আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীর নিকটে *'ইসলাম'* ধর্মের সৌন্দর্য ও শিক্ষাসমূহ তুলে ধরতে সর্বোত্তম কৌশলের সাহায্য নিয়েছি, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী হিসেবে আদর্শ স্বরূপ নিজেকে তাঁদের নিকটে উপস্থাপনের পাশাপাশি মহান আল্লাহ্‌র নিকটে প্রাণখুলে দু'আ করেছি তিনি যেন তাঁদের অন্তরকে সত্য বুঝা ও গ্রহণ করার উপযোগী করে দেন। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতামাতা ও কয়েকজন প্রতিবেশীকে ইসলামের জন্য ক্ববূল করেছেন। আলহ্বামদুল্লিাহ!'

১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধিঃ

১৯৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরের গ্রীষ্মকাল পুরোটাই তিনি আমেরিকা ও কানাডায় *'ইসলাম'* ধর্ম ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। উত্তর আমেরিকা (সেন্ট্রাল) ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম শিক্ষা দিতে তিনি ব্যাপকভাবে সফর করেন।

তার মতে, পাশ্চাত্যের মুসলিমরা তাদের নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে পারে যদি তারা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান সময়ে আমেরিকার অধিকাংশ মুসলিম জনগণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রঙীন স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলেছে, তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সাধারণ পাবলিক স্কুলে পাঠাচ্ছে যেখানে ইসলামে মূলনীতি সমূহ প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার। পাশ্চাত্যের স্কুল পদ্ধতিতে শিক্ষা অর্জনকারী মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুবই স্বল্প সংখ্যক সম্ভবত শতকরা দশ জনেরও কম ছাত্র-ছাত্রী *'ইসলাম'* ধর্ম চর্চা করে থাকে।

১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে ইসলামিক তথ্য কেন্দ্র যা বর্তমানে 'Discover Islam' নামে পরিচিত এবং শারজাহতে *'দার আল-ফাতাহ'* ইসলামিক প্রেসের বিদেশী সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন। ।

এক সময়ের খ্রিস্টান **ডেনিস ব্রেইডলি ফিলিপ্স** *'ইসলাম'* ধর্মকে জানতে ও বুঝতে তাঁর গভীর অধ্যয়নের ফলে সাধারণ মুসলিমের পাশাপাশি ইসলামের অনেক শিক্ষিত পণ্ডিতের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এমন একটি পরিবারে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান পরিবেশে একজন গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবে বেড়ে ওঠার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা আর বাস্তবে রূপায়িত হল না। বরং তিনি প্রথমে উগ্র কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) এবং অবশেষে পরিণত হল ইসলামের জন্য নিবেদিত এক প্রাণ যাঁকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামী বিশ্বে পশ্চিমা হতে আগত হিসেবে গণ্য করলে ড. বিলাল ফিলিপ্স একজন প্রথম সারির ইসলামী পণ্ডিত বলে সমগ্র প্রকৃত মুসলিম বিশ্বে পরিচিত।

ছোট্ট বালক ডেনিস কি বুঝতে পেরেছিল যে, অর্ধ শতাব্দি পরে সে হবে ইসলামের মূল কেন্দ্রভূমিতে শিক্ষালাভকারী একজন মুসলিম পণ্ডিত, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। আর এ মধ্যপ্রাচ্যেই তার জীবনের দীর্ঘ ভ্রমণের বিরতি ঘটেছে এবং আল্লাহ্ তা'আল স্থিরতা আনয়ন করেছেন বিলাল ফিফিপ্সের নিরুদ্বিগ্ন জীবনে, *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় অজ্ঞতা দূরীকরণে এখানেই পরিচালনা করছেন একটি প্রকাশনা বিভাগ যেখান থেকে একের পর এক প্রকাশ হচ্ছে মূল ইসলামের উপর বিভিন্ন সাহিত্য। অথবা তিনি কি জানতেন যে, তিনি নিজেই তার নামকে পরিবর্তন করে ফেলবেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "'Dennis' নামটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ

'Dionysius' থেকে, 'Dionysius' হচ্ছে মদ ও সংগীতের গ্রীক দেবতা। এ নামটি অবশ্যই আমার জন্য যথোপযুক্ত নয়। তাই আমি আমার পিতার নাম 'Bradly' পরিবর্তন করে 'Bilal' রেখেছি।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবক্ষয়, পুরো আমেরিকা জুড়ে বর্ণবাদের ঘনঘটা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ-বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাসপূর্ণ এক বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে হয়েছিল তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। কোন মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেই পরিবেশের প্রভাব যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁর উপর বর্তায়। কারণ ব্যক্তি-মন শুধু সচেতন নয়, ব্যক্তি-মন আত্মসচেতন। ব্যক্তি তার পরিবেশের উপর ক্রিয়া করে। পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিছক শূন্যতার মধ্যে ব্যক্তি বেড়ে ওঠে না। তাঁর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কৈশোর থেকেই এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্র এককথায় তথাকথিত সামাজিক প্রভাবই তাঁকে জীবনমুখী ও প্রতিবাদী হতে সহায়তা করেছে। বৈরী ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশ ও বিরূপ ঘটনাধারা তাঁকে ক্রমশই করে তুলেছিল সত্যানুসন্ধানী। একইভাবে দৃষ্টমান সমাজের অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধিতাই বাধ্য করেছে সকল প্রকার দর্শনকে যৌক্তিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে। বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাওহীদ আশ্রিত জীবন মহিমা তাঁর আত্মা ও সত্তাকে ইসলামী ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত করেছে।

পঞ্চাশ বছর ব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তিনি এখনো কোন কিছুর সাথে বিনিময় করতে ইচ্ছুক নন, কারণ এ অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয়েছে জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছ প্রশিক্ষণ যা চিন্তা জগতের জন্য এক অনন্য খোরাক রূপে রয়ে গেছে। দ্বিধান্বিত হয়ে বেড়ে ওঠার কালে এবং যৌবনাবস্থায় তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন বর্ণবাদ, নানারকম বিরোধ ও সামাজিক বৈষম্য যা তাঁর নিকটে অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। আর এ বিষয়টি প্রায় সকল ছাত্র আন্দোলনগুলোকেও যুক্ত করেছে এবং জনগণের অধিকার নিয়ে ছলনাকারী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দিকে ধাবিত করেছে।

২০০১ সালে তিনি 'Online Islamic University' নামে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করেছেন যার মাধ্যমে 'ইসলামি শিক্ষা' বিষয়ে 4-Year ডিগ্রী সহ অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স সম্পন্ন করা যায়। তিনি দুবাইতে অবস্থিত 'American University' এবং 'Ajman University' -এর *'আরবী ও ইসলাম শিক্ষা'* বিভাগেও অধ্যাপনা করেছেন।

'সুন্নীদের দৃষ্টিতে শি'আ সম্প্রদায়'- এ বিষয়ে তেমন কোন বই ইংরেজি ভাষায় নেই বিধায় তিনটি আরবী বইকে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। *'ইসলাম'* ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তার পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের পিপাসা নিরসনে তেমন কোন সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় বিদ্যমান ছিল না বিধায় তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে অন্য এক বিদ্বানের সহযোগী হয়ে 'Polygamy in Islam' নামে সর্বপ্রথম একটি বই লেখেন। কারণ তাঁর মতে, এটি এমন একটি বিষয় যাকে কেন্দ্র করে অমুসলিমরা প্রায়ই ইসলামের সমালোচনা করে থাকে। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অনেক আধুনিক মুসলিম ইসলামের এ বিধানকে অস্বীকার করে থাকে। এমনকি কতিপয় মুসলিম দেশে এ নীতির বিরুদ্ধে আইনও প্রনয়ণ করা রয়েছে। এ বইটিতে ঐতিহাসিক ও জীব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি যুক্তির আলোকে একাধিক বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেখকের প্রচণ্ড আগ্রহ ও

গবেষণার ফলস্বরূপ 'Fundamentals of Tawheed' নামক বইটি তার দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে তিনি আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ধারণাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

এছাড়াও তিনি সূরা হুজুরাতের তাফসীরও লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'The Evolution of Fiqh' (ফিক্বহের উৎস) নামক বইটি অন্যতম একটি প্রকাশনা। এ বইটিতে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন ইসলামে কিভাবে বিভিন্ন দল, মত ও পথের উদ্ভব ঘটল, এ সব দল, মত ও পথসমূহের মাঝে মতবিরোধের কারণ এবং কিভাবে এদের মধ্যে মতানৈক্যের অবসন ঘটিয়ে মূল একটি মাত্র জামা'আতে পরিণত হওয়া সম্ভব। তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই *'উসূল আত-তাফসীর'*।

ড. বিলাল ফিলিপ্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ[১] অন্যান্য শতাধিক প্রকৃত ইসলামী ওয়েবসাইট অথবা গুগলে সার্চ করলে গত ২১ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর প্রদত্ত শতশত বক্তব্যের সন্ধান মেলে। অধিকাংশ ইংরেজী ভাষাভাষী মুসলিমদের নিকটে এবং সারাবিশ্বের অসংখ্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তাঁর লেখা ৫৬ টি শিশুসাহিত্য এবং ৫০ টিরও বেশি অন্যান্য বই সুপরিচিত। মূলত ইংরেজি ভাষায় সর্বাধিক বইয়ের একক লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক তিনি।

প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ তিনি কাতারের দোহা নগরীতে অবস্থান করছেন। Ajman-এ অবস্থিত 'Preston University'-এর 'Islamic Studies' বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত। এছাড়া 'Sharjah TV channel Two & Satellite', 'Ajman TV Channel Four' এবং 'Saudi TV Channel Two'-এর ইসলামিক অনুষ্ঠানের প্রযোজক ও উপস্থাপক।

তিনি প্রায়ই বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ার মুম্বাইয়ে অবস্থিত IRF-এ উপস্থিত হন এবং 'Peace TV'-তে প্রদর্শিত অনুষ্ঠানে লেকচার প্রদান করেন। তাঁর আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কুরআন। কারণ তাঁর মতে ঈমানের অগ্নিতে মুসলিমদের অন্তর একাধারে জ্বালাতে কুরআনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি পূর্বশর্ত। মুসলিমদের ঈমানকে প্রভাবিত করে উজ্জীবিত করতে কুরআনের বাণীর প্রতি নিবিষ্ট মনে কর্ণপাত করার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেন। তাছাড়া, তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক বিষয়াদি, রাসূল ﷺ-এর হাদীছ সংগ্রহ ও বিন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (যেহেতু হাদীছই রাসূল ﷺ-এর জীবনপদ্ধতির একমাত্র প্রতিফলন) এবং ইসলামী আইনের (ফিক্বহ) ঐতিহাসিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিকে আলোকিত করার মাধ্যমে ইসলামের মূল স্রোত অভিমুখে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে আহ্বান জানান।

অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণে বাধা:

২০০৭ সালের এপ্রিলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম একযোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যে, "অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে বক্তব্য দিতে যাওয়ার জন্য বিলাল ফিলিপ্স ভিসা পেতে ব্যর্থ হন।" রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, 'অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস কর্তৃক ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন মূলত 'আন্দোলন সংক্রান্ত তালিকা' নামক এক তালিকার উপর ভিত্তি করে। কারণ এ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মূখ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

---

[১] www.bilalphilips.com

তাছাড়া প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় বিলাল ফিলিপ্সকে আমেরিকা সরকার 'গোপন চক্রান্তকারী' হিসেবে গণ্য করেছিল। আর এরই সূত্র ধরে তাঁকে ২০০৪ সালে আমেরিকা থেকে বহিস্কার করা হয়।"

সেই একই সময়ে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে ড. ফিলিপ্স অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষকে এ বলে অভিযুক্ত করেন যে, 'তিনি এর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় একাধিকবার বক্তব্য দিয়েছেন যা রেকর্ড করা হয়েছে। এ সব বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমাকে সবাই মধ্যপন্থী মুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছে। তাছাড়া আমার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ে অস্ট্রেলীয়দেরকে খুবই সহনশীল রূপে পেয়েছি এবং এ সময় আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আয়োজিত প্রোগ্রামসহ অন্যান্য উন্মুক্ত ময়দানে বক্তব্য দিয়েছি। অতএব, এ নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে আমার স্ত্রীর দিক বিবেচনায় আমার জন্য হতাশাজনক ঘটনা, কারণ সে হচ্ছে আইরিশ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। অধিকন্তু গত বছরের পুরো জুলাই মাসজুড়ে আমি নিউজিল্যান্ড ও সিডনীতে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছি, যে সব বক্তব্যের সবগুলোই রেকর্ড করা হয়েছে। অতএব, আমার ব্যাপারে নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় চালানো অনুসন্ধানকেও যদি অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসন খতিয়ে দেখত, এই অনুসন্ধানে সন্ত্রাসবাদের সাথে আমার কোনই সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। উপরন্তু, আমার সম্পর্কে আমেরিকার সন্দেহকে ভিত্তি করে কানাডা ও যুক্তরাজ্যে প্রদত্ত নিয়মিত বক্তব্যের উপর এই দেশ দু'টির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের তদন্তকারী কর্মকতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তাহলে তারা অবশ্যই এমন কোন প্রমাণ পেত না যা দ্বারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আমার বিন্দু পরিমাণ সংশ্লিষ্টতার সন্ধান মেলে। মূলত এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে, 'আমেরিকার মিথ্যা অভিযোগ এবং কল্পিত ও অসার বিবৃতিকে অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ অন্ধ অনুসরণ করছে। কারণ, আমি সর্বদা জোরালোভাবে উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করি যারা ধর্মের নামে বেসামরিক সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ চালায়।' এ সাক্ষাতকারে তিনি আরও বলেন, 'তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকায় প্রবেশ করেন নি। ফলে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে তাকে আমেরিকা থেকে ২০০৪ সালে বহিস্কার করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও অসার বলেই প্রতীয়মান।' এছাড়াও ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার ব্যাপারে তাঁকে "গোপন চক্রান্তকারী" হিসেবে উল্লেখ করার ব্যাপারে ড. ফিলিপ্স বলেন যে, এটি আসলে একটি কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত এটি ছিল ১০০ বিশিষ্ট মুসলিমের উপর অনুমানকৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এক রিপোর্ট। আর এ মুসলিমদেরকে কখনোই অভিযুক্ত করা হয় নি। যদিও এ গোপন ব্যক্তিদেরকে কখনোই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।'

তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমা মুসলিমদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে অভিযুক্ত করা আমেরিকার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কারণ, কানাডার নাগরিক *মাহির আরার*-এর বিষয়টিকে এখানে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মাহির আরারকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার পর কারারুদ্ধ করে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি কানাডিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের 'গোপন চক্রান্তকারী'-এর তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে তাঁকে কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে রাজি হওয়ার পরেও আমেরিকার কর্তৃপক্ষ এখনো তাঁর নাম সেই তথাকথিত তালিকা থেকে বাদ দেয় নি।'

তাঁর আক্বীদা সম্পর্কিত মিথ্যা সন্দেহের অপনোদনঃ

ড. বিলাল ফিলিপ্সের আক্বীদা ও গ্রন্থের ব্যাপারে কতিপয় সালাফীর সন্দেহ রয়েছে, যার উৎপত্তি মূলত 'The Fundamentals of Tawheed' এবং 'Tafseer Sura Al-Hujurat'- এই দু'টি বইয়ে উল্লেখিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদা[1] থেকে । এই ভ্রান্ত আক্বীদার কারণেই মূলত বই দু'টি ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এই মারাত্মক ভুল সম্পর্কে কোন সহৃদয় ব্যক্তিই তাঁকে অবহিত করেন নি। বরং তাঁরা শুধু সমালোচনায় ব্যস্ত ছিল এবং অন্যান্যদেরকে এ সব বই না পড়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। তবে পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী এ ভুল সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন, যা বইগুলোর সাম্প্রতিক সংস্করণে সংশোধিত হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলোর জন্য বিস্তারিত পাদটীকায় অন্যায়ের প্রতিবাদ ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে কুরআন, সহীহ হাদীছ ও পূর্ববর্তী সত্যপন্থীদের অনুসৃত পদ্ধতি এবং কাফির আখ্যাদানের বিধান ইত্যাদি বিষয়সমূহ লেখক কর্তৃক খুবই গুরুত্বসহকারে সংযোজিত হয়েছে। যা হোক, এ ভ্রান্ত আক্বীদাটি তাঁর বইগুলো থেকে সংশোধিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি এ ধরণের ভ্রান্ত ও খারিজী আক্বীদা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে পরিত্যাগ করে বলেছেন, 'সঠিক দলীল-প্রমাণ সহকারে যদি কেউ আমাকে আমার ভুল বা ভ্রান্তিতা দেখিয়ে দেয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে আমার কোনই সমস্যা নেই।'

এমনকি বিলাল ফিলিপ্স সৌদি আরব ত্যাগের পর ২০০০ সালে যখন প্রথমবারের মতো উমরাহ করার সুযোগ লাভ করেন, তখন তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাদেরকে তাঁর আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে ছড়ানো সন্দেহ ও গুজব সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে তা বলতে বলেন, কিন্তু কেউই তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারে নি। বরং ঈশার সলাতের পর হতে ফজরের সলাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁর আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে রটানো নানারকম সন্দেহ ও গুজবের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি সালাফী বিদ্বানদের সঙ্গে শুধু সম্পর্কই রাখেন না, বরং নিজেকে সালাফী বলে প্রকাশ করেন। যেমন, শাইখ সালীম আল-হিলালীর *'লিমাছা ইখতারনা আল-মানহাজ আস-সালাফী'* (কেন আমরা সালাফী নীতি-পদ্ধতিকে বেছে নিলাম) শীর্ষক বক্তব্যকে অনুসরণ করে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। দুবাইতে বিলাল ফিলিপ্স কর্তৃক পরিচালিত 'Aqeedah Intensive Course' নামক একটি কোর্সের মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে *'কেন আমরা সালাফী নীতি ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করি'*। বিভিন্ন সময়ে তিনি শাইখ আব্দুল মালিক রামাদানী আল-জাযাইরী লিখিত গ্রন্থ *'সিত্ত দার ফী উসূল আহলিল আছার'*-এর প্রথম তিন অধ্যায় শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত শাইখ আলী হাছান, শাইখ সালীম এবং শাইখ খালিদ আল-আম্বিরী, শাইখ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ কর্তৃক প্রদানকৃত অনেক দ্বীনী বৈঠকে তিনি উপস্থিত থেকে এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাছাড়া

---

[1] তিনি এ বই দু'টিতে যা বর্ণনা করেছিলেন সে বিষয়গুলো মানুষকে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমনঃ 'তাওহীদের মূল নীতিমালা' নামক এ বইয়ের তাওহীদ অধ্যায়ের শেষে বলেছিলেন, 'যে শাসক আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করে না, তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে হবে।' এবং *'সূরা আল-হুজুরাতের তাফসীর'* নামক বইতে লিখেছিলেন, 'যে শাসক আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করে না, তার বিরুদ্ধে গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হবে।'

শাইখ আলবানীর ছাত্র শাইখ মাহমূদ আতিয়াহ যখন আরব আমিরাতে বসবাস করতেন, তখন বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য বিলাল ফিলিপ্স প্রায়ই তাঁকে বৈঠকে দাওয়াত করতেন। আবূ আবদিল্লাহ আল-মাওসিলী নামক শাইখ আলবানীর আরেক ছাত্র যখন আরব আমিরাতে আগমন করেন, তখন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে মূলত তাঁর উপরই বিলাল ফিলিপ্স নির্ভর করতেন। তাছাড়া, ১৯৯৪ সালে আরব আমিরাতে আগমনের পর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন শাইখ আব্দুল্লাহ সাব্‌ত-এর সঙ্গে। আবূ উসামাহ, ফরীদ আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ জিবালী, ইয়াহইয়া ইবরাহীম এবং আব্দুর রহীম গ্রীন-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিলাল ফিলিপ্স সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তিনি কানাডার টরেন্টোতে অবস্থিত *'মাসজিদ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ'*-এ বেশিরভাগ সময় বক্তৃতা প্রদান করতে কানাডায় গমন করেন। এটিই হল কানাডার সবচেয়ে সক্রিয় এবং জ্ঞানপূর্ণ সালাফী কেন্দ্র। এ মসজিদের পরিচালনা বিভাগের সকলেই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীধারী এবং এর সভাপতি হল শাইখ বাসীর আস-সোমালী, যাঁর নীতি ও পদ্ধতি এবং হাদীছের জ্ঞানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা শাইখ আলবানীর ছাত্রসহ অন্যান্যরা কর্তৃক প্রমাণিত। উপরন্তু, তাঁর সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয় যে, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর যাবৎ অধ্যয়নকালে তিনি প্রায়ই শাইখ আলবানী, শাইখ বিন বায, শাইখ আব্দুল মুহ্‌সিন আল আব্বাদ, শাইখ গুনাইমান, শাইখ উছামা আল-কূসী (মুক্ববিল), শাইখ উমার আল ফুলাতা এবং অন্যান্য শাইখের বিভিন্ন দ্বীনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করে জ্ঞানের সুধা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাইখ মুক্ববিল-এর বাসস্থানে গমন করে তাঁর নিকটে তাখরীজ (হাদীছের বিশুদ্ধতা) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। পাশাপাশি তিনি শায়খ আলবানীর ৭০০-এরও অধিক বক্তব্যের টেপ শ্রবণ করে দ্বীন সম্বন্ধে তাঁর (মানহাজ) নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হয়েছেন এবং তা অনুসরণ করে চলেছেন।

অত্যুজ্জ্বল জীবনদৃষ্টি:

ড. বিলাল ফিলিপ্স বলেন, 'মুসলিমরা যদি প্রকৃত মুসলিমের মতো বসবাস করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের জন্য আবশ্যক হল হিজরাত করা।' এ বিষয়টির ওপর জোর প্রদান করতে তিনি কুরআন থেকে উদ্ধৃত্তি দেন।

তাঁর মতে, 'প্রতিটি মুসলিমের উচিত নয় এমন কোন স্থানকে বসবাসের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া যেখানে সে কেবল বড় ধরণের কোন কর্মের সন্ধান পেতে পারে; বরং প্রত্যেকের উচিত এমন স্থানকেই প্রাধান্য দেয়া যেখানে সে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে *'ইসলাম'* ধর্ম চর্চা করতে পারে এবং পাশাপাশি হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য উৎকৃষ্ঠ পন্থা খুঁজে পায়।'

তিনি সর্বদা অনুভব করেন যে ইসলামের জন্য প্রচুর কাজ করার আছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে সময় খুবই সংকীর্ণ ও ইসলামের জন্য অনেক বেশি কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে; তখন আপনি আর ছুটির দিন অলসতায় বা অবসরে কাটানোর অবকাশ পাবেন না বা ছুটি নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা মাথায় আনার কোন সুযোগ পাবেন না।'

পূর্বের মতো এখনও তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত *'ইসলাম'* ধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণের নিমিত্তে এ সমাজকে পরিবর্তন করা। কিন্তু তাঁর মতে, 'এ পরিবর্তন সাধনের বিপ্লব সংঘটিত হবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়, বরং প্রতিটি মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে সংশোধন করে নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার ও চর্চা করার মাধ্যমে।' এ মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তিনি সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

তাঁর মতে, 'মুসলিম হতে হলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে আবৃত রাখা চলবে না, প্রকৃত সত্য, জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে হতে হবে সদা দীপ্যমান। হতে হবে মানবমুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রখর ও স্বচ্ছ চেতনাবোধের অধিকারী।'

মুসলমানের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করাই হল তাঁর লক্ষ্য। সৃষ্টিশীলতার ও মননে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ ও স্বাজাত্য-চেতনার ফলশ্রুতিতে তিনি এক গৌরবময় জীবনদৃষ্টি লাভ করার কথাই প্রচার করেন। ইংরেজী ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র সাহিত্যের জগতে তিনি ভিন্নতরভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন নতুন চেতনার।

একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি তিনি সর্বদা গুরুত্বারোপ করে থাকেন তা হল, 'মুসলিম জাতির হারানো সম্মান ও গৌরব আবারও ফিরে পেতে এবং শির্ক, বিদ'আত ও যুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ শারি'আহ অনুযায়ী সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে শাসন করতে যে নীতি ও পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাভে দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে তা হল, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সকল প্রকার শির্ক, বিদ'আত, হিযবিয়্যাহ (দলাদলি), অন্ধ-অনুসরণ, য'ঈফ ও জাল হাদীছের উপর 'আমল ইত্যাকার বিষয়াদির মতো শয়তানী মায়াজাল ছিন্ন করে দ্বীনকে সে নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বুঝতে ও চর্চা করতে হবে যে প্রকৃত রূপে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল, যেভাবে সাহাবীরা এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তী দুই প্রজন্মের সৎপথপ্রাপ্ত বিদ্বানেরা (অর্থাৎ তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈরা) অনুধাবন করেছিল। প্রতিটি বিষয় যেমন, আক্বীদা, নীতি-পদ্ধতি, ফিক্‌হ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আচার-আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল, নিজেদেরকে, নিজেদের পরিবারকে এবং অন্যান্য সবাইকে এই বিশুদ্ধ নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতেই সুশিক্ষিত করে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।'

তাঁর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে দু'আ:

একমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার নিকটে আকুতি জানিয়ে সকাতরে দু'আ করছি, তিনি যেন মধ্যপন্থী ইসলামী বিদ্বান, বক্তা, প্রফেসর, টেলিভিশন উপস্থাপক ও বিশিষ্ট লেখক ড. বিলাল ফিলিপ্স-কে প্রকৃত ও নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আরও অবদান রাখার সামর্থ এবং হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আমীন!

ড. বিলাল ফিলিপ্স লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের তালিকা[১]:

১. লিখিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ:

1.	A Commentary on Ibn Qudaamahs Radiance of Faith	21.	The Ansar Cult in America
2.	A Simple Call To One God	22.	The Best In Islaam
3.	Arabic Grammar Made Easy Book 1 &2	23.	The Book of Monotheism
4.	Arabic Reading and Writing Made Easy	24.	The Eemaan Reading Series (1-56)
5.	Dajjaal: The Anti-Christ	25.	The Evolution of Fiqh
6.	Did God Become Man?	26.	The Exorcist Tradition in Islam
7.	Dream Interpretation	27.	The Foundation of Islamic Culture
8.	Funeral Rites In Islam	28.	The Fundamentals of Tawheed
9.	Hajj and 'Umrah	29.	The Purpose of Creation
10.	In the Shade of the Throne	30.	The Quran's Numerical Miracle: Hoax and Heresy
11.	Islamic Rules On Menstruation and Post-Natal Bleeding	31.	The True Message of Jesus Christ
12.	Islamic Studies Book 1, 2, 3, 4	32.	The True Religion of God
13.	Muslim Exorcists	33.	Usool at-Tafseer
14.	Polygamy in Islam (Co-authored)	34.	Usool al-Fiqh: The Methodology of Islamic Law
15.	Possession and Exorcism	35.	Tafseer Soorah Al-Mulk

[1] তাঁর লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত অনেক বই বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাস বিভাগের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। তবে, সকলের অবগতির জন্য আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে, তাঁর অধিকাংশ বই একদিকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অবৈধভাবে কপি করা হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে Pirated/Counterfeit copy (চোরাগোপ্তাভাবে প্রকাশিত/নকল কপি) দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর বইগুলোকে অনেকেই অনুমতিবিহীন ভাষান্তর করছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ সমস্যাগুলো বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। অতএব, ড. বিলাল ফিলিপ্সের লেখা সকল বই এবং তাঁর বক্তৃতার ACD/VCD-সমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটু সচেতন হওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। বিলাল ফিলিপ্সের অনুমতিপ্রাপ্ত যে সব প্রকাশনা সংস্থা বৈধ বই বা বক্তৃতার ACD/VCD বিক্রি করে সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :
'Halaco Bookstore' (www.halaco.com),
'Islamic Bookstore' (www.islamicbookstore.com),
'Al-Hidaayah Publishing' (www.al-hidaaya.co.uk)।
উল্লেখ্য, ড. বিলাল ফিলিপ্সের সকল গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়ে **'তাওহীদ পাবলিকেশন্স'** থেকে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। - *অনুবাদক*

16.	Salvation Through Repentance	36.	Sheikh Bin Baaz's Gift to the Brethren
17.	Satan in the Quran	37.	Condensed Saheeh Muslim [1 Volume]
18.	Seven Habits of Truly Successful People	38.	Contemporary Issues
19.	Spirit World on Islaam	39.	The Moral Foundations of Islamic Civilization
20.	Tafseer Soorah al-Hujuraat	40.	Conversational Arabic Level 1, 2

২. সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ:

1. 'A Simple Call To One God', by Dr. Asra Rashed.
2. 'Riyaa : Hidden Shirk', by Abu Ammaar Yasir Al-Qathi.
3. 'Studies In Islam', (GCE 'O' Levels) by Mumtaz Motiwala.
4. 'The Quran and Modern Science', by Dr. Maurice Bucaille.

৩. সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ:

1. Arabic Calligraphy in Manuscripts
2. General Issues of Faith
3. Ibn al-Jawzee's, The Devil's Deception
4. Ibn Taymiyyah's Essay on the Jinn
5. Khomeini: A Moderate or Fanatic Shiite
6. Salafee 'Aqeedah
7. The Mirage in Iran

৪. বিলাল ফিলিপ্সের বক্তৃতার কিছু উল্লেখযোগ্য অডিও/ভিডিও[১]:

AUDIO/VIDEO			
1.	20 Century Jaheeliya	36.	Music in Islam
2.	7 Habits of Truly Successful People	37.	Muslim
3.	99 Names of Allah	38.	Muslim's Character
4.	A Muslim Student	39.	Muslims in a Non-Muslim Society
5.	Abandoning the Innovator	40.	My Way to Islaam
6.	Aqeedah- Qadaa & Qadar	41.	Oneness of God
7.	Avoiding the Unlawful	42.	Opposing Satan's Temptations
8.	Compilation of the Sunnah	43.	Paradise & Hell
9.	Contemporary Issues	44.	Patience & Perseverance
10.	Contemporary Issues	45.	Pearls of the Prophet
11.	Dajjal	46.	Position for a Muslim in Time of Fitnah
12.	Dawah-Legacy of the Prophet	47.	Principles of Tafseer
13.	Despatches Undercover	48.	Problems in the Hearts of Teens
14.	Deviation of Ummah Past & Present	49.	Purification of the Soul
15.	Did God Become Man	50.	Purpose of Creation

[১] তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর সংগ্রহে রয়েছে বিলাল ফিলিপ্সের প্রায় সকল বক্তৃতা, আলহামদুলিল্লাহ।

16.	Dos & Don'ts of Shariah	51.	Ramadaan: A Way of Life
17.	Duniya & Akhira	52.	Ramadan
18.	Duties of A Muslim Husband	53.	Reflections of Ramada
19.	Ebaadah	54.	Religion & Science
20.	Everyone is a Da'ee	55.	Ruboobiyah
21.	Evolution of Fiqh	56.	Save Your Family From Shaitaan
22.	Faatiha	57.	Search for Inner Peace- Toronto
23.	Faith	58.	Sins & Calamities
24.	Fasting is for Taqwa	59.	Spending for Allah
25.	Fiqh & Sunnah	60.	Spirit Possession
26.	Fiqh of Fasting	61.	Stop Splitting This Ummah
27.	Fiqh of Hajj	62.	Successful People
28.	Fiqh of Marriage	63.	Sunnah & Science of Hadeeth
29.	Forces of Evil	64.	Tafseer
30.	Foundation of Belief	65.	Tafseer Ayatul Kursee
31.	Foundation of Islamic Studies (1-21)	66.	Tafseer Soorah Aadiyaat
32.	Fundamentals of Islam	67.	Tafseer Soorah Al-Kahf
33.	Hajj (Pilgrimage)	68.	Tafseer Soorah Al-Layl
34.	Hajj (Thanksgiving)	69.	Tafseer Soorah Falaq & Naas
35.	Hijab- A Religious Symbol	70.	Tafseer Soorah Humazah
71.	Homosexuality	94.	Tafseer Soorah Ikhlaas
72.	Houses of Worship (Visiting a Masjid)	95.	Tafseer Soorah Inshirah
73.	How To Worship	96.	Tafseer Soorah Takaathur
74.	Importance of Islamic Knowledge	97.	Tafseer Soorah Teen
75.	In Search of Peace	98.	Tafseer Soorah Yaseen
76.	In the light of Islam (1-4)	99.	The Angels and The Jinns
77.	In The Shade of The Throne	100.	The Benefits & Harms of the Media
78.	Inheritance of the Prophets	101.	The Compilation of Quran
79.	Introduction To Islam	102.	The Day of Judgment
80.	Islaamic View on Education	103.	The Divine Wish
81.	Islam & Terrorism	104.	The Importance of Stories
82.	Islam- A Way of Life	105.	The Prophets
83.	Islam the Misunderstood Religion	106.	The Rights of Children
84.	Islamic Concept of God	107.	The Role of Muslim Community
85.	Islamic Culture	108.	The Search for Inner Peace
86.	Islamic Legislation	109.	The True Religion of God
87.	Islamic Perspective on Homosexuality	110.	The True Way of Life
88.	Jaahiliyah	111.	The Way is One
89.	Judgment Day	112.	The Way of the Prophets
90.	Layl	113.	The Way to Victory
91.	Madhab of Rasool	114.	Understanding Islam
92.	Millennium Madness	115.	What does it mean to be a Muslim student?
93.	Miracles of Quran	116.	Worshipping Allah Alone

BENGALI

شرح مبادئ التوحيد

The Fundamentals of Tawheed

(Islamic Monotheism)

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips